লোককাহিনীর দিক-দিগন্ত

আবদুল হাফিজ

শতাব্দী প্রকাশন
৪৬ সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড
কলিকাতা - ৭০০ ০৩২
দূরভাষ : ৪১২৩৬৩৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, ১৯৭৬

প্রকাশক ঃ কমলাপ্রসাদ ভট্ট

প্রচ্ছদ ঃ আশিস দত্ত

আলোকচিত্র ঃ লেখক

মুদ্রণ ঃ গণ প্রকাশনী

১৭৬-এইচ, নেতাজী কলোনি
কলিকাতা-৯০
ফোন ঃ ৫৫৭-০৫৪৮

আমার শিক্ষক

ডক্টর মযহারুল ইসলাম

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

'লোককাহিনীর দিক-দিগন্তে'র দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোবে কিনা সে-বিষয়ে আমার নিজেরই সন্দেহ ছিল। 'মুক্তধারা'র কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ার ফলে আমি খুশি হয়েছিলাম। বিশেষত শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না। প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোলো। ১৯৬৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় দীর্ঘ আট বছর পর বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হলেও বইটিতে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করিনি। কারণ লোককাহিনীর গবেষণায় কোন নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। যদিও ফরাসী পণ্ডিত ক্লদ লেভি-স্ট্রসের Structuralism বা আঙ্গিকবাদ ইতিমধ্যে লোকতত্ত্ব (Folkloristics), সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের দেশে আঙ্গিকবাদকে লোক-ঐতিহ্যের গবেষণায় এখনও কেউ কাজে লাগিয়েছেন বলে জানি না। যাই হোক, বঙ্গীয় লোককাহিনী সম্পর্কে আমি স্বতন্ত্র একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়েছি। কিন্তু কাজটি দুরূহ। বই-পুঁথি ও পত্র-পত্রিকার অভাবও পীড়াদায়ক। তবু যত দ্রুত সম্ভব এ কাজটি শেষ করার চেষ্টা করছি। আর এ কারণেই বর্তমান গ্রন্থটিতে কোন পরিবর্তন সাধন করিনি।

আমাদের দেশে লোককাহিনী সংক্রান্ত আলোচনা ও গবেষণা একটি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। যতটুকু জানি, পরলোকগত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো নিযুক্ত হওয়ার পর ১৯৩৭ সালে বাংলাদেশের লোককাহিনী সম্পর্কে কিছুসংখ্যক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতা-মালাই পরবর্তীকালে 'দি ফোক-লিটারেচার অব বেঙ্গল' নামে প্রকাশিত হয়। এই শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত প্রধানত গঙ্গা বিধৌত অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলিম জনসমাজের মধ্যে লোককাহিনী সংগ্রহ করেন ও তার আলোচনা প্রকাশ করেন। তাঁর গ্রন্থে তিনি মৌখিক ও সাহিত্যিক কাহিনীর সংগে ইউরোপীয় লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা উপস্থিত করেন। বলা

বাহুল্য, লোককাহিনীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা সে সময়ে সম্ভব ছিল না। পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'গল্পের রূপান্তর' ও 'গল্পের জন্মান্তর' নামে দু দুটো প্রবন্ধে, সংক্ষেপে হলেও, লোককাহিনীর দেশ থেকে দেশান্তর গমনের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে লোককাহিনীর নানা দিক নিয়ে একটি বিস্তৃত প্রণিধানযোগ্য আলোচনা করলেও, তাকে বৈজ্ঞানিক বলে অভিহিত করা যায় না। তবু তাঁরই আলোচনায় প্রথমে লোককাহিনীর বিভিন্ন শ্রেণী নির্ণয় ও সেগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদি স্থির করবার প্রচেষ্টা করা হয়।

বাংলাদেশে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীই প্রথম গবেষক যিনি তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে লোককাহিনীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দান করেন। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলায় Indian Folklore Society-র প্রকাশিত জার্মান গবেষক ডি. টি. র‍্যাল্‌ফ্‌ ট্রোজার লিখিত A Comparative Study of a Bengal Folktale বাংলা লোককাহিনীর প্রথম বৈজ্ঞানিক ও তুলনামূলক আলোচনা। সাম্প্রতিক কালে ডঃ মযহারুল ইসলাম লোককাহিনীর তুলনা-মূলক আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

উপরে সংক্ষেপে লোককাহিনী সংক্রান্ত আলোচনা ও গবেষণার যে-কথা উল্লেখ করা হল, তাতে একথা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে লোক-সাহিত্যের প্রভূত পঠন-পাঠন হলেও লোককাহিনী সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়েছে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে। যাই হোক, ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লোককাহিনী বিষয়ক গবেষণা এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে তা দক্ষ ও কুশলী ব্যক্তি ছাড়া সকলের পক্ষে বোধগম্য নয়। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী ও ডঃ মযহারুল ইসলাম সাহেবের বিভিন্ন প্রবন্ধ লোককাহিনীর পরিচয়কে তুলে ধরলেও, লোক-কাহিনী বিষয়ক একটি সামগ্রিক ও সাধারণ আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বর্তমান গ্রন্থটি এই অনুভূতিরই ফল।

গ্রন্থটি রচনাকালে বিদেশি, বিশেষত মার্কিন গবেষকদের গ্রন্থাদির উপর আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে। তাঁদের প্রতি আমার যে ঋণ তা যথোপযুক্ত স্থানে স্বীকার করেছি। বিতর্কমূলক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের নামোল্লেখ করে তাঁদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বাংলা লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ লোককাহিনী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ এবং একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনা গ্রন্থাকারে এই প্রথম প্রকাশিত

হল। স্বভাবতই আমাকে নানা অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তবু আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল লোককাহিনী সম্পর্কে সাধারণ তথ্য সম্বলিত একটি গ্রন্থ রচনা—যে-গ্রন্থ সংগ্রাহক, ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষক সকলের পক্ষেই বিশেষভাবে ব্যবহারোপযোগী হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোককাহিনীর এই আলোচনা সংশ্লিষ্ট সকলকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে, কেননা সংক্ষিপ্ত হলেও এ-গ্রন্থে লোককাহিনীর সকল দিকের উপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্য সফল হলেই আমার শ্রমকে সার্থক বলে গণ্য করবো।

বর্তমান গ্রন্থটিতে প্রচুর বিদেশী বই, বহু পত্র-পত্রিকা ও ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হয়েছে। এসব বিদেশী বই, পত্র-পত্রিকা ও ব্যক্তির নামের উচ্চারণ যতদূর সম্ভব সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে দুটি একটি স্থলে তা সম্ভব হয়নি। লোকঐতিহ্য (Folklore) কিংবা লোককাহিনীর ইংরেজি আলোচনায় যে সব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তার বাংলা প্রতিশব্দ না থাকায়, আমাকে সেই দুরূহ কাজটিও করতে হয়েছে। ফলে দু একটি জায়গায় সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে গেল। পরবর্তী সংস্করণে এগুলো দূর করবার চেষ্টা করবো।

আর একটি কথা, এই গ্রন্থ রচনার সময় যাতে লোককাহিনীর সামগ্রিক একটি আলোচনা সম্ভব হয়, তার চেষ্টা করেছি এবং তত্ত্ব ও তথ্যগত দিক থেকে যাতে ভুল না হয়, সেজন্য বিশেষজ্ঞদের মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। স্থল বিশেষে, যেমন বাংলাদেশের লোককাহিনী সংগ্রহের আলোচনায় এবং লোককাহিনীর বিচার ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রেই আমি শুধু আমার সুস্পষ্ট বক্তব্যকে প্রকাশ করেছি।

৫৭ সেণ্ট্রাল রোড
ধানমণ্ডী
ঢাকা—৫

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

লোককাহিনীর সংজ্ঞা

লোককাহিনী বলতে কি বুঝি? লোককাহিনী বলতে এক কথায় বোঝানো হয় সেই সব কাহিনীকে যা মানুষ মুখে মুখে একে অন্যকে শুনিয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে। যে দিন মানুষের কণ্ঠে প্রথম সর্বজনবোধ্য ভাষা স্ফূর্তি লাভ করে সে দিন থেকে আজ অবধি মানুষ কাহিনী বলতে ও কাহিনী শুনতে বিপুল আনন্দ পেয়ে এসেছে। অবশ্য এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না, মানুষ ইতিহাসের কোন নির্দিষ্ট কাল থেকে কাহিনী বলতে শুরু করেছে। তবে মানব-সভ্যতার গোড়া থেকে তা যে আরম্ভ হয়েছিল সেটা একরকম নিশ্চিত। কারণ কাহিনী সব দেশে সব জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া কাহিনী বলা বা কাহিনী শোনার ব্যাপারটাই আসলে একটি বিশ্বজনীন ঘটনা। কালে কালে দেশে দেশে লোককাহিনীর কথক ও শ্রোতার কোনো অভাব ঘটে নি। কাহিনীর বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, কাহিনীর কথক ও শ্রোতা উভয়েই তাতে আনন্দ পেয়ে এসেছে। বহুদিন পূর্বের কোনো ঘটনা, রাজা-বাদশাদের কিস্‌সা, এমন কি বানানো কাহিনীও মানুষকে সমানভাবে উদ্দীপ্ত করেছে। আমাদের দেশেও ছেলে-মেয়েরা মা, দাদা-দাদি, পাড়া বা গ্রামের বৃদ্ধদের কাছে উদগ্রীব হয়ে গল্প শোনে। তার প্রধান কারণ কাহিনীর মধ্যে এমন সব আকর্ষণীয় উপাদান থাকে যা সহজেই শিশুমনকে অধিকার কবতে সক্ষম হয়। এমন কি বয়স্করাও লোককাহিনীর রসে আপ্লুত হন। আজও গ্রামের লোকেরা বটের ছায়ায় বা পাড়ার কারো বাড়ীতে একত্রিত হয়ে লোককাহিনী বলেন ও শোনেন। শুধু আমাদের দেশ নয় সারা দুনিয়ার মানুষ লোককাহিনী বলা বা শোনায় একইভাবে আনন্দিত হন। লোককাহিনীর একনিষ্ঠ গবেষক স্টিথ থমপসন এ-প্রসঙ্গে বলেন,

"মধ্য আফ্রিকার গ্রামাঞ্চলে, প্রশান্ত মহাসাগরে ভেলার মধ্যে, অস্ট্রেলিয়ার বনে-জঙ্গলে, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরির আশেপাশে অবস্থিত বসতিতে, বর্তমান ও রহস্যময় অতীতকালের গল্প, হোক তা জীব-জানোয়ারের, দেবতাদের কিংবা বীরদের অথবা নিজেদের মত নরনারীদের —তা সব সময়ই শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে, তাদের প্রতিদিনের কথাবার্তাকে সমৃদ্ধ করেছে।"[১]

প্রাচীনকালে, যেমন ঋক্ বেদের পুরাণ কাহিনীতে, তেমনি মধ্যযুগে শাহনামা, আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা, আনতারা অথবা হাতেম তাইয়ের গল্পে মানুষ অন্তরের রস-পিপাসা মিটিয়েছে। গ্রীসের মহাকাব্য ইলিয়াড ও ওডিসি, ভারত উপমহাদেশের রামায়ণ ও মহাভারত এবং রাশিয়ার প্রিন্স ইগোরের কাহিনীমালা কালে কালে লোকের চিত্ত জয় করে এসেছে।

লোককাহিনী-বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় তিন থেকে চার হাজার বছর পূর্বে, এমন কি তার আগেও লোককাহিনীর কথকেরা ছিলেন জনপ্রিয়। আজকের দুনিয়াতেও, লোককাহিনী না হোক, বর্তমান কালের জীবনকে নিয়ে রচিত ছোট গল্প একটি চিত্তজয়কারী মাধ্যম। প্রতিদিন সংবাদপত্রে, সিনেমা-থিয়েটারে ও রেডিও-টেলিভিশনে আধুনিক গল্প তো বটেই, লোককাহিনীও নিয়ত পরিবেশিত হচ্ছে। রেলের কামরায়, স্টীমারে-বাসে এবং গরু ও ঘোড়ার গাড়িতে বসে মানুষ প্রতিনিয়ত কাহিনী পরিবেশন করে চলেছে ও ভবিষ্যতেও করবে।

কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে লোককাহিনী বলতে শুধু সেই সব কাহিনীকে বোঝানো হয়েছে যা গদ্যে বিধৃত কিন্তু লিখিত বা অলিখিত ঐতিহ্যের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে হস্তান্তরিত হয়ে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে

১ In villages of Central Africa, in outrigger boats in the Pacific, in Australian bush, and within the shadow of Hawaiian volcanoes, tales of the present and of the mysterious past, of animals and gods and heroes, and of men and women like themselves, holds their listeners in their spell or enrich the conversation of daily life.

Thompson, Stith : The Folktale, Holt, Rinehart, and Winston, Newyork. পৃষ্ঠা ১

পৌঁছেছে। অর্থাৎ লোককাহিনী বলতে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে তা পুরুষপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত সম্পদ এবং লিখিত বা মৌখিক গদ্যের ভাষায় তা প্রকাশ করা হয়।

বাংলা 'লোককাহিনী' শব্দটিকে ইংরেজী **'Folktale'** শব্দটির সমার্থক ধরে নেওয়া যেতে পারে। এককালে অবশ্য **'Folktale'** বলতে পাশ্চাত্য দেশে ঘরে ঘরে প্রচলিত কাহিনী বা রূপকথা (**Household Tales** অথবা **Fairy Tales**) বোঝাতো। এখন অবশ্য শব্দটি বিস্তৃততর অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে-কোনও কাহিনী, হোক্ তা লিখিত বা মৌখিক, তা এখন **Folktale**-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলা 'লোককাহিনী শব্দটিও একইভাবে বিস্তৃত অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু মনে রাখতে হবে যে লোককাহিনী সর্বদা পুরুষপরম্পরাক্রমে হস্তান্তরিত সম্পদ। আধুনিক গল্প বা কাহিনীর লেখক প্লট বা ঘটনাসংস্থান সচেতনভাবে নির্মাণ করেন। লোককাহিনীর কথকের সে বালাই নেই। গল্পটি কথক যে-ভাবে পান, সেভাবে বলতে পারলেই তিনি সন্তুষ্ট। খুব বড় জোর তিনি বলেন যে অমুক গাঁয়ের অমুক বৃদ্ধ বা ব্যক্তির কাছে তিনি তা পেয়েছেন। এর বেশি কিছু নয়।

লোককাহিনী সম্বন্ধে এখানে আর একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন। লোককাহিনীর সুবিপুল এবং বিশ্বজনীন ঐতিহ্যকে আমরা সর্বদা দুভাবে পেয়ে থাকি। একটি লিখিত অবস্থায় এবং অন্যটি মৌখিক ভাষ্যে। এই দুই ঐতিহ্যকে স্বীকার করবার ফলে লোককাহিনীর আলোচনা ব্যাপক ও জটিল হয়ে উঠে। কিন্তু উভয় ধারার মধ্যে বন্ধন ও ঐক্য এত সুদৃঢ় যে তাকে অস্বীকার করবারও উপায় নেই। অন্যদিকে একটি ধারা থেকে আর একটিকে পৃথক করে আলোচনা করার পক্ষেও যথেষ্ট অসুবিধে। মৌখিক ভাষ্যে প্রচলিত কাহিনী যা প্রধানত লোককাহিনী বিশেষজ্ঞের আলোচ্য, দেখা গেছে, অশিক্ষিত কথকের মুখ থেকে তা লোককাহিনীর বিশেষ বিশেষ সংগ্রহে স্থান করে নিয়েছে। তেমনি আবার গ্রীম-পেরল্ট-এণ্ডারসনের সংগ্রহ থেকে কাহিনী লোকমুখে গিয়ে পৌঁছেছে। এভাবেই দুটি ধারাই পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের নীতি মেনে নিয়েছে।

কথা, গল্প, না কাহিনী ?

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ইংরেজি Folktale-এর জায়গায় বাংলায় 'লোককথা' বা শুধু 'কথা' ব্যবহারের পক্ষপাতী। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গদ্যের ভিতর দিয়া যে কাহিনী প্রকাশ করা হয় ইংরেজীতে তাহাকেই সাধারণভাবে Folktale বলা হয়। বাংলায় লোককথা বলিলে এই কথাটির যথার্থ অনুবাদ হয়, তবে সংক্ষেপে তাহা কেবল মাত্র কথা বলিয়াও উল্লেখ করা যাইতে পারে।"[২]

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপরোক্ত সংজ্ঞায় প্রভাবান্বিত হয়ে 'লোককথা'কে মেনে নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'লোককথা'র পাশাপাশি 'লোককাহিনী'ও ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ ইংরেজী Folktale-এর স্থানে তিনি 'লোককথা' ও 'লোককাহিনী' এই দুই নাম এক সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। ডঃ মযহারুল ইসলাম Folktale-এর জায়গায় লোক-গল্প বা লোককাহিনী গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। ইংরেজী Folktale-এর অনুবাদ হিসেবে লোক-শ্রুতি বা লোক-কথাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বলেন,

"বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের মতে লোকগল্প বা লোককাহিনী শব্দদ্বয় Folktale শব্দটির সমধিক নৈকট্য লাভে সমর্থ।"[৩]

দেখা যাচ্ছে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী ও ডঃ মযহারুল ইসলাম উভয়েই Folktate শব্দটির স্থানে লোককাহিনী যে ব্যবহৃত হতে পারে একথা স্বীকার করেন। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী অবশ্য দ্বিধান্বিত। ডাঃ মযহারুল ইসলাম 'লোককাহিনী'র যৌক্তিকতা স্বীকার করেও 'লোক-গল্প' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'গল্প' নানা অর্থে আমরা ব্যবহার করে থাকি। অথচ লোককাহিনীর পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে একটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টির জন্য দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বা নাম সর্বদা পরিত্যাজ্য। এ সব বিবেচনা করে আমরা Folktale-এর পারিভাষিক নামকরণ করতে চাই "লোককাহিনী"। সঙ্গত কারণেই লোককাহিনীর শ্রেণী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'কথা' ও 'লোককথা' শব্দ দুটিকে স্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অনুরোধে পরিত্যাগ করা হয়েছে।

[২]ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক সাহিত্য, ১ম খণ্ড। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা। ২য় সংস্করণ, ১৯৫৭, পৃঃ ৩৯৭

[৩]সাহিত্যিকী, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা। বসন্ত ১৩৭১ সাল, পৃঃ ৬

লোক-কাহিনীর শ্রেণীবিভাগ

লোককাহিনীর নিবিষ্ট পাঠে দেখা যায় যে তা অনেক রকমের হতে পারে। ইতিহাস, পুরাণ, অত্যদ্ভুত ঘটনা ও অবিশ্বাস্য নানা বিষয় নিয়ে লোককাহিনী গড়ে ওঠে। লোককাহিনীর কথক বা শ্রোতা এ-ধরনের শ্রেণীবিভাগের কথা কখন ভাবেন না। কিন্তু লোককাহিনীর সচেতন ছাত্রের পক্ষে লোককাহিনীর রূপকল্পের (form) কথা না ভেবে উপায় নেই।

রূপকাহিনী

লোককাহিনীকে যদি একটি বিশ্বজনীন ঘটনা হিসেবে মনে রাখি তাহলে জার্মানরা যাকে Marchen বলে তার কোনও সমার্থক শব্দ বাংলায় নেই। Marchen শব্দটির ইংরেজী অনুবাদ করা হয়েছে Fairy বা Household Tale শব্দ দুটি দিয়ে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে ও-দুটি শব্দ দিয়ে Marchen-য়ের অর্থগত তাৎপর্য ধরা পড়ে না। ফরাসীরা Marchen-এর পরিবর্তে ব্যবহার করেন Conte populaire, স্টিথ্‌ থম্পসনের মতে, আসলে Marchen বা Conte populaire[৪] বলতে 'সিনড্রেলা' বা 'স্নো-হোয়াইট' অথবা 'হ্যান্‌সেল' এবং 'গ্রিটেল'---জাতীয় কাহিনীকে বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে আলেকজাণ্ডার এইচ. ক্রাপ্‌ এ-ধরনের কাহিনীকে Fairy Tale-এর পর্যায়ে ফেলে আলোচনার[৫] পক্ষপাতী। স্টিথ্‌ থম্পসন এ-প্রসঙ্গে বলেন যে সব Fairy Tale-এর মধ্যে পরী থাকবেই এমন কোন কথা নেই। তিনি এ-মতও পোষণ করেন যে Fairy Tale বা Household Tale বলতে এমন বহুতর গল্প বোঝায় যে প্রায় সব কাহিনীই তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সে-কারণে তিনি জার্মান Marchen শব্দটিকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। থম্পসন Marchen-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন এ ভাবে,

[৪] Thompson, Stith : The Folktale, Holt, Rinehart and Winston, Newyork. পৃঃ ৮

[৫] Krappe, Alexander Haggerty : The Science of Folklore, Newyork, W. W. Norton and Company, Inc. 1929. পৃঃ ৯

"Marchen হল এক ধরনের কাহিনী যার নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে, আর আছে মটিফ বা অনুকাহিনীর পরম্পরা। এই কাহিনীর ঘটনা ঘটে অবাস্তব পৃথিবীতে---যে পৃথিবীতে না আছে নির্দিষ্ট স্থান, না নির্দিষ্ট চরিত্র, তদুপরি তা অত্যদ্ভুত ব্যাপারে থাকবে পরিপূর্ণ। এই অসম্ভবের দুনিয়ায় নিরহঙ্কার নায়ক তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে বাদশাহী পায় আর শাজাদীদের বিয়ে করে।"[৬]

উপরোক্ত সংজ্ঞা যে সামগ্রিকভাবে বাংলার রূপকাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাতে সন্দেহ নেই। বাংলায় সাধারণভাবে রূপকাহিনীর পরিবর্তে 'কেচ্ছা' ও 'কিস্‌সা' শব্দ দুটিও ব্যবহার করা হয়। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী Marchen-য়ের পরিবর্তে বাংলায় "রূপকথা" শব্দটি গ্রহণ করেছেন। আলেকজাণ্ডার এইচ. ক্রাপ প্রসঙ্গান্তরে না গিয়ে সরাসরি রূপকাহিনীকে Fairy Tale হিসাবে ধরে তার সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এভাবে:

"Fairy Tale বলতে আমরা বুঝি প্রবহমান এবং কিছুটা পরিমাণে দৈর্ঘ্য-সংবলিত কাহিনী।[৭] মোটামুটি তা ঐকান্তিক, গদ্যে বিধৃত, তদুপরি

---

[৬]A Marchen is a tale of some length, involving a succession of motifs or episodes. It moves in an unreal world without definite locality or definite characters and is filled with the marvellous. In this never-never land humble heroes kill adversaries, succeed to kingdoms, and mary princesses.

Thompson, Stith : The Folktale, Holt, Rinehart and Winston. Newyork, পৃঃ ৮

[৭]By fairy tale we mean a continued narrative generally of a certain length, practically always in prose, serious on the whole, though humour is by no means excluded, centring in one hero or heroine ; usually poor and destitute at the start, who, after a series of adventures in which the supernatural element plays a concious part, attains his goal and lives happy ever after.

Krappe, Alexander Haggerty : The Science of Folklore, Newyork, W. W. Norton and Company. Inc. 1929. পৃঃ ১

হাসি-ঠাট্টাও তার থেকে বাদ পড়ে না। একজন নায়ক ও নায়িকা তার কেন্দ্রে থাকে। শুরুতে এসব নায়ক-নায়িকা দরিদ্র ও নিঃস্বই থাকে। পরে অবশ্য অতিপ্রাকৃতিক উপাদানে পরিপূর্ণ অভিযাত্রায় বারংবার অংশ গ্রহণ করে তারা বিখ্যাত হয়ে যায়। এবং উদ্দেশ্য সাধনের পর, পরবর্তীকালে সুখে দিনগুজরান করে।"

ক্রাপের সংজ্ঞার সঙ্গে থম্পসনের সংজ্ঞার বিরোধ এইখানে যে থম্পসন রূপকাহিনীর একটি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিয়েছেন। ক্রাপের সংজ্ঞা এ-কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলা লোকসাহিত্যের অন্যতম গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য রূপকাহিনী প্রসঙ্গে বলেন:

"বাংলায় যাহাকে রূপকথা বলা হয় তাহার কোন ইংরেজি প্রতিশব্দ নাই; কাহারও কাহারও এই সম্পর্কে **Fairy Tale** কথাটি মনে হইতে পারে; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, **Fairy** অর্থে পরী, অতএব ইহা দ্বারা পরীর গল্প বোঝায়, কিন্তু বাংলার রূপকথায় পরী নাই, সুতরাং ইংরেজী **Fairy Tale** কথাটির বাংলায় রূপকথা অনুবাদ হইতে পারে না।"[৮]

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই একদেশদর্শী। বাংলায় যেদিন মুসলমানেরা প্রবেশ করেছিল সেদিন তাদের সঙ্গে সঙ্গে পরীরাও চুপি চুপি বাংলার লোককাহিনীতে প্রবেশ করেছিল। আরও আশ্চর্য 'হাতেম তাই'-এর মত লোককাহিনীর লিখিত উদাহরণ তাঁর চোখে পড়েনি। লোককাহিনীর সাহিত্যিক ভাষ্য থেকে কাহিনী যে সর্বদাই লোকমুখে যায় একথাও তাঁর অজানা থাকবার কথা নয়। যাক সে কথা। ডঃ ভট্টাচার্য অবশ্য **Marchen**-এর পরিবর্তে "রূপকথা"কে গ্রহণ করেছেন---অবশ্য তাতে পরী থাকবে না।

ডঃ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমারও একমত যে জার্মান **Marchen**-এর সমার্থক শব্দ হিসেবে "রূপকথা" গ্রহণযোগ্য---তাতে পরী থাক আর নাই থাক। আর এই সঙ্গে স্টিথ্ থম্পসনের সংজ্ঞাটিকে আমরা রূপকাহিনীর একমাত্র বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা বলে মানি।

[৮]ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড)। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা। ২য় সংস্করণ, ১৯৫৭। পৃঃ ৩৯৭

রোমাঞ্চকর কাহিনী

স্টিথ থম্পসনের মতে Novella রূপকল্পের দিক থেকে রূপকাহিনী বা Marchen-এর কাছাকাছি পৌঁছয়। এর লিখিত উদাহরণ পাওয়া যায় আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা এবং বোক্কাচিও-র ডেকামেরনের মধ্যে। Novella, থম্পসনের সংজ্ঞানুযায়ী, এমন কাহিনী যার ঘটনাগুলো বাস্তব জগতে ঘটে এবং ঘটে নির্দিষ্ট কালে ও নির্দিষ্ট স্থানে। এতে যদিও অত্যদ্ভুত ঘটনা ঘটে তাহলেও তা এমন যে লোকের বিশ্বাসের সীমা লংঘন করে না। Marchen-এর ঘটনাবলি ঘটে ঠিক এর উল্টোভাবে। নাবিক সিন্দবাদের কাহিনীকে Novella বলে অভিহিত করা যায়। অনেক সময় Novella ও Marchen-এর রূপকল্প প্রায় একরকম থাকে, ফলে উভয়ের মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী Novella-র পরিবর্তে বাংলায় 'রোমাঞ্চ-কথা' ব্যবহারের পক্ষপাতী। কিন্তু এতে করে Novella-র অন্তর্নিহিত অর্থ ধরা পড়ে বলে মনে করি না। সেজন্যই আমরা একে "রোমাঞ্চকর কাহিনী" হিসেবে অভিহিত করব।

বীর-কাহিনী

Hero Tale-এর ঘটনা কখনো একেবারেই অবিশ্বাস্য এবং কখনো আধা-বাস্তব জগতে ঘটে। পৃথিবীর সব জায়গায় এ-ধরনের কাহিনী পাওয়া যায়। এ-সব কাহিনীর নায়কেরা অতিপ্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। হারকিউলিস এবং থিসিয়াসের গ্রীক কাহিনীকে Hero Tale বলে অভিহিত করা যায়। স্টিথ থম্পসনের মতে গ্রীক ও জার্মানদের মতো প্রাচীন জাতিদের মধ্যে এ-ধরনের কাহিনী জন্মলাভ করে। বাংলাদেশে এ-রকম কাহিনী এখনও সংগৃহীত হয় নি। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী ও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এ-ধরনের কাহিনীকে 'বীর-কথা' বলে আখ্যায়িত করতে চান। সঙ্গত কারণে এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা "বীর-কাহিনী' গ্রহণ করবার পক্ষপাতী।

স্থানিক কাহিনী

জার্মান Sage বলতে এমন এক ধরনের কাহিনী বোঝায় যার ঘটনাবলী, একটি বিশিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। এতেও থাকে অবাস্তব কাহিনী তবু তা সত্যি সত্যি ঘটেছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। স্টিথ থম্পসনের মতে বহুকাল পূর্বে ঘটেছে অথচ এখনও তাকে সত্য বলে মনে করবার ফলে লোকবিশ্বাসে এ-ধরনের কাহিনী জীবন্ত হয়ে বেঁচে থাকে। কথক যখন বর্ণনা করেন, তখন তার চোখমুখ বিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। যেন সমস্ত ঘটনাটা এইমাত্র ঘটে গেল। এসব কাহিনীর নায়কেরা পীর, ভূত-প্রেত, জল-দেবতা ও শয়তানকে পর্যন্ত পরাজিত করে অথচ শ্রোতারা এ-ধরনের অসম্ভব কাহিনীও নির্বিচারে বিশ্বাস করেন। অনেক সময় এই কাহিনী স্মৃতি হিসেবে হস্তান্তরিত হয় এবং এর সঙ্গে ঐতিহাসিক চরিত্র জড়িত থাকে। Sage-এর কাহিনী মোটামুটি সরল হয় এবং একাধিক মটিফ থাকে না। ইংরেজিতে এগুলোকে local tradition, local legend, migratory legend বলা হয়। ফরাসীতে একে বলা হয় tradition populaire. আলেকজাণ্ডার এইচ. ক্রাপ তাঁর গ্রন্থ 'Science of Folklore'-এ দুই স্বতন্ত্র অধ্যায়ে যথাক্রমে Local legend ও Migratory legend সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। থম্পসন উভয়বিধ legend-কে Sage-এর পর্যায়ে ফেলেছেন। জার্মান ভাষায় Migratory legend-কে Wander sage বলা হয়। সে হিসেবে থম্পসনের বক্তব্যকে সুচিন্তিত বলে মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। বাংলায় Sage-জাতীয় কাহিনী এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু পীর-দরবেশদের দরগাহ্ বা কবরসংক্রান্ত অলৌকিক কাহিনীকে 'স্থানিক কাহিনী' বলে মনে করা যেতে পারে।

ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী

স্টিথ থম্পসন Explanatory Tale বলতে বুঝিয়েছেন সেই সব কাহিনীকে যার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এর সঙ্গে local legend বা স্থানিক কাহিনীও জড়িত থাকে। কেন বিশেষ স্থানে একটি পাহাড় গড়ে ওঠে বা কেন একটি বিশেষ নদী এঁকেবেঁকে

চলে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এ-ধরনের কাহিনী গড়ে ওঠে। থম্পসন তাঁর বক্তব্যকে সম্প্রসারিত করে বলেন যে বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার, তরুলতা, নক্ষত্র, মানুষ এবং তার বিভিন্ন ঐতিহ্য সম্বন্ধে অনুরূপ গল্প শোনা যায়। বলাবাহুল্য বিশেষ ঘটনার ব্যাখ্যা দান করবার জন্যই এ-ধরনের কাহিনী বেঁচে থাকে। এ-জাতীয় গল্পের সমাপ্তি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। বাংলা লোককাহিনীর ক্ষেত্রে এ-ধরনের কাহিনীর অভাব নেই। অবশ্য সংগৃহীত হয়নি। নীচে প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যাদানকারী একটি কাহিনী উল্লিখিত হল।

চাল এখন যেমন দেখতে অতীতেও দেখতে তেমনি ছিল। এখন যেমন ধানের চারায় ধান হয় আগে তা হতো না। অর্থাৎ তখন চারাগাছে চালই ফলতো। কিন্তু একদিন একজন রজঃস্বলা নারী মলত্যাগ করতে বসে চালের চারা থেকে টপাটপ চাল ছিঁড়ে মুখে দিতে থাকে। ফলে চালের চারার ভয়ংকর রাগ হয়। সেই দিন থেকে চারাগাছে চালের বদলে ধান ফলতে থাকে।

পুরাণ-কাহিনী

স্টিথ থম্পসন Myth-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে Myth হল এমন কাহিনী যার মধ্যে বর্তমান বিশ্ব নয় একটি অতীতের বিশ্বই বর্তমান। তাঁর মতে এসব কাহিনীতে দেবতা, আধা-ঐশ্বরিক নায়ক বা বীর, এবং সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়। Myth ঘনিষ্ঠভাবে লোকের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচারের সঙ্গে জড়িত। এগুলো কখনও 'বীর-কাহিনী' এবং কখনও 'ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী'র সঙ্গে জড়িত থাকে। তবে এসব কাহিনীকে শ্রেণীবদ্ধ করে তাকে ধর্মীয় তাৎপর্যে মণ্ডিত করা হয়। Myth-য়ের বীর বা নায়ক কোন না কোনভাবে মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। মূল কাহিনীতে দেবতা বা আধা-দেবতাদের অসংখ্য অভিযাত্রার বর্ণনা থাকে। 'বীর-কাহিনী' 'পুরাণ-কাহিনী' থেকে বিচ্যুত হয়ে আলাদা হয়ে যেতে পারে। ডঃ ভট্টাচার্য এবং ডঃ সিদ্দিকী Myth-কে যথাক্রমে 'লৌকিকপুরাণ' ও 'লোকপুরাণ' বলে অভিহিত করেছেন। ডঃ ভট্টাচার্য বলেন :

স্বষ্টির অজ্ঞাত লীলা-রহস্য বর্ণনা করিয়া যে সকল অলৌকিক বিবরণ রচিত হইয়া থাকে, ইংরেজিতে তাহাকে **Myth** বলা হয়, বাংলায় তাহাকে লৌকিক-পুরাণ বলা যাইতে পারে।"[৯]

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী এ-প্রসঙ্গে বলেন,

"সত্যি সংঘটিত হয়েছিল এমন লোক-বিশ্বাসপূর্ণ বংশানুক্রমে চলে আসা গল্পই হল **Myth.**"[১০]

ডঃ সিদ্দিকী ডঃ ভট্টাচার্যের প্রদত্ত নামটিকে অল্পাধিক মেনে নিয়েছেন। ডঃ সিদ্দিকী পুরাণের সঙ্গে **Myth**-এর পার্থক্য প্রসঙ্গে বলেন,

"পুরাণের সঙ্গে **Myth**-এর ব্যবধান হল এই যে পুরাণের কোন বিশিষ্ট দেবতা বা বিশিষ্ট মানুষের জীবন-কাহিনী বা লীলা-বৈচিত্র্য বর্ণিত হয়।"[১১]

অন্যদিকে ডঃ ভট্টাচার্য পুরাণ বা লৌকিকপুরাণ আদৌ লোক-কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।

ডঃ ভট্টাচার্য এবং সিদ্দিকী **Myth**-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা এক নয়। ভট্টাচার্য মহাশয়ের সংজ্ঞায় শুধুমাত্র স্বষ্টি-রহস্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে সিদ্দিকী সাহেবের সংজ্ঞায় 'লোক-পুরাণে'র যুগ-সঞ্চিত ঐতিহ্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু থম্পসনের সংজ্ঞা উপরোক্ত গবেষকদের সংজ্ঞাকে তো অন্তর্ভুক্ত করেই তদুপরি তা 'পুরাণ' ও (লৌকিক)-'লোকপুরাণ' ইত্যাদির মধ্যে ভেদ সৃষ্টি না করে সব রকম পুরাণের কাহিনীকে গ্রহণ করে। এ-কারণেই **Myth**-এর যে সংজ্ঞা থম্পসন দিয়েছেন, তাকে বৈজ্ঞানিক বলে মনে করা যায়। এখানে আর একটি কথা বলার আছে। 'লৌকিক' বা 'লোকপুরাণ' বলে যে-বস্তুর কল্পনা করা হয়েছে তা আসলে পুরাণই। **Myth**-এর বাংলা কিছুতেই 'লৌকিক পুরাণ' বা 'লোকপুরাণ' হতে পারে না। প্রাচীন

[৯]প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৫

[১০]ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, লোকসাহিত্য, স্টুডেন্ট ওয়েজ ১৯৬৩, পৃঃ ২৪১

[১১]প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৫

ভারতীয় বা গ্রীক পুরাণ এবং পরবর্তীকালে পুরাণের মধ্যে শুধুমাত্র কালের ব্যবধানটাই বড়। অন্য কিছু নয়। সিদ্দিকী সাহেব সে-কারণেই **Myth**- এবং **Legend**-কে প্রায় এক করে ফেলেছেন। ভট্টাচার্য মহাশয় পুরাণ লোককাহিনীর আলোচনার বিষয় কি না সে-সম্বন্ধে সন্দিহান। এ-প্রসঙ্গে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, অন্যান্য সমস্ত কাহিনীর মত পুরাণের কাহিনীও লোকমানসের সৃষ্টি। বিশ্ব-প্রকৃতির ব্যাখ্যা খুঁজতে যেয়ে মানুষ পুরাণ-কাহিনী সৃষ্টি করেছে। স্টিথ থম্পসন পুরাণ-কাহিনীকে লোককাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে তাই সঙ্গত কাজই করেছেন বলে মনে করি। যাই হোক **Myth**-এর পরিবর্তে বাংলায় আমরা 'পুরাণ-কাহিনী'ই ব্যবহার করব।

এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। **Myth** বা পুরাণ-কাহিনীর সংজ্ঞা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর মতভেদ পণ্ডিতদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও স্টিথ থম্পসনের সংজ্ঞা মোটামুটি বৈজ্ঞানিক বলে দাবি করতে পারে।

জীব-জানোয়ারের কাহিনী

জনপ্রিয় কাহিনীর মধ্যে জীব-জানোয়ার বেশীর ভাগ উপস্থিত থাকে। পুরাণেও তাদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। পুরাণ-কাহিনীর নায়ক অনেক ক্ষেত্রে জীব-জানোয়ারের রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। জীব-জানোয়ারের চরিত্রে মানবিক গুণারোপ পুরাণ-কাহিনীর বাইরেও দেখা যায়। স্টিথ থম্পসন এ-ধরনের পুরাণ-বহির্ভূত জীব-জানোয়ারের কাহিনীকেই বিশুদ্ধ জীব-জানোয়ারের কাহিনী বলে আখ্যায়িত করতে চান। এ-প্রকারের কাহিনীতে একটি চালাক-চতুর জানোয়ার একটি বোকা জানোয়ারকে প্রবঞ্চিত করে থাকে। লোককাহিনীর একটা বড় অংশই জীব-জানোয়ারের কাহিনীতে পূর্ণ। বাংলা লোকসাহিত্যে এ-ধরনের কাহিনীকে 'উপকথা' বলা হয়। কিন্তু **Animal Tale**-এর জায়গায় "জীব-জানোয়ারের কাহিনী" সুস্পষ্ট বলে মনে করা যায়।

নীতি-কাহিনী

জীব-জানোয়ারের কাহিনীর সঙ্গে নীতি বা উপদেশ যুক্ত করলে তাই পরে **Fable** বা "নীতি-কাহিনীতে" পরিণত হয়। ডঃ ভট্টাচার্য

'নীতিকথা' ব্যবহারের পক্ষপাতী। ডঃ সিদ্দিকী ঐ সিদ্ধান্তই মেনে নিয়েছেন। ঈসপের গল্প, হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র এ-ধরনের গল্পে পরিপূর্ণ। কাহিনীর শেষে সর্বদা একটি নীতিবাক্য যুক্ত করা হয় যদিও তার কোনও বাস্তব প্রয়োজন থাকে না, কারণ কাহিনীর মধ্যেই তা আত্মপ্রকাশ করে।

হাস্যরসাত্মক কাহিনী

পৃথিবীর সর্বত্র ছোট ছোট কাহিনীতে হাসি-ঠাট্টা-রঙ্গ-রসিকতা ইত্যাদিকে প্রকাশ করা হয়। ইংরেজিতে এ-সব কাহিনীকে কখনও Jest, Humorous Anecdotes এবং Merry Tales বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর মধ্যে জীব-জানোয়ারের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু এ-রকম কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর পরিচয়ই পাওয়া যায়। বোকা লোকদের নিয়ে হাসি-তামাসা ও লোকঠকানোর উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত কাহিনী পাওয়া যায় তাকে ইংরেজিতে Numskull Tale বলা হয়। Merry Tales বা হাস্যরসাত্মক কাহিনী কখনও কখনও বিশেষ নায়ক বা নায়িকাকে কেন্দ্র করে একটি বিস্তৃত কাহিনীপরম্পরার জন্মদান করে। সেই বিশেষ নায়ক বা নায়িকা কখনও তার চাতুর্যের জন্য নিন্দিত হয়। এই ধরনের কাহিনী সমগ্র বিশ্বে খুবই জনপ্রিয়।

অন্যান্য কাহিনী

স্টিথ্ থম্পসন Sain'ts Legend বলে লোককাহিনীর আর একটি বিভাগ স্বীকার করতে চান। কিন্তু এ-ধরনের কাহিনী Legend বা স্থানিক কাহিনী হিসেবে বিবেচিত হওয়া যোগ্য।

লোককাহিনীর আরও অনেক বিভাগের কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। কিন্তু স্টিথ্ থম্পসনের মতে উপরোক্ত বিভাগসমূহ অন্যান্য সব রূপকল্পকে কোন না কোন ভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। লোককাহিনীর এ-সব বিভাগকে একেবারে চীনের প্রাচীর দিয়ে আলাদা করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোককাহিনী পঠন-পাঠনের সমস্যা

লোককাহিনী আলোচনা করার সময় একটি কথা বিশেষভাবে মনে হয় আর তা হল এই যে লোককাহিনী মূলত সমগ্র বিশ্বের সাধারণ সম্পদ। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের মানুষ লোককাহিনী বলতে ও শুনতে বিপুলভাবে আনন্দিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কারণ গল্প বা কাহিনীর মধ্যে যে আনন্দ লুকানো তা সর্বজনীন এবং বিশ্বজনীন। কিন্তু কাহিনীর শ্রোতা বা কথক যে-ভাবে কাহিনীকে দেখেন লোক-কাহিনীর গবেষক বা ছাত্র সে-ভাবে দেখেন না। বস্তুত লোককাহিনীর গবেষক বা ছাত্র লোককাহিনীর পঠন-পাঠন করতে গিয়ে প্রভৃত জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। অবশ্য বর্তমানে বিশ্বব্যাপী লোককাহিনী সংগ্রহ, তার দক্ষ ও নিপুণ ব্যাখ্যা ও শ্রেণীবদ্ধকরণের ফলে লোক-কাহিনীর পঠন-পাঠন সম্ভব হয়েছে। প্রায় এক শতাব্দীর বেশি কাল ধরে লোককাহিনীর গবেষকরা যে-সব তত্ত্বগত আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তার ফলে এখন তাত্ত্বিক মাল-মশলার অভাব নেই। গবেষকরা শুধু যে একটি মাত্র সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তা নয় বরং বিভিন্ন গবেষক লোককাহিনীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। ফলে একের আলোচনা অন্যকে সাহায্য করেছে, বর্ধিত করেছে, পূর্ণ করেছে। কখনও বা একজনের তত্ত্ব অন্যের পরিপূরক হয়েছে।

যাই হোক, লোককাহিনীর পঠন-পাঠন কালে গবেষকরা যে-সব প্রশ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হন স্টিথ্ থম্পসন তাকে নিম্নোক্ত পাঁচটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করেছেন:

১। লোককাহিনীর জন্ম বা উদ্ভব

লোককাহিনী বা কাহিনী বলবার রেওয়াজ কবে থেকে চালু হল আর তার উদ্ভবই বা হল কি ভাবে?

২। লোককাহিনীর অর্থ

লোককাহিনীর সর্বজনগ্রাহ্য অর্থই কি একমাত্র অর্থ না তার মধ্যে অন্য লুকোনো অর্থও আছে?

৩। লোককাহিনীর বিস্তার

লোককাহিনীর আলোচনায় দেখা যায় যে একই কাহিনী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে। একই কাহিনীর বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার কারণ কি আর কেনই বা তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে?

৪। লোককাহিনীর ভিন্নতা

লোককাহিনীর যে-কোনও একটির মৌখিক পাঠ অন্য আর একটি থেকে ভিন্নতর। এই পরিবর্তন, রূপান্তর ও ভিন্নতার স্বরূপ কি?

৫। বিভিন্ন শ্রেণীর লোককাহিনীর সম্পর্ক নির্ণয়

রূপকাহিনী, পুরাণ-কাহিনী, বীর-কাহিনী ইত্যাদি ও অন্যান্য প্রকার লোককাহিনীর রূপকল্পের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি?

লোককাহিনীর তত্ত্ব

উপরে বর্ণিত প্রশ্ন ও সমস্যাসমূহের একটা প্রণিধানযোগ্য আলোচনা জার্মানীর গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের লোককাহিনী-সংগ্রহ **'Kinder-Und Hausmarchen'**-এর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯১৮ সাল) প্রকাশ করেন। স্টিথ্ থম্পসনের মতে ভ্রাতৃদ্বয় যখন তাঁদের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বের করেন তখন লোককাহিনীর আন্তর্জাতিক স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁরা সামান্যই মাথা ঘামিয়েছিলেন। তাঁদের সংগ্রহটি প্রকাশিত হলে, সার্বিয়া ও অন্যান্য দেশ থেকেও অনুরূপ সংগ্রহ বের হতে থাকে। সংগ্রহগুলোর মধ্যে প্রাপ্ত কাহিনীগুলোর সাদৃশ্য বিশেষ করে প্লটের সাদৃশ্য পরিচ্ছন্নভাবে ধরা পড়ে। ফলে এই সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে ভিল্‌হেল্‌ম্ গ্রীম ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এ-সম্বন্ধে একটি চূড়ান্ত তাত্ত্বিক বক্তব্য প্রকাশ করেন।

ভিল্‌হেল্‌ম্ গ্রীমের বক্তব্য ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়:

(ক) সংগ্রহগুলোর কাহিনীর মধ্যে যে-সাদৃশ্য অনুভব করা যায় তা এতই বিস্তৃত যে পৃথিবীর দুই ভিন্নপ্রান্তে অবস্থিত দেশের কাহিনীর মধ্যেও

তা ধরা পড়ে। জাতি-ধর্ম-দেশ-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে এ-সব সাদৃশ্য পরিদৃশ্যমান। কাহিনীর অভ্যন্তরে বিধৃতভাবে, চরিত্র-চিত্রণে, ঘটনার সংস্থানে এবং ঘটনার প্রকাশভঙ্গীতে এসব সাদৃশ্য নিহিত। এর থেকে মনে করবার কারণ আছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং আবহাওয়ার পার্থক্য সত্ত্বেও একই কাহিনী স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছে।

(খ) পাশাপাশি অবস্থিত বা দূরস্থিত দেশে একই কাহিনীর অবস্থান কি তবে আকস্মিক? ভিল্‌হেল্‌ম্‌ গ্রীমের মতে তা নয়। তিনি তাঁর আলোচনায় **The Peasant's Wise Daughter** কাহিনীটির বিচার করে বলেন যে এই কাহিনীর ভাব ও ঘটনার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রাপ্ত কাহিনীর সাদৃশ্য অবাক করে। সেইজন্যই তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, কাহিনীগুলো একই উৎস থেকে উৎসারিত।

(গ) গ্রীম আরও বলেন যে কাহিনী এক দেশ হতে অন্য দেশে নীত হতে পারে। নতুন দেশে গিয়ে সে-কাহিনী স্থায়ীভাবে বসবাসও করতে পারে। অবশ্য তাঁর মতে লোককাহিনীর ইতঃস্তত ভ্রমণ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। অর্থাৎ এসব বিচ্ছিন্ন ব্যাপার বিশ্বের লোককাহিনীর সাধারণ উৎসকে প্রমাণ করে না। দেখা গেছে পৃথিবীর দুই বিভিন্ন মেরুতে অবস্থিত দেশের প্রাপ্ত কাহিনীর মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান। এখন এসব ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় কি ভাবে? জর্মানীর এক গণ্ডগ্রামে যে-কাহিনী পাওয়া গেল, তার সঙ্গে সার্বিয়া, অস্ট্রিয়া বা বাংলাদেশ-ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত কাহিনীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেলে তার ব্যাখ্যা কি ভাবে সম্ভব?

ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব ও ভেঙ্গে-যাওয়া পুরাণ-তত্ত্ব

ভিল্‌হেল্‌ম্‌ গ্রীম অতঃপর একটি সাধারণ উৎসের সন্ধান করে প্রমাণ করবার প্রয়াস পান যে, যে-সব কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাধারণ সম্পত্তি তাদের মটিফগুলোও সাধার চরিত্রের অধিকারী। তিনি আরও দেখান যে লোক-বিশ্বাসের (**Belief**) একটুকরো ভগ্নাংশ যা প্রাচীনকালের অভ্যন্তরে লুকিয়ে ছিল, তা সব কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। পুরাণ-কাহিনী (**Myth**)র নানা উপাদান কাহিনীর শরীরে

ছড়িয়ে আছে। পুরাণ-কাহিনী যদিও-বা মূল্য হারিয়েছে তবু লোক-কাহিনীকে তা নূতন মূল্য দান করেছে। তিনি বলেন, বর্তমান থেকে যতই অতীতের দিকে যাওয়া যায় ততই পুরাণ-কাহিনীর মহিমা উপলব্ধি করা সম্ভব। আধুনিক মনন যথা মানবিকতাবোধ বা যুক্তিশীলতা ইত্যাদির বিকাশের ফলে পৌরাণিকতা (Myth-making Tendency) পিছু হটে গেছে। কিন্তু এসব আলোচনার অর্থ কি? অর্থাৎ একথা কি বলা সম্ভব যে কাহিনীগুলোর মটিফ একটি সাধারণ সূত্র থেকে আহৃত? গ্রীম এ-প্রসঙ্গে পরিষ্কারভাবে বলেন যে ইন্দো-জার্মানিক বা ইন্দো-ইউরোপীয় লোকগোষ্ঠীর জীবন হল সেই সাধারণ সূত্র। ইন্দো-ইউরোপীয় লোক-গোষ্ঠীর জনসাধারণ যে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বা আবহাওয়াগত পরিবেশে বাস করুক না কেন তারা একই মননের অধিকারী ছিল। ফলে তাদের লোককাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য অনুভব না করে উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর পুরাণ-কাহিনী ভেঙ্গে গিয়ে তার থেকে লোককাহিনীর উৎপত্তি হয়েছে। কেননা দেখা গেছে, লোককাহিনীর মধ্যে পুরাণ-কাহিনীর নানা ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। অবশ্য যদি দেখা যায় যে, ইন্দো-ইউরোপীয় লোকগোষ্ঠীর একটি কাহিনী আফ্রিকার আরণ্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় তখন তার ব্যাখ্যা কি হবে? গ্রীম বিশ্বাস করেন যে, লোককাহিনীর পক্ষে ভ্রমণ করা সম্ভব। অর্থাৎ আফ্রিকায় প্রাপ্ত লোককাহিনীটিও মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় লোকগোষ্ঠীরই। কিন্তু ভ্রমণ করতে করতে তা আফ্রিকায় গিয়ে পৌঁছেচে। সুতরাং এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র।

গ্রীমের উপরোক্ত তত্ত্বদ্বয় বহুকাল লোককাহিনীর গবেষকদের মনকে অধিকার করে ছিল। কিন্তু অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যেই তাঁর তত্ত্বদ্বয় গুরুত্ব ও তাৎপর্য দুই-ই হারিয়ে ফেলে। এর কারণ স্বরূপ দেখান হয়:

(ক) গ্রীম লোককাহিনীর বিস্ময়কর ও অত্যদ্ভুত (Sense of Wonder) দিকের উপর জোর দিয়েছিলেন। ফলত পুরাণ-কাহিনী ও লোককাহিনীর মধ্যে বিস্ময়জনক ঘটনা তাকে চমৎকৃত করে। এ-জন্যই তিনি 'ভেঙ্গে-যাওয়া পুরাণ-তত্ত্বে' বিশ্বাস করতেন। কেননা বিস্ময়বোধ উভয় কাহিনীর সাধারণ সম্পত্তি।

(খ) দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী অঞ্চলের লোককাহিনী আলোচনার ফলে লোককাহিনীর ইন্দো-ইউরোপীয় তাৎপর্য তাকে বিমুগ্ধ করে। ফলে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী ও ভাষাকে সাধারণ লোককাহিনীর সূত্র বলে মনে করেন। এর ফলেই ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পায়।

গ্রীমের অন্যান্য মত ও তার গুরুত্ব

স্টিথ থম্পসনের মতে গ্রীমের তত্ত্ব দুটি লোককাহিনীর আলোচনায় ফলপ্রসূ না হলেও তাঁর আলোচনায় কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য ছিল। গ্রীম পরবর্তীকালে এসব মন্তব্যকে আর পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব হিসেবে দাঁড় করাতে সচেষ্ট হননি। অথচ এই সব মন্তব্যই পরবর্তী সময়ে লোককাহিনী আলোচনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রচনা করে। এই মন্তব্যগুলো হল:

(ক) লোককাহিনীর মধ্যে অনেক সাধারণ বৈশিষ্ট্য বারংবার আবৃত্ত হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই ব্যাপারটাকে পরে তিনি আর গুরুত্ব দেননি।

(খ) লোককাহিনী এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করতে সক্ষম। পরবর্তীকালে এ-ঘটনাকে তিনি বিচ্ছিন্ন বলে আখ্যায়িত করলেন।

অথচ উপরোক্ত সূত্র দুটি অবলম্বন করে লোককাহিনীর আলোচনা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পেয়েছে। লোককাহিনীর মধ্যে আবৃত্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ মটিফের সন্ধান দেয়। আর লোককাহিনী যে ভ্রমণ করে, এ-সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

পুরাণ তত্ত্ব

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে গ্রীমের ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব এরই প্রভাবের দরুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠে। সংস্কৃত ভাষার চর্চা এ-সময়ে খুব বৃদ্ধি পায়। তদুপরি ঋক্‌-বেদ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিসমূহ খ্রীষ্টজন্মের ৩৫০০ বছর পূর্বেকার ঐতিহ্যে দৃষ্টিপাত করতে সক্ষম হল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গবেষকরা ভাষাতত্ত্বের

গবেষণা ছাড়াও একইসঙ্গে পুরাণ ও লোককাহিনীর বিভিন্ন তত্ত্বও প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ম্যাক্স মুলার, এঞ্জেলো দ্য গুবারনেটিস, জন ফিস্ক ও স্যার জর্জ বক্স। কক্সের মতে একই পৌরাণিক ভাষা (Mythical Language)-র দরুন কাহিনীগুলোর সাদৃশ্যমূলক ঘটনাবলির উৎপত্তি ঘটেছে। তিনি আরও বলেন যে, যেহেতু আদিম মানুষ বিশ্ব-চরাচরের সর্ববস্তুতে জীবনকে প্রত্যক্ষ করতো, সেহেতু সূর্য-চন্দ্র-তারকা, মৃত্তিকা, মেঘ-ঝড় ইত্যাদি সবকিছুই তাদের চোখে ছিল জীবন্ত। আর এই বিশ্বাসের ফলে ক্রুদ্ধ প্রকৃতি, উপকারী চন্দ্র-সূর্য-তারকা, অন্ধকার রাত্রি, মৃদুমন্দ বা ঝোড়ো বায়ু ইত্যাদির বর্ণনা করা হত আলংকারিক ভাষায়। এঁরা কোনমতেই বিশ্বাস করতেন না যে, লোক-কাহিনীর অন্তর্গত সাদৃশ্যমূলক ঘটনাবলি একস্থান থেকে অন্যস্থানে নীত হতে পারে। পুরাণের ব্যাখ্যা হিসেবে এঁদের আলোচনা মেনে নিলেও যে-সব কাহিনী আমরা প্রতিদিন ঘরে ঘরে শুনতে পাই তার সাথে পুরাণের সম্পর্ক কি? উত্তরে কক্স্ বলেন, লোককাহিনীও মূলত 'Myths of the phenomena of night and day'...অর্থাৎ দিবারাত্রি বলে যে-দুটো প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে আমরা বহু-পরিচিত তারই রূপক হিসেবে বিচার করতে হবে সব রকমের লোক-কাহিনীকে।

এঞ্জেলো দ্য গুবারনেটিসের 'জুলজিক্যাল মিথলজি' (Zoological Mythology)-তে কক্সের তত্ত্বকে নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

ঊষাদেবী প্রতিদিন পূর্বাকাশে উদিতা হন এবং তিনিই দিবার জাগরণকে প্রথম প্রত্যক্ষ করেন। বলাবাহুল্য নিশিথিনীর অন্ধকারে যারা সূর্য-সম্রাটের (Sun-Prince) আতিথ্য গ্রহণ করেন; ঊষাদেবী তাদের মধ্যে দ্রুতগতিসম্পন্না। প্রভাতে পলায়নপরা ঊষাদেবী পথপরিক্রমাকালে তার পদচিহ্ন কোথাও রেখে যান না। যাই হোক, একদা পলায়নপরা ঊষাদেবী তার ব্যবহৃত পাদুকার এক পাটি ফেলে যেতে বাধ্য হন। মিত্রাস নামক একজন রাজকুমার তার পশ্চাদ্ধাবনকালে পাদুকার পাটিটি দেখতে পান। ঊষাদেবীর পদদ্বয় এতই ক্ষুদ্র ছিল যে তা আর কারো পায়ে লাগে না।

পুরাণ-তত্ত্বের ব্যাখ্যাতারা উপরোক্ত কাহিনীটিতে যে-পৌরাণিকতা বিদ্যমান তারই রূপক খুঁজে পেলেন সিণ্ড্রেলার বহু-পরিচিত লোককাহিনী-

টিতে। তাঁদের ধারণায় এ-ভাবেই পুরাণের সাহায্যে সমস্ত লোককাহিনীর ব্যাখ্যা সম্ভব। বাস্তবে এঁরা করেছেনও তাই।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায় যে, পুরাণ-তত্ত্বের প্রবর্তকরা এ-তত্ত্বের সাহায্যে লোককাহিনী বিচারের পক্ষপাতী। স্টিথ থম্পসন এ-তত্ত্বের সমালোচনা করে বলেন, এসব ব্যাখ্যা অবাস্তব, অত্যদ্ভুত, অবান্তর এবং অবাঞ্ছিত। বিদ্রূপ করে তিনি বলেছেন যে, উপরোক্ত গবেষকদের সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করতে গেলে নিজেদের মাথা ঠিক আছে কিনা সে-কথাটাই আগে ভাবতে হয়। পুরাণের মাধ্যমে লোক-কাহিনীর এ-ধরনের ব্যাখ্যা ১৮৭০ সালের আগে পর্যন্ত বন্ধ হয়নি। ঐ সময়ের কাছাকাছি এন্‌ড্রু ল্যাঙ্ পুরাণ-তত্ত্বে বিশ্বাসী গবেষকদের সিদ্ধান্তসমূহের হাস্যকর দিকগুলো তুলে ধরেন। ল্যাঙ তাঁর দুটো মন্তব্যে ঘোষণা করলেন:

(ক) প্রাকৃতিক ঘটনাবলি যেমন দিবা, রাত্রি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির সঙ্গে লোককাহিনীকে সম্পর্কিত করা অর্থহীন।

(খ) লোককাহিনীর আলোচনায় পুরাণ বা পৌরাণিক ঘটনার রূপক খোঁজা অহেতুক।

ল্যাঙ-এর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে পুরাণ-তত্ত্বের সৌধ একেবারে ধ্বসে পড়ে। ফরাসী গবেষক গাইদোজ তুলনামূলক পুরাণ-তত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে, ম্যাক্স মূলারের সিদ্ধান্তসমূহ আসলে তাসের ঘর এবং মূলার নিজেও একটি Myth বা অবিশ্বাস্য নাম মাত্র।

ভারতীয় তত্ত্ব

গবেষকরা এ-সময়ে নানা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল এ-সময়ে যেমন লোককাহিনীর উপর ঋক্-বেদের প্রভাবের কথা আলোচনা করছিলেন অন্য আর একদল তখন গ্রীম প্রতিষ্ঠিত ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্বকে সার্বিকভাবে অস্বীকার করলেন। ঠিক এ-সময়েই আর একজন গবেষক ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ভারত উপমহা-দেশকে সমস্ত লোককাহিনীর একমাত্র জন্মস্থান বলে ঠাওরালেন। এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা থিয়োডোর বেনফি। ইউরোপে সংগৃহীত লোককাহিনী-

গুলো যে বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশে উদ্ভূত হতে পারে একথা অনেক আগে ১৮৩৮ সালে Loiseleur Deslongchamps বলেছিলেন। বেনফিই প্রথম ১৮৫৯ সালে তাঁর সম্পাদিত 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থের ভূমিকায় ভারতীয় তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করলেন।

বেনফি পঞ্চতন্ত্রের ভূমিকায় যে-সব যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন তা নিম্নে বর্ণিত হল।

(ক) পঞ্চতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কাহিনীসমূহ বিশেষত জীব-জানোয়ার সম্পর্কিত কাহিনীসমূহ কমবেশি ঈসপ-কাহিনীর রূপান্তর।

(খ) কিন্তু তাঁর মতে কিছু কাহিনীর জন্ম বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশে। এতদ্ব্যতীত, তিনি আরও মনে করেন যে, গ্রীক কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বেই বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশ নিজস্ব ধারা ও ভঙ্গীতে লোককাহিনী গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। ভারতীয় জীব-জানোয়ারের কাহিনীর মধ্যে দেখা যায় যে, এ-সব কাহিনীতে জীব-জানোয়ার মূলত মানুষের মতই, তবে তারা জীব-জানোয়ারের খোলস পরিধান করেছে মাত্র। কিন্তু গ্রীক কাহিনীতে জীব-জানোয়ার জীব-জানোয়ার হিসেবেই উপস্থিত। এ-ছাড়া নীতিমূলক বা উপদেশ-সংবলিত জীব-জানোয়ারের কাহিনী বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশেরই দান। বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশের হিন্দুরাই আত্মার রূপান্তরণে বিশ্বাস করতেন। অবশ্য, এ-সব সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করেন যে, নিছক জীব-জানোয়ারের কাহিনী ছাড়া আর সব কাহিনীই বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশে উদ্ভূত হয়েছে। তাঁর মতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর আগে বাংলাদেশ-ভারতের কাহিনীমালা বাইরে নীত হয়নি। তবে তার আগেও মুখে মুখে ব্যবসায়ী ও ভ্রমণকারীদের মাধ্যমে কাহিনী-গুলোর বাইরে প্রচারিত হওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি অস্বীকার করেননি।

বাংলাদেশ-ভারতের কাহিনী কি ভাবে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তার কারণ দর্শিয়ে বেনেফি বলেন:

বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশের সঙ্গে মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে ভারতীয় কাহিনী ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্নস্থানে নীত হয়। তারপরে খ্রীষ্টীয় প্রাচ্য, ইতালী ও স্পেনের মাধ্যমে তা আরও বিস্তার লাভ করে। অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের বিপুল প্রসারের কথা মনে রাখলে দেখা যাবে যে, বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমেই ভারতীয় লোককাহিনী চীন-

দেশে বিস্তৃত হয়। এভাবে একদিকে ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে পশ্চিমে এবং বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে তা প্রাচ্যে বিস্তৃত হয়। বেনফির অন্য আরএকটি মত ছিল এই যে, বৌদ্ধদের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারতীয় লোককাহিনী তিব্বতে পৌঁছয়। আবার তিব্বত থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে মোঙ্গলদের দেশে। মোঙ্গলরা, বেনফির মতে, যেহেতু দুশো বছর ইউরোপ শাসন করেছে সেহেতু বাংলাদেশ-ভারতীয় লোককাহিনী পুনর্বার ইউরোপে প্রচলিত হয়েছে। এছাড়া তুতীনামাহ্‌র মতো সাহিত্যিক ও লিখিত মাধ্যম তো ছিলই। তাছাড়া ইহুদিদের রচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারতীয় কাহিনীর বহির্বিশ্বে প্রসারের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। ইউরোপে বর্ণনামূলক কাহিনীর লিখিত রূপ পাওয়া যায় বোক্কাচিও-র **Decameron**-এর মধ্যে আর রূপকাহিনীর সাহিত্যিক রূপ দেখা যায় স্ট্রাপারোলার মধ্যে। কাজেই বাংলাদেশ-ভারতীয় লোককাহিনী সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকে লোকমুখে এবং লোকমুখ থেকে সাহিত্যিক ঐতিহ্যে বারংবার আবৃত্ত হয়েছে।

এ-সব আলোচনা করে বেনফি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সুস্পষ্ট তিনটি মত এই:

(ক) দশম শতাব্দীর পর ভারতীয় কাহিনীমালা বহির্বিশ্বে নীত হয়।

(খ) ইসলাম ভারতীয় কাহিনীমালাকে পশ্চিমে বিস্তৃত করার ব্যাপারে বিপুল সহায়তা করে।

(গ) বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারতীয় লোককাহিনী চীনে, তিব্বতে ও মঙ্গোলিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। পরে মঙ্গোলিয়ার মাধ্যমে পুনর্বার তা ইউরোপে প্রচারিত হয়।

বেনফির সম্পাদিত 'পঞ্চতন্ত্র' প্রকাশিত হলে তাঁর নির্দেশিত পথে বহু গবেষক কাজ করতে থাকেন। তৎকালে প্রকাশিত বিভিন্ন কাহিনী-সংকলনের তুলনামূলক আলোচনা আরম্ভ হয়ে যায়। ফলত এখান থেকেই শুরু হয় লোককাহিনীর আধুনিক পঠন-পাঠনের ধারা। বেনফির মতামতের সত্যমিথ্যার প্রশ্ন যাচাই না করেও বলা যায় যে, কাহিনী-সংগ্রহগুলোর তুলনামূলক আলোচনা লোককাহিনীর পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে একটি প্রবল প্রেরণা হিসেবে কাজ করতে থাকে।

যাই হোক, বেনফির মৃত্যুর পর, ভাইমারের (জর্মানী) ডুকাল লাই-ব্রেরীর গ্রন্থাগারিক রেইনহোল্ড কোহ্লার বেনফির প্রদর্শিত পথে উল্লেখ-যোগ্য কাজ করেন। সে-সময়ে ইউরোপে যখন যে-মুহূর্তে লোককাহিনীর কোন সংগ্রহ বের হতো তাই তিনি সম্পাদনা করে মুদ্রিত করতেন। এই সম্পাদনার ফলে কাহিনীর মটিফ ও অন্যান্য সাদৃশ্যগুলো পরিচ্ছন্ন হতে থাকে। তাঁর সম্পাদিত কাহিনীসংগ্রহ সর্বদাই যে বাংলাদেশ-ভারতের দিকে দিক-নির্দেশ করেছে তা বলা যায় না। তবু ইউরোপীয় কাহিনীমালায় বাংলাদেশ-ভারতের প্রভাব প্রতিপন্ন করবার দায়িত্ব তিনি কাঁধে নিয়েছিলেন।

কোহ্লারের পর বেনফির সিদ্ধান্তাবলি প্রতিষ্ঠায় যাঁর দান সর্বাধিক তিনি হলেন ইমানুয়েল কস্কুইন। ১৮৬০ সালের কাছাকাছি থেকে প্রায় ত্রিশ বছর তিনি এ-সব বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতে থাকেন। বেনফির পথ অনুসরণ করে তিনি বহু কাহিনী ও কাহিনীর মটিফ নিয়ে আলোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর গবেষণা ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য রেখে যায় অমূল্য অভিজ্ঞতা।

কস্কুইন দু'দিক থেকে বেনফির তত্ত্বের পরিবর্তন সাধন করেনঃ

(ক) মঙ্গোলদের মাধ্যমে ভারতীয় লোককাহিনী ইউরোপে নীত হয়েছে বলে যে-সিদ্ধান্ত বেনফি করেছিলেন তা ধোপে টেঁকে না।

(খ) মিশর থেকে প্রাচীন লোককাহিনীর সংগ্রহ বের হলে প্রমাণিত হয়, বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশেই লোককাহিনীর একমাত্র উৎস নয়। কারণ যে-সময়ে ভারতীয় কাহিনী ভারতের বাইরে নীত হয় বলে বেনফি মনে করেছিলেন মিশরের কাহিনীমালা তারও আগে স্বাধীনভাবে জন্মলাভ করে।

লোককাহিনীর উৎস হিসেবে বাংলাদেশ-ভারত যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র কস্কুইন সেকথা কখনও অস্বীকার করেন নি। লোককাহিনীর আধুনিক গবেষকদের মতেও বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশ লোককাহিনীর ক্ষেত্রে যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ নাম তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন না। তবে তারা বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশকে লোককাহিনীর একমাত্র কেন্দ্র বলে স্বীকার

করেন না। এনড্রু ল্যাঙ-ই এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে এই রায় দেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব তেরো শতকের মিশরীয় কাহিনী এবং হোমার ও হিরো-ডোটাসের রচনায় অন্তর্ভুক্ত কাহিনীগুলোর নিবিষ্ট পাঠে ধরা পড়ে যে ভারত উপমহাদেশেই লোককাহিনীর একমাত্র উৎস বা কেন্দ্র নয়। ১৯২১ সালে কস্কুইনের মৃত্যুর পর বেনফির 'ভারতীয় তত্ত্ব' সকল তাৎপর্য হারায়।

বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্ব

এনড্রু ল্যাঙ লোককাহিনীর উদ্ভব প্রসঙ্গে বলেন:

(ক) লোককাহিনীর মধ্যে যেহেতু বহু আদিম ভাবধারা খুঁজে পাওয়া যায়, সেহেতু ল্যাঙ-এর মতে কাহিনীমাত্রই পুরাকালের ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত।

(খ) লোককাহিনী বিভিন্ন দেশে সভ্যতার স্তরানুযায়ী স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠে। কারণ বিশ্বাস ও আচার-বিচার ইত্যাদি সবদেশে সমানভাবে পাওয়া যায়, অন্তত একই রকম কৃষ্টির আওতায়।

স্টিথ থম্পসন এ-তত্ত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ল্যাঙ একই সঙ্গে বিশ্বের সর্বত্র এক একটি বিশেষ কৃষ্টির উদ্ভব ও অস্তিত্বকে মেনে নেন। আর সেই সঙ্গে তিনি এও মেনে নেন যে, ঐসব বিশেষ কৃষ্টির আওতায় একই সঙ্গে পৃথিবীর সবখানে একইরকম লোককাহিনীমালা গড়ে ওঠে। কিন্তু তাহলে সমান্তরাল কৃষ্টির উদ্ভব তত্ত্বকেও মেনে নিতে হয়। ইতিহাস অবশ্যই এ-সিদ্ধান্তের বিরোধী। কারণ ইতিহাস প্রমাণ দেয় না যে, আফ্রিকা ও ইউরোপে, দূরপ্রাচ্যে ও আমেরিকায় একইসঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সভ্যতা বা কৃষ্টি গড়ে উঠেছিলো। থম্পসন অবশ্য বিশ্বাস করেন যে, ল্যাঙ যা বলেছিলেন তা তিনি নিজেও বিশ্বাস করতেন না অন্তত তাঁর রচনাবলির আন্তরিক পাঠে তা ধরা পড়ে।

বহুমুখী উদ্ভব-তত্ত্বের তাৎপর্যময় দিক হলো এই যে এ-তত্ত্বই প্রথম প্রমাণ করে যে, লোককাহিনী কোনো বিশেষ একটি অঞ্চল বা ভূখণ্ড থেকে জন্মলাভ করে না।

সমান্তরাল উদ্ভব-তত্ত্ব

এনড্রু ল্যাং সমান্তরাল কৃষ্টির উদ্ভবকে স্বীকার করেছিলেন নৃতাত্ত্বিক গবেষণার প্রভাবে। উনিশ শতকে ব্যাপকভাবে নৃতত্ত্বের চর্চার জন্য এটি সম্ভব হয়েছিল। অযৌক্তিক বিশ্বাস, কুসংস্কার, ও অদ্ভুত আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সমগ্র বিশ্বেই খুঁজে পেলেন নৃতত্ত্বের পণ্ডিতেরা। তদুপরি দেখা গেল সভ্য-অসভ্য সকল জাতির মধ্যে সেগুলো বর্তমান। জেমস্ জর্জ ফ্রেজার তাঁর সুবিপুল গ্রন্থ **The Golden Bough**-এ উপরোক্ত তথ্য পরিবেশন করে প্রমাণ করবার প্রয়াস পেলেন যে, পৃথিবীর সব জাতি এক এক সময় কৃষ্টির এক একটি স্তর অতিক্রম করেছে।

স্টিথ থম্পসন এ-মতের সমালোচনা করে বলেন যে, ফ্রেজার প্রমুখের সমান্তরাল তত্ত্ব ধোপে টেঁকে না। কারণ ইতিহাস আসলেই বিবর্তনের ধার ধারে। সভ্যতা ও কৃষ্টি সর্বত্র একইসঙ্গে বর্ধিত হয়নি। এমন কি এঁরা উপজাতি ও গোত্র ইত্যাদির দানের কথা বিবেচনা করেন নি। তদুপরি একই লোক-গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-ঐক্যের বিচারও তাঁরা করেন নি। অবশ্য লোককাহিনী বিচারে বৃটিশ নৃতাত্ত্বিকদের দান অস্বীকার করা যায় না। ম্যাককুলোচের মত গবেষক দীর্ঘকাল 'সমান্তরাল উদ্ভব-তত্ত্ব' ও ল্যাং-এর আদিম ভাবধারার 'উদ্বর্তন (টিঁকে থাকার) তত্ত্ব' নিয়ে কাজ করেছেন। ফলে প্রাচীন লোককাহিনীর সব রকম মটিফের নিরীক্ষা সম্ভব হয়েছিল। কাহিনীর ক্ষেত্রে না হোক, মটিফ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ সূত্র অনুসন্ধান করবার জন্য এঁরা প্রভূত পরিশ্রম করে গেছেন। কিন্তু কাহিনীতে শুধু একটি মটিফই থাকে না। একই সঙ্গে একই কাহিনীতে বহু মটিফ উপস্থিত থাকে। তাছাড়া একই মটিফ পৃথিবীর বহু লোককাহিনীতে পাওয়া যায়। থম্পসনের মতে মটিফ দিয়ে লোক-কাহিনীর উদ্ভবের কারণ নির্ণয় করা যায় না।

নব্য পুরাণ তত্ত্ব

পুরাণ-তত্ত্বের অসারতা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। পুরাণ-তত্ত্বের নিশ্চিত মৃত্যু সত্ত্বেও মার্কিন গবেষক ব্রিনটনের হাতে এ-তত্ত্ব পুনর্বার প্রতিষ্ঠা পায়। তিনি মার্কিন রেড্ ইণ্ডিয়ানদের সূর্য-দেবতার সন্ধান পান

তাদেরই ইরোকোয়াস ও ইজিবাওয়া বীরদের মধ্যে। তিনি তুলনা-মূলক পুরাণের সাহায্যে প্রমাণ করবার প্রয়াস পেলেন যে, সমস্ত জাতির মধ্যে একই ধরনের পুরাণ-কাহিনী পাওয়া যায়। অবশ্য সে-সব পাওয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। এঁরা অবশ্য পুরাণ-কাহিনী বলতে সব রকম কাহিনীকেই বোঝালেন। এহ্‌রেনরিখ্ হলেন এ-মতবাদের আর একজন নেতা। এঁরা এমত পোষণ করেন যে, বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত লোককাহিনীকে বুঝতে হলে কাহিনীর আন্তর-ধর্ম বুঝতে হবে অর্থাৎ কাহিনীর বিষয়বস্তুর অর্থ বুঝতে হবে।

এহ্‌রেনরিখ্ বলেন যে, প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনা, আত্মিক প্রয়োজন হেতু, নির্দিষ্ট বিশেষ রূপকল্পে প্রকাশিত হয়। দেখা যায় যে চন্দ্রের ছায়াপাতের ফলে যে সূর্যগ্রহণ হয়, তা কয়েকভাবে প্রকাশ লাভ করতে পারে। যেমন;

(ক) একজন বীরকে উদরস্থকরণ, (খ) অতিকায় দানবের সঙ্গে বীরের লড়াই, (গ) চন্দ্র কর্তৃক অগ্নিদহে ঝম্প-প্রদান, (ঘ) একটি পাত্রে চন্দ্রের দগ্ধ হওয়া ও (ঙ) সূর্য কর্তৃক চন্দ্রের অবৈধ যৌনসম্ভোগ।

চাঁদের ক্ষয় ও বৃদ্ধি এভাবে লোককাহিনীকে আরও মটিফ দিতে পারে:

(ক) কালো বর্ণে রঞ্জিত করা, (মানুষ বা জন্তু-জানোয়ারকে) (খ) তিনদিনের অনুপস্থিতি বা লুকানো, (গ) কাস্তের সাহায্যে মস্তক ছেদ করা, (ঘ) একের বদলে অন্যের প্রতিস্থাপন ও (ঙ) ছদ্মবেশ ধারণ।

এহ্‌রেনরিখ্ যে-আলোচনা শুরু করেন, লাবাহুল্য তাও সমান্তরাল কৃষ্টির উপর ভিত্তি করে রচিত। কেননা তাঁর ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী একই প্রাকৃতিক ঘটনাবলি একই ধরনের পুরাণ সৃষ্টি করতে বাধ্য। তাঁর মতে যে-সব প্রাকৃতিক ঘটনাবলি সমস্ত পৃথিবীতে কাহিনী সৃষ্টি করে সেগুলো হল সূর্য, চন্দ্র, ও বিশেষ বিশেষ নক্ষত্র। স্টিথ থম্পসনের মতে এই 'জ্যোতিষ্ক পুরাণ' কাহিনীর বিচারে সাদৃশ্য প্রমাণ করে বটে, কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। তাছাড়া এর কোন প্রমাণ নেই যে, পৃথিবীর সব জাতিগুলো 'জ্যোতিষ্ক পুরাণ' নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে।

দ্বি-ঈশ্বর তত্ত্ব

কোন কোন পুরাণ-বিশেষজ্ঞ দূরস্থিত স্থানে প্রাপ্ত কাহিনীর মধ্যে একই রকম চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ দেখে আর একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। উদাহরণস্বরূপ দুই বীর বা দুই ঈশ্বরের অস্তিত্ব একই কাহিনীতে পাওয়া যায়। এবং প্রায় ক্ষেত্রে দুজনে একই অভিযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। রেণ্ডেল হ্যারিস তাঁর Cult of Heavenly Twins গ্রন্থে একই কাহিনীতে দুজন বীর বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। হ্যারিসের মতে এই 'স্বর্গীয় জোড়' আবিষ্কারের ফলে লোককাহিনী ও পুরাণের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। স্টিথ থম্পসন এ-তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করে বলেন যে, এ-ধরনের কাহিনী সব জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না। অবশ্য হ্যারিসের গবেষণা এ-কারণে মূল্যবান যে বহু কাহিনীর মধ্যে একই মটিফের পুনরাবৃত্তির আবিষ্কার একটি অনন্য অভিজ্ঞতা।

স্বপ্নতত্ত্ব

লোককাহিনীর বহু মটিফ যে আদিম পৃথিবী ও সমাজের স্বাক্ষর বহন করে তা সত্য। এনড্রু ল্যাঙ, ম্যাককুলোচ ও হার্টল্যাণ্ডের মত গবেষকরা এ-বিষয়ে প্রভূত গবেষণা করেছেন। কিন্তু স্বপ্নে-দেখা ঘটনাবলিই যে পুরাণ ও লোককাহিনীর বিষয়বস্তু একথা প্রথম আলোচনা করেন ফ্রেড্রিখ ভন ডার লেইয়েন।

লুড্‌ভিগ্ লেস্টনার নামে আর একজন বিশেষজ্ঞ লেইয়েনের মতামতকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যান। তাঁর মতে লোককাহিনীর অর্থ স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যার মাধ্যমেই বুঝতে হবে। অন্যদিকে ফ্রয়েড-ইয়ুং প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকেরাও স্বপ্ন, লোককাহিনী ও পুরাণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। ফ্রয়েডের মতে অবদমিত ইচ্ছেসমূহ স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ লাভ করে এবং পরে তা লোককাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ইয়ুং স্বপ্ন ও পুরাণকাহিনীর গুরুত্ব নানা দিক থেকে বিবেচনা করেছেন। স্টিথ্ থম্পসনের মতে এঁরা কখন কোথায় কিভাবে লোককাহিনী গড়ে উঠে তা আলোচনা না করেই

লোককাহিনীর উদ্ভবের ব্যাখ্যা করেন। এ-জাতীয় ব্যাখ্যা লোককাহিনীর উৎপত্তির ব্যাপারে খুব কাজে আসে না। বড়জোর এ-প্রসঙ্গে তাঁরা বিশেষ বিশেষ সম্ভাবনার কথা বলেন মাত্র।

ক্রিয়াতত্ত্ব

সাঁতিভস্ আদিম জীবন-ব্যবস্থার একটি বিশেষ দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে লোককাহিনী সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন। এই দিকটি হলো আদিম জীবনের জন্য অপরিহার্য নানারকম ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান (Rites)। ফরাসীতে যখন পেরল্ট তাঁর কাহিনী সংগ্রহ বের করলেন তখন সাঁতিভস্ সংকলনের প্রতিটি কাহিনীর উদ্ভবের ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন বলে মনে করলেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি পুরাণ-তত্ত্বের উদ্গাতাদের তীব্র সমালোচনা করলেন। তাঁর মতে পেরল্টের কাহিনীগুলোর কিছু এসেছে ঋতুর সঙ্গে সম্পৃক্ত ক্রিয়া থেকে। আবার কিছু এসেছে দীক্ষা-সংক্রান্ত ক্রিয়া (Initiation Rites) থেকে। অন্য কতকগুলোর মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন মধ্যযুগীয় ধর্মীয় উপদেশ বা তার অংশবিশেষ।

প্রতীক তত্ত্ব

পৃথিবীতে এমন বহু সম্প্রদায় ছিল যারা কুসংস্কারে বিশ্বাস করতো। নৃতত্ত্বের সাহায্যে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের পরীক্ষা করে একজন গবেষক একটি সাধারণ সত্যে পৌঁছন। ইনিই হলেন আর্ণল্ড ভ্যান গেনেপ। আদিবাসীদের বিশ্বাসের মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের প্রভাব দেখে গেনেপ বিস্ময় বোধ করেন। কারণ এসব আদিবাসীরা প্রাণীকে প্রতীক বা স্বসম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ বলে মনে করবার ফলে প্রাণীদের কেন্দ্র করে নানা রকম ক্রিয়া (Rite)-র উদ্ভব হয়। ক্রিয়ানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণের আবৃত্তি ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাঁর মতে এর থেকে লোককাহিনীর উদ্ভব হয়। তিনি আরও মনে করেন যে, প্রাচীন পুরাণ-কাহিনী দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে ছিল শিক্ষাবিশেষ। লোককাহিনী যে মূলত পুরাণ

ও স্থানিক কাহিনী থেকে এসেছে, এও ছিল তাঁরই বিশ্বাস। স্টিথ থম্পসন মনে করেন যে সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার (যা Totemism-য়ের অন্তর্গত) সর্বদা ও সর্বত্র লোককাহিনীর জন্ম দেয় নি।

মৃতের প্রত্যাবর্তন তত্ত্ব

গেনেপের সঙ্গে কমবেশি একমত হয়ে হ্যান্স নৌম্যান নামে আর একজন গবেষক বলেন যে, সবরকম লোককাহিনী যেমন পুরাণ, বীরকাহিনী ও রূপকাহিনী মূলত একই বস্তু। তিনিও বলেন যে, লোককাহিনীর সব মটিফ আদিম সমাজ থেকেই এসেছে। আদিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড ও বিশ্বাসের উপরে তা প্রতিষ্ঠিত। নৌম্যানের মতে মৃত মানুষের আত্মা যাতে ফিরে না আসে সেজন্য ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান পালন করা হত। কেননা আদিম মানবের বিশ্বাস ছিল যে, মৃতের আত্মা ফিরে এলে তাদের ক্ষতি সাধন করবে। নৌম্যানের বিশ্বাস সমস্ত লোককাহিনীই মৃতের আত্মার প্রত্যাবর্তন যাতে না হয় সেজন্য নানা ক্রিয়ার কথায় পরিপূর্ণ আর না হলে লোককাহিনীমাত্রই মৃতের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মৃতের প্রতি ভয় থেকে সৃষ্টি হয়েছে সব ভূতের কাহিনীর। আদিম মানুষ মৃত মানুষকে নাকি ভূত ছাড়া অন্য কোন অর্থে ভাবতে পারতো না। যে-কাহিনীতে একই সঙ্গে একজন ভূত ও একজন বীর অবস্থান করে সেখানে ভূতের ভয়কে জয় করার জন্য বীরকে আমদানী করা হয়।

গেনেপ ও নৌম্যানের মতামতের সমালোচনা করে স্টিথ থম্পসন বলেন যে, আসলে দুজন আদিম সমাজের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস ও আচার-ব্যবহারের ঐক্য দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বের সমস্ত আদিম সমাজ একই রকম ছিল এ-মত ভ্রান্ত। সুতরাং উভয়ের মতামত সীমাবদ্ধ অর্থে সত্য। কারণ একটিমাত্র ফর্মুলা দিয়ে তাবৎ লোক-কাহিনীর বিচার অবান্তর। এ-ছাড়া ইতিমধ্যে নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রভূত গবেষণার ফলে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণাই পাল্টে গেছে। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গেনেপ ও নৌম্যান উভয়েই লোককাহিনীর বহুমুখী উদ্ভব-তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন।

নৃতাত্ত্বিক গবেষণা লোককাহিনী আলোচনার ক্ষেত্রে বহু তথ্যের সন্ধান দিয়েছে। আবার বহু শ্রেষ্ঠ নৃতাত্ত্বিক গবেষকদের আলোচনা একদেশদর্শী বলেও প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক সভ্য সমাজ ছাড়া অন্যান্য যে-সব সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও তা সবসময় সত্য নাও হতে পারে। আজকের দিনে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক চেতনা বৃদ্ধির ফলে দেখা যাচ্ছে, কতকগুলো দেশের সংস্কৃতি অন্য আর একটি দেশের সংস্কৃতির চতুর্দিক ঘিরে আছে এবং সেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। অথচ প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক গবেষক মেলিনোওস্কি ট্রোবিয়াণ্ড দ্বীপের লোকসংস্কৃতি বাইরের কোনও সংস্কৃতির দ্বারা একেবারে প্রভাবান্বিত হয়নি বলে মনে করেন। তাঁর মতে এ-দ্বীপের লোককাহিনীমালা একই সঙ্গে বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, ধর্ম, আইন-কানুন ও কৃষির মত নানা বিষয়ের প্রতীক। মেলানেশীয় অধিবাসীদের সম্পর্কে তার গবেষণা আরও বিস্ময়কর ভাবে সমৃদ্ধ। অথচ লোককাহিনীর আলোচনাকালে তিনি আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলেন। স্টিথ থম্পসনের মতে লোককাহিনী একটি আন্তর্জাতিক বিষয় তাকে কোনও বিশেষ আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়।

পরবর্তীকালে মেলিনোওস্কির গবেষণা, বিশেষ করে, প্রাচীন লোক-কাহিনীর ক্ষেত্রে, ফ্রান্জ বোয়াসের রচনাবলীতে নতুন তাৎপর্য লাভ করে। কারণ তিনি বিশেষভাবে কোয়ৎকিউৎল্ সম্প্রদায়ের কাহিনীর সঙ্গে পরি-চিত ছিলেন। এছাড়া তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোককাহিনীর গবেষণাও করেছিলেন। অন্যদিকে বিশ্বের লোককাহিনীর সঙ্গেও তাঁর অল্পাধিক পরিচয় থাকায় তাঁর পক্ষে কাজ করবার খুব সুবিধা হয়েছিল। স্টিথ থম্পসনের মতে আদিম মানবসমাজের লোককাহিনী সংক্রান্ত বিষয়ে বোয়াস চূড়ান্ত মতামত দিতে সক্ষম হয়েছেন। পুরাণ ও লোককাহিনীর মধ্যেকার পার্থক্য তাঁর আলোচনায় বিপুলভাবে কমে আসে। তিনি বিশ্বাস করেন, পুরাণ লোককাহিনী থেকে এবং লোককাহিনী পুরাণ থেকে প্রভূত বিষয় আত্মসাৎ করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

দেশে দেশে লোককাহিনীর সংগ্রহ

উনিশ শতকের শেষাশেষি লোককাহিনী তো বটেই লোকসাহিত্যের সকল দিক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। অবশ্য তার আগে যে সমস্ত গবেষক ও পণ্ডিত লোককাহিনী সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌছান পর-বর্তীকালে সেগুলো ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়। অবশ্য সেইসঙ্গে একথা মানতে হবে যে একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনার যে-সূত্রপাত তাঁরা করেছিলেন, তাঁদের মতামত ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হলেও, সে-কারণেই তাঁরা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ভিল্‌হেল্‌ম্‌ গ্রীম, বেনফি, ম্যাক্সমুলার এবং এনড্রু ল্যাঙ সবাই লোককাহিনীর প্রকৃতি, উদ্ভব এবং বিস্তৃতি সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ তথ্য ও তত্ত্ব যোগাবার প্রয়াস পেয়েছেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সযত্ন গবেষণা আজ পরিত্যক্ত হয়েছে। আর তাছাড়া উনিশ শতকে লোককাহিনীর প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যাপক সংকলন প্রকাশিত না হওয়ার ফলে খুব নির্ভুল বা সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি। উনিশ শতকের পণ্ডিত ও গবেষকরা নানা কারণেই সামান্য মাল-মশলা বা তথ্য নিয়ে কাজ করেছিলেন। আজ যখন লোককাহিনীর গবেষণা একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পেয়েছে, তখন পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে, তথ্যের পরিমাণ যতই কম হোক না কেন, বহু বড় বড় পণ্ডিত তাই দিয়েই গবেষণার কাজ চালাবার সাহস দেখিয়েছিলেন সেদিন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সেদিনকার পণ্ডিত ও গবেষকরা লোককাহিনী সম্পর্কে পড়া-শোনা করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। এতে লোককাহিনী সম্বন্ধে আলোচনা বিস্তৃত হলেও সে-সব আলোচনা ছিল ত্রুটিযুক্ত। ভিলহেলম গ্রীম ও তাঁর অনুরাগী গবেষকরা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব ও ইন্দো-ইউরোপীয় লোককাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন এবং এর ফলে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন লোককাহিনী মাত্রই একটি সাধারণ

উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অন্য আর একদল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আবর্তন ও পৃথিবীর আবহাওয়াগত পরিবর্তন দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে, মানুষ সভ্যতার আদিম অবস্থায় উপরোক্ত ঘটনাবলিতে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল, যার নিগূঢ় পরিচয় রয়েছে লোককাহিনীর অঙ্গে অঙ্গে। অন্য আর এক দল বেনফির নেতৃত্বে বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশকেই লোককাহিনীর একমাত্র জন্মস্থান বলে ঠাওরালেন। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডের পণ্ডিত ও গবেষকরা সংস্কৃতির সমান্তরাল বিকাশ নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন তত্ত্ব খাড়া করে আত্মতুষ্টিলাভ করবার প্রয়াস পেলেন। কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত যে লোককাহিনীর আলোচনায় নিরাপদ লক্ষ্যে নিয়ে যায় না তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি।

এসব কারণেই লোককাহিনীর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যাঁরা বিশ্বাস করতেন তারা ধীরে ধীরে ব্যাপকভাবে গবেষণা শুরু করলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৮৮৮ সালের দিকে গবেষকরা লোককাহিনীর বিশ্বাসযোগ্য মাল-মশলা ও তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। এছাড়া পূর্বের সংগৃহীত তথ্যাদিও তাঁরা কাজে লাগালেন। দৃষ্টিভঙ্গিকে যথাসম্ভব কুসংস্কারমুক্ত রেখে, একমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে তারা লোককাহিনীর পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। যাই হোক্, এ-সময়েই লোকসাহিত্য সম্পর্কিত অঢেল পত্র-পত্রিকা ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হতে থাকে। যার ফলে লোককাহিনীর সংগ্রহ ও পঠন-পাঠনও বেড়ে যায়। ১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে ইউরোপের সকল দেশ তো বটেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও লোকসাহিত্যের পত্রিকা প্রকাশিত হয়। লোকসাহিত্যের উৎসাহী গবেষক ও পণ্ডিতদের হাতে দুটি মহাদেশে লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য চর্চা শুরু হয়। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন।

ফ্রান্স

এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই ফরাসী গবেষক ও পণ্ডিতদের নাম উল্লেখ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল ধরে ফরাসী গবেষকরা লোকসাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করেন এবং ফরাসী দেশে

লোকসাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে একটি স্বর্ণযুগের পত্তন করেন। **Melusine** পত্রিকার সম্পাদক এইচ. গাইদোজ (১৮৪২—১৯৩২)-এর নাম এক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি লোককাহিনী সংগ্রহে প্রেরণা দান করে এবং এ-প্রসঙ্গে নানা নিবন্ধাদি রচনা করে লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিপুল অধ্যায় সংযোজিত করেন। স্টিথ্ থম্পসনের মতে গাইদোজের সবচেয়ে বড় দান এইখানে যে, তাঁরই আক্রমণের ফলে মুলার প্রমুখ পণ্ডিতদের পুরাণ-তত্ত্বের সাধের সৌধটি একেবারে চিরকালের মত ধ্বসে যায়।

উনিশ শতাব্দীর শেষ দিকে লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে **Revue des Traditions Populaires** পত্রিকার সম্পাদক **Paul Sebillot** (১৮৪৬—১৯১৮ সাল) একটি নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করলেন। পত্রিকাটি ত্রিশ বছর ধরে লোককাহিনী প্রকাশ করে। তাছাড়া ঐ পত্রিকাতেই **Sebillot** ও তাঁর সহকর্মীদের মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সের ব্রিটানী থেকে লোককাহিনী তো বটেই লোকসাহিত্যের নানা উদাহরণ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করেই ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকসাহিত্যের উদাহরণ সংগৃহীত হয়।

ফরাসী গবেষকদের মধ্যে ইমানুয়েল কস্কুইনের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর আগেই তিনি লোককাহিনীর সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে এ-ব্যাপারে প্রভূত পরিমাণে উৎসাহিত করেছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের লোরেন অঞ্চলে লোককাহিনী সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। এবং সংগৃহীত কাহিনীগুলো **Contes Populaires de Lorraine** নামে ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। বলা হয়ে থাকে যে লোককাহিনীর সংগ্রহ হিসেবে গ্রীমের **Household Tales** যে-মূল্যের অধিকারী **Contes Populaires de Lorraine**-ও ঠিক সেই মূল্যেরই দাবিদার। প্রতিটি কাহিনীর শেষে তিনি যে টীকা-টিপ্পনী সংযোজিত করেন তা একান্তই মূল্যবান। কস্কুইন ছিলেন বেনফির শিষ্য। এবং সে কারণেই তিনি প্রতিটি কাহিনীর মূল ও কাহিনীর মটিফের উৎস যে বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশ একথা প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য সবসময় তিনি যে তা করেছেন তা নয়। তাঁর কতকগুলো মন্তব্য পরবর্তীকালে তাৎপর্যময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি বাংলাদেশ-ভারতীয়

কাহিনীর চেয়ে মিশরীয় গল্প যে প্রাচীনতর এ-কথা প্রমাণ করেন। অবশ্য সেই সঙ্গে এ-বিশ্বাস তাঁর কখনও শিথিল হয় নি যে বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশেই হল প্রাচীন কাহিনীমালার এক বিপুল আধার।

Sebillot ও **Cosquin** যদিও বিংশ শতকেও কাজ করেছিলেন তবু ফরাসী দেশে লোককাহিনী পঠন-পাঠনের চর্চা কমে যায়। তার প্রধান কারণ **Joseph Bedier** নামে একজন পণ্ডিত-গবেষক ১৮৯৩ সালে **Les Fabliaux** নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি একে একে লোককাহিনীর পৌরাণিক তত্ত্ব, ভারতীয় তত্ত্ব, এবং নৃতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তসমূহে এক চূড়ান্ত আক্রমণ করেন। ফলে উনিশ শতকের প্রিয় তত্ত্বসমূহ ধূলিসাৎ হয়। এছাড়া তিনি লোককাহিনীর বিভিন্ন ভাষ্যের সংগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করায় লোককাহিনীর আলোচনায় ভাঁটা পড়ে যায়।

ইংল্যাণ্ড

উনিশ শতকের শেষাশেষি ইংল্যাণ্ডে লোকসাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে একটা নতুন প্রেরণা দেখা দেয়। অবশ্য প্রেরণাটির মূলে ছিল নৃতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তসমূহ। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা লোকসাহিত্যের সকল উপাদানকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'পূর্বতন সংস্কৃতির ভগ্নাংশ' বলে রায় দিলেন। এন্ড্রু ল্যাণ্ড (১৮৪৪—১৯১২) এই মতামতই প্রকাশ করেছিলেন। তবে লোক-কাহিনীর সকল ভাষ্যকে যে ঐ একই সিদ্ধান্তের আলোকে বিচার করা যায় না একথাও তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর অনুসারীরা বিশেষ করে জে. এ. ম্যাককুলোচ (১৮৬৮-) ল্যাণ্ড-এর লোককাহিনীর 'বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্ব' সম্বন্ধে বহুকাল উৎসাহী আলোচনা করে গিয়েছেন। যাই হোক, ১৮৯১ সালে লণ্ডনে ইণ্টারন্যাশনাল ফোকলোর কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসে তাতে বিভিন্ন মতামতে বিশ্বাসী গবেষক ও পণ্ডিতরা স্ব-অভিমত ব্যক্ত করবার সুযোগ পান। ইংল্যাণ্ডের পণ্ডিত ও গবেষকরা ইউরোপে লোককাহিনী সংক্রান্ত বিষয়ে যে সমস্ত পঠন-পাঠন হয়েছে সে-সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। ইংল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত **Folklore** পত্রিকা দীর্ঘকাল ধরে একটা উন্নত মান বজায় রেখে কাজ করেছেন।

জোসেফ জ্যাকব্‌স্ (১৮৫৪—১৯১৬) ও ল্যাঙ উভয়ে লোককাহিনীর অনেক সংগ্রহ প্রকাশ করেন। যার ফলে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের মনে লোক-কাহিনী সম্পর্কে নতুন চেতনা দেখা দেয়। ম্যারিয়ান এমিলি রোয়াল্‌ফ্ কক্স (১৮৬৯—১৯১৬) এবং ই. সিড্‌নী হার্টল্যাণ্ড (১৮৪৮—১৯২৭) একটি একক কাহিনী নিয়ে গবেষণা করেন। কক্স 'সিণ্ড্রেলা' ও হার্টল্যাণ্ড "পার্সিয়াসের পুরাণ কাহিনী" সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করেন। আর এই হল একই লোককাহিনীর বিভিন্ন পাঠান্তর নিয়ে কাজ করবার প্রথম সার্থক চেষ্টা।

ডেনমার্ক

স্‌ভেন্দ্ গ্রুন্দ্‌ৎভিগ উনিশ শতকের মাঝামাঝি ডেনমার্কে লোক সাহিত্যের সব রকম উদাহরণ সংগ্রহ করতে থাকেন। পরে ই. টি. ক্রিশ্চেনসেন ও এইচ. এফ্. ফিলবার্গ প্রমুখ উৎসাহী গবেষকদের প্রচেষ্টায় এবং এক্সেল ওলরিকের নেতৃত্বে ১৯০৪ সালে লোককাহিনী তো বটেই লোকসাহিত্যের সব দিক নিয়ে পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে **Dansk Folkemindesamling** নামে একটি প্রতিষ্ঠানই গড়ে ওঠে। ওলরিক বিস্তৃত বাস্তব তথ্যাদির সঙ্গে যেমন পরিচিত ছিলেন তেমনি ছিল তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। ওলরিক ডেনমার্কের লোকসহিত্যের যে সংকলন প্রস্তুত করেন তা সমগ্র বিশ্বের কাছে আদর্শ বলে গণ্য হতে পারে। অবশ্য ওলরিকের সবচেয়ে বড় দান এইখানে যে, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি লোককাহিনী বা লোকসঙ্গীত মৌখিকভাবে হস্তান্তরিত হওয়ার সময় তাতে কিভাবে পরিবর্তন সাধিত হয় তার সূত্রসমূহ বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়া সমগ্র বিশ্বের লোকসাহিত্যের সমস্ত গবেষক, ছাত্র ও কর্মীদেরকে একই অঙ্গনে মিলিত করা ও তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল নিরলস ও আন্তরিক।

জার্মানী

থিয়োডোর বেনফির 'ভারতীয় তত্ত্ব' যখন খুবই জনপ্রিয় ছিল তখন জার্মানীতে লোককাহিনীর তুলনামূলক পঠন-পাঠনের একটা হিড়িক পড়ে

যায়। অবশ্য তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বেনফির 'ভারতীয় তত্ত্ব'কে প্রমাণ করা। এই ধারার উল্লেখযোগ্য গবেষক ছিলেন ভাইমারের ডুকাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক রেইনহোল্ড কোহ্লার (১৮৩০—১৮৯২)। প্রকৃত-পক্ষে কোহ্লার কাহিনীর প্লট ও মটিফের সাদৃশ্য বের করবার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। সে-আমলে লোককাহিনীর যত সংকলন বের হতো তার অধিকাংশই তিনি বিস্তৃত তথ্যবহুল টীকা-টিপ্পনীসহ সম্পাদনা করতেন।

কোহ্লারের প্রদর্শিত পথে কাজ করতে এগিয়ে এলেন **Johannes Bolte** (১৮৫৮—১৯৩৭)। জার্মানীর লোককাহিনীর পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবচাইতে বড় গবেষক। প্রথম দিকে জার্মানীর ষোড়শ শতকের 'হাস্যরসাত্মক কাহিনী'র সংগ্রহসমূহ তাঁর মূল্যবান টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা সহযোগে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা সন্নিবেশিত করেন। এগুলো এবং তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধসমূহ পরে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়। এছাড়া লোকসাহিত্যের অনুরাগী পাঠক সমাজের জন্য বিশ্বের কোথায় লোকসাহিত্যের কোন্ নতুন সংকলন প্রকাশিত হল অথবা লোকসাহিত্য সম্বন্ধে কোথায় কোন্ নতুন আন্দোলনের সৃষ্টি হল, সে-সব সংবাদ পরিবেশন করে তিনি আজীবন একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। অবশ্য তাঁর সবচাইতে বড় দান গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের **Household Tales**-এর সম্পাদনা। এই কাজে তিনি তাঁর জীবনের ত্রিশটি বছর নিরলসভাবে ব্যয় করেন। প্রাগের **Georg Polivka** এই সম্পাদনায় ছিলেন তাঁর সহযোগী। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের **Household Tales** এঁদের হাতে পাঁচ পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইউরোপীয় লোককাহিনীর তুলনামূলক পঠন-পাঠনের মূল ভিত্তি রচনা করে উপরোক্ত গ্রন্থ।

জার্মান লোককাহিনীর গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি যে প্রবল প্রেরণার সৃষ্টি করেন তারই ফলে জার্মানীর তরুণ গবেষকরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন।

ফিনল্যাণ্ড

লোককাহিনীর আন্তর্জাতিক গবেষণার ক্ষেত্রে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অন্তর্গত ফিনল্যাণ্ডের দান সবচাইতে বেশি। অবশ্য লোককাহিনীর প্রতি

ফিনল্যাণ্ডের জনসাধারণের আগ্রহ ও অনুরাগ প্রকাশ পায় ১৮৩৫ সালে **Kalevala** নামক তাঁদের জাতীয় মহাকাব্য মুদ্রিত হওয়ার পর। এই মহাকাব্য মূলত কতকগুলো বীরত্বমূলক গীতিকার সংকলন। **Elias Lonrott** সংগৃহীত গীতিকাসমূহকে অর্থপূর্ণ উপায়ে শ্রেণীবদ্ধ করেন এবং সংকলনটিকে একটি শিল্পসুলভ মহিমা দান করেন। এতকাল যে-সমস্ত গীতিকা শুধুমাত্র দেশের গায়কদের মুখে মুখে ফিরতো আজ তা গোটা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত হল। সবচেয়ে বড় কথা, এই সংগ্রহকে কেন্দ্র করেই ফিনল্যাণ্ডের রাজনৈতিক শক্তিগুলো একত্রিত হল আর গড়ে উঠলো ফিনল্যাণ্ডের নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদ। এরই ফলে লোককাহিনীর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে সকলের অনুসন্ধিৎসাও একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলো।

লনরটের সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন জুলিয়াস ক্রোন। 'কালেভালা' গল্প-মালার অন্তর্গত গীতিকাগুলোর পঠন-পাঠন করেই তাঁর ছাত্রজীবন ব্যয়িত হয়। গীতিকাগুলোর বিভিন্ন পাঠান্তর সংগ্রহ করে ও তাদের তুলনামূলক পঠন-পাঠন সম্পন্ন করে তিনি প্রতিটি গীতিকার সম্ভাব্য জীবনকাহিনী নির্মাণ করেন। বলা বাহুল্য, যে-পদ্ধতিতে এ-কাজটি তিনি করতেন তা প্রধানত গীতিকাগুলোর মটিফ নির্ণয়ের উপরই নির্ভর করতো। এরপর তিনি প্রতিটি মটিফ কতটা বিস্তৃত হয়েছে তা স্থির করতেন। এটি করবার সময় দেশের কোন্ ভৌগোলিক অঞ্চলে কোন্ মটিফ কতটা ছড়িয়ে আছে তাও নির্ণয় করতেন। মটিফগুলো যখন দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তো তখন মটিফগুলোর যে-সব পরিবর্তন ঘটতো তাও তিনি গাণিতিকভাবে স্থির করতেন। এই পদ্ধতিই 'ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি' নামে পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধি লাভ করে। জুলিয়াস ক্রোনের সুযোগ্য পুত্র কার্ল ক্রোন (১৮৬৩—১৯৩৩) লোককাহিনীর পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি ফিনল্যাণ্ডের 'জীব-জানোয়ারের কাহিনী' নিয়ে গবেষণা করেন। এরপর তিনি 'মানুষ ও খেঁক্‌শিয়াল' নামক কাহিনীমালার গবেষণায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। আর এই কাজটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে যেয়ে তিনি অনুভব করেন যে, লোককাহিনীর পঠন-পাঠনকে বৈজ্ঞানিক করতে হলে আন্ত-র্জাতিক পর্যায়ে লোককাহিনী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পঠন-পাঠন একান্ত প্রয়োজনীয়।

বাংলাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশ

বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশে লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস বিচিত্র। কারণ ইউরোপের দেশে দেশে সেখানকার স্বাধীন জনগণের ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের লোকসংস্কৃতিকে জানবার আকাঙক্ষা প্রবল হয়ে ওঠার ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লোককাহিনী তো বটেই, লোক-ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপাদান সংগৃহীত হয়। বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশের লোক-ঐতিহ্য এবং তার বিভিন্ন উপাদান সংগৃহীত হয় প্রধানত ব্রিটিশ রাজকর্মচারী, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও ইউরোপীয় মিশনারীদের আগ্রহে। এই আগ্রহেরও মৌলিক কারণ ছিল বাংলাদেশ-ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে একটি লাভজনক উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তোলা। কোম্পানীর আমল থেকে শুরু করে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ নিজের গরজে বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশে নিজেদের শাসন ক্ষমতা দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করবার সংগ্রাম চালিয়েছে। ক্রমাগত উপলব্ধির মাধ্যমে এ-কথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুভবে ধরা পড়ে যে, বাংলাদেশ-ভারত উপ-মহাদেশের মত একটি বিরাট দেশকে শাসন করতে হলে বাংলাদেশ-ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রার সকল মাধ্যমকে বুঝতে হবে। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শেষাশেষি ইংরেজ শাসকবর্গ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করে।

কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর এ-পরিবর্তন সত্ত্বেও ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা সর্বদা বাংলাদেশ-ভারতীয় জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল একথা সত্য নয়। অবশ্য দু'চারজন সদয় ব্যক্তির সন্ধান যে পাওয়া যায় না তা নয়। অনেকেই বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশের জনগণকে আন্তরিকভাবে ভালবেসে ছিলেন। কিছু কিছু দক্ষ শাসনকর্তা যেমন বেন্টিঙ্ক, কার্জন, মিণ্টো ও হার্ডিং-এর মত ব্যক্তিরা এ-উপমহাদেশের নানা সংস্কার সাধন করে যশস্বী

হয়ে আছেন। এমন কি অনেক রাজকর্মচারী এদেশের জনগণের এত কাছাকাছি এসেছিলেন যে, জনগণও তাঁদেরকে কবিতায়-গাঁথায়-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। বাস্তবিক যতদিন ব্রিটিশ কর্মচারীরা বাংলাদেশ-ভারতীয় জনগণের সান্নিধ্যে আসেনি ততদিন শাসন ও শাসিতের মধ্যে একটা বোঝাবুঝিও হয়নি। এই পারস্পরিক বোঝাবুঝির সুফল ফলে বাংলাদেশ-ভারতীয় লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে। এ-প্রসঙ্গে ডঃ মযহারুল ইসলাম বলেন ঃ

'লোক-ঐতিহ্য, জাতিবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্মচারীরা যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে তার মূলে ছিল ব্রিটিশ কর্মচারীদের সঙ্গে বাংলাদেশ-ভারতীয় জনগণের যোগাযোগ।"[১৩]

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই উপমহাদেশে প্রচলিত বিধিবিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করতে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারতীয় জনগণের জীবনাদর্শের খোঁজখবর নিয়ে জনগণকে শাসন করবার ইচ্ছা জেগেছিল খুবই ধীরে। দুটি বিষয়ে ব্রিটিশ শাসকবর্গ অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে। এর একটি হল বাংলাদেশ-ভারতীয় জনসমাজের গঠন-প্রণালীকে উপলব্ধি করা আর অন্যটি হল বাংলাদেশ-ভারতের গ্রামীণ জীবনযাত্রাকে পশ্চিমা দেশগুলোর সামনে তুলে ধরা।

এই উপলব্ধিই লর্ড কার্জনকে বাংলাদেশ-ভারতীয় জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করে এবং এরই ফলে ১৯০৩ সালে তিনি সমগ্র বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশব্যাপী জাতিতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালানোর নির্দেশ দেন। ঐ বছরেই স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন বাংলাদেশ-ভারতীয় ভাষা সমূহের একটি পর্যালোচনা **Linguistic Survey of India** নামক একটি গ্রন্থে প্রকাশ করেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে এভাবেই জাতিবিজ্ঞান, লোক-ঐতিহ্য ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা শুরু হয়ে যায়। জাতিবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু লোক-ঐতিহ্য বিশেষত

[১৩] The relationship of the British officers with the Indian people has considerable bearing on the role which British played in the field of folklore, ethnology and anthropology.

Dr. Mazharul Islam, A History of English Folktale Collections in India and Pakistan. পৃঃ ২০।

লোককাহিনী সংগ্রহের ব্যাপারে কর্মচারীদের নিকট-আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও খ্রীষ্টান-পাদরীরা উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

ভারত উপমহাদেশে প্রথমে ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় এবং পরে মার্কিন পাদরীরা ভারতীয় লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হন। প্রথম দিকে পাদরীরা খ্রীষ্টানী আদর্শের প্রচার করতে গিয়ে এই উপ-মহাদেশে হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারী ও এতিমখানা স্থাপন করে এবং অন্যদিকে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করে। অবশ্য এর উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার যথাযোগ্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, এসব প্রচেষ্টার ফলে এই উপমহাদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচিতি ঘটে।

পাদরীরা ঈশ্বর ও ঈশ্বর-পুত্র খ্রীষ্টের বাণী বহন করে এদেশে এসে-ছিলেন মানুষের পারমার্থিক উন্নতির জন্য। আর-সে-কারণেই এদেশীয় জনগণের অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য তাঁদের নিরলস সাধনা অব্যাহত ছিল। যেহেতু জনগণের ধর্মবিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, স্থানীয় সঙ্গীত, স্থাপত্য ও লোক-ঐতিহ্য ইত্যাদি বুঝতে না পারলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার সহজ হবে না, তাই তাঁরা বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশের লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাংলাদেশ-ভারতীয় জন-জীবনের বিন্যাস ও নৃতাত্ত্বিক দিক নিয়েও তাঁদের মাথা ঘামাতে হয়।

অবশ্য পাদরীরা যে খুব সহজে এদেশে কাজ করতে পেরেছেন তা বলা যায় না। কারণ প্রথম দিকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁদেরকে কাজ করবার সুযোগ দেয় নি। তদুপরি এদেশীয় জনসাধারণও তাঁদেরকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। যাই হোক উনিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে পাদরীদের ভারতে আগমন সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে ১৮০০ সালে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মিশনের পাদরী ছিলেন জন টমাস ও ও উইলিয়াম কেরী। টমাস ও কেরী ছাড়াও পরবর্তীকালে মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও গ্রাণ্ট এদেশে আগমন করেন। ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এঁদের দান কারো অজানা নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কেরীর অনুরাগ সুপরিচিত। তাঁর 'কথোপকথন' একটি তাৎপর্যময়

গ্রন্থ। অন্যদিকে তাঁর সতীর্থ ও সহকর্মী দু-দুটি বাংলা সাময়িকী 'দর্পণ' (১৮১৮) এবং 'দিক্দর্শন' (১৮১৮) সম্পাদনা করতেন। বাংলাদেশে পাশ্চাত্য ভাবধারা বিস্তারে হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও-র দান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে নবযুগ পত্তনের ব্যাপারে কেরী ও ডিরোজিও-র ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অন্যান্যদের মধ্যে আলেকজাণ্ডার ডাফ; ডোনাল্ড মিচেল, ডঃ জন উইলসন ও রবার্ট নোব্‌ল্-য়ের প্রচেষ্টায় ভারত উপমহাদেশে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

আর একজন উল্লেখযোগ্য ধর্মপ্রচারক ছিলেন স্টিফেন হিস্‌লপ্ (১৮১৭—১৮৬৩)। বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশ সম্পর্কে তাঁর বহুবিধ মতামত তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ও চীফ কমিশনার রিচার্ড টেম্প্‌ল্-য়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সব পাদরীরা একদিকে যেমন শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করেছেন তেমনি অন্যদিকে বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশের গ্রামাঞ্চলে মিশন স্থাপন করে জনগণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু সমাজসেবা ও ধর্মপ্রচার ছাড়াও সাহিত্যিক কাজকর্মে তাঁদের আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল অদম্য। এরই ফলস্বরূপ বাংলাদেশ-ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাতে বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ-ভারতীয় ঐতিহ্যের দিকেও তাদেব দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। অবশ্য এখানেও তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। তবু এই অনুসন্ধিৎসার ফলে হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের ইতিহাস পাঠে তাঁরা আগ্রহী হয়। এরই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, বাংলাদেশ-ভারতীয় জনগোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার ও সামাজিক প্রথাদি সম্পর্কে তাঁদের নৃতাত্ত্বিক গবেষণার কথা। এছাড়া এদেশের বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণাও তাঁরাই শুরু করেন। পাদরীদের নিরলস ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই অসংখ্য বাংলাদেশ-ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার উদাহরণ মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এভাবেই পাদরীদের সঙ্গে এদেশের জনসাধারণের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায় আর তাঁরা বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশের সমৃদ্ধ লোক-ঐতিহ্যের সন্ধান পান।

বাংলাদেশ-ভারতীয় উপমহাদেশ লোক-ঐতিহ্যে বিশেষভাবে ঐশ্বর্যময়। কিন্তু তার সংগ্রহের ইতিহাসও কম বিচিত্র নয়। ব্রিটিশ রাজকর্মচারী,

তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও খ্রীষ্টান পাদরীরা যে-তাগিদে বাংলাদেশ-ভারতীয় লোক-ঐতিহ্যের সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন, তাঁর অনেকটাই ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দ্বিতীয়ত ভাষার ব্যবধানের দরুন সংগ্রহের কাজ খুব মন্থর গতিতে এগিয়েছে। তবু প্রথম থেকে শেষ অবধি তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। প্রথম দিকে ইতস্তত ভ্রমণকারীরা ১৮৩৮-১৮৭৮ সাল পর্যন্ত কিছু কিছু স্থানিক কাহিনী ও পুরাণ কাহিনী সংগ্রহ করে তা প্রকাশ করেন। এবং সেগুলোও তাঁরা বিশেষ বিশেষ অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে, যে-মুহূর্তে ব্রিটিশ প্রশাসন দৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়ালো—ঠিক তক্ষুনি ব্রিটিশ কর্মচারী ও পাদরীদের মধ্য থেকেই অনেক শিক্ষানবিশী নৃতত্ত্ববিদ, লোকতত্ত্ববিদ ব্যক্তি, ভাষাতত্ত্ববিদ এবং জাতিবিজ্ঞানী কাজ করতে থাকেন। কর্মচারীরা তাঁদের কাজের অবসরে এবং পাদরীরা ধর্ম প্রচারের অবকাশে বাংলাদেশ-ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও লোক-ঐতিহ্য সম্পর্কিত বিষয়ে উৎসাহিত বোধ করেন। এই সমস্ত কর্মচারী ও পাদরীরা প্রধানত লোককাহিনী, লোক-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের নানা উদাহরণ সংগ্রহ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এদেশের লোক-মানসের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ। প্রশাসনিক কাজকর্মে পরিবর্তন সাধনকল্পে লোকমানসকে জানা একান্ত প্রয়োজন আর সে-জন্যই পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের শাসনযন্ত্রটিই লোকঐতিহ্য সংগ্রহকে উৎসাহ প্রদান করে। কিছু কিছু সরকারী কর্মচারী বাংলাদেশ-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জনসাধারণের সম্যক পরিচয় লাভের জন্য জাতিতত্ত্বের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এঁরা লোক-প্রথা, লোক-উৎসব, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী, বিভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠান, সামাজিক আচার-বিচার, বাস্তব জীবন-ব্যবস্থা, পুরাণ ও স্থানিক কাহিনী ইত্যাদির পঠন-পাঠনে প্রবৃত্ত হন। একথা সত্য যে লোককাহিনী সংগ্রহ করা তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। জাতিতত্ত্বের আলোচনার সহায়তা করতে পারে, এমন কিছু কিছু লোককাহিনী তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন। পাদটীকা, ব্যাখ্যা, তথ্যপঞ্জী বা সূচী সেসব সংগ্রহে পাওয়া যায় না।

ইংল্যাণ্ডে ১৮৭৮ সালে, **Folklore Society**-র প্রতিষ্ঠার পর, **Folklore Record** প্রকাশিত হলে লোক-ঐতিহ্যের সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি নতুন পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৮৭৮ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ-ভারতীয় লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যায়। ১৯২০ সাল

থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশ-ভারতীয় লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহের তৃতীয় পর্যায়ে বিখ্যাত সংগ্রাহকরা তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেন, ফলে বাংলাদেশ-ভারতীয় লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। চতুর্থ পর্যায় শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সাল বা স্বাধীনতার পরবর্তী কাল থেকে। এ-কালের সংগ্রহের মধ্যে জাতীয় চেতনা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে শৌখীন সংগ্রাহকদের হাতে কাহিনীর টুকরো-টাকরা, লোকবিশ্বাস ও লোকপ্রথা ইত্যাদি মৌখিক ঐতিহ্য থেকে সংগৃহীত হয়। অবশ্য ব্রিটিশ শাসকবর্গ ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা একথা উপলব্ধি করতে থাকেন যে, বাংলাদেশ-ভারতীয় জনগণের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা সম্ভব শুধু তাদের লোক-ঐতিহ্য, নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের আন্তরিক অধ্যয়নে। কিছুসংখ্যক উৎসাহী রাজকর্মচারী ও পাদরীদের প্রচেষ্টায় এই কাজও শুরু হয়ে যায়। রেভারেণ্ড স্টিফেন হিসলপ, স্যর রিচার্ড টেম্প্ল্, ক্যাপ্টেন লুয়িন, লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল উইলিয়াম রোজ কিং, এডওয়ার্ড টি. ডাল্টন প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিদের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয়। এঁদেরই হাতে বাংলাদেশ-ভারতীয় লোক-জীবনের বিচিত্র তথ্যাদি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

মিসেস ম্যারিয়ান পোস্টেন্স নামক জনৈক ভদ্রমহিলা "কচ্ছ" নামে একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি সরকারী কর্মচারী ছিলেন না, কিন্তু একজন সরকারী কর্মচারীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ছিলেন। কচ্ছের জন-সাধারণের জাতিতাত্ত্বিক বর্ণনা ছাড়াও তিনি স্থানিক কাহিনী ও অন্যান্য কাহিনী সংগ্রহ করেন। 'রাজকুমার সম্পুরের' কাহিনীটিতে তিনি সর্পপূজার এক চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। কুমারী সিরদায়ী ও একটি বৃহৎ সাপের কাহিনীতেও ঐ একই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কচ্ছের একজন ব্রাহ্মণের কাছে তিনি কাহিনীগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে আরও অনেক কাহিনী ছিল, তবু এ-সংগ্রহকে লোককাহিনীর সংগ্রহ নামে অভিহিত করা যায় না।

মিস্ মেরী ফ্রিয়ারের **Old Deccan Days** (১৮৬৮) প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশ-ভারতীয় লোককাহিনীর কোনো উল্লেখযোগ্য সংকলন প্রকাশিত হয় নি। এখানে সেখানে ভ্রমণকারীদের পুস্তকে বা বর্ণনায় সামান্য সংখ্যক লোককাহিনী প্রকাশিত হয়। প্রশাসনিক কর্মচারীদের

রিপোর্টেও কিছু কিছু লোককাহিনী প্রকাশিত হয়। টমাস বেকন-এর Oriental Annual (২ খণ্ডে প্রকাশিত, লণ্ডন, ১৮৪২), সি. রাইটের India and Its Inhabitants (সিনসিনাটি, ১৮৫৬), এবং মেজর জেনারেল স্যর উইলিয়াম শ্লীম্যানের Ramble and Recollections of an Indian Official (লণ্ডন, ১৮৪৪) ইত্যাদি গ্রন্থে প্রক্ষিপ্তভাবে লোককাহিনী প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে বেকন-এর Oriental Annual-ই উল্লেখযোগ্য। ভ্রমণবৃত্তান্ত হলেও এই গ্রন্থে চমৎকার রূপকাহিনী সংগৃহীত হয়েছে।

ফ্রিয়ারের পূর্বে আর একজন উল্লেখযোগ্য সংগ্রাহকের দানের কথা স্মরণ করতে হয়। ইনিই হলেন রেভারেণ্ড স্টিফেন হিসলপ। মধ্য-প্রদেশের আদিবাসীদের সম্পর্কে তাঁর লিখিত নথি-পত্রসমূহ স্যর রিচার্ড টেম্প্ল্ সম্পাদিত করে ১৮৬৬ সালে প্রকাশ করেন। হিসলপ নাগপুর অঞ্চলের উপজাতি বিশেষ করে 'গন্দ'-দের ভাষা সম্বন্ধে অবহিত হন। এই উপজাতিটির লোক-ঐতিহ্যের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ তিনিই প্রকাশ করেন। টেম্প্ল-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত এই সংগ্রহের প্রথমে মূল কাহিনী ও তার অনুবাদ পাশাপাশি প্রকাশিত হয়। কিন্তু গ্রন্থটির শুষ্ক পাণ্ডিত্য বাঞ্ছিত ফলাফল লাভে সমর্থ হয় নি।

এরই দু'বছর পরে ১৮৬৮ সালে মিস্ ফ্রিয়ারের Old Deccan Days প্রকাশিত হয়। এই সংগ্রহটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সংগ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংগ্রহটি কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এই গ্রন্থটি Folklore Society প্রতিষ্ঠার দশ বছর পূর্বে প্রকাশিত হলেও তা সোসাইটির আদর্শানুযায়ী কথকদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য দান করে।

ফ্রিয়ার তাঁর একমাত্র কথক সম্বন্ধে পুংখানুপুংখ বর্ণনা দান করেন। তাছাড়া তার সংগৃহীত কাহিনীসমহ বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশে বিস্তৃত টাইপ ও মটিফের সন্ধান দান করে। তাঁর একটিমাত্র কাহিনী 'সিংহ ও খরগোশ' ছাড়া অন্য কাহিনীগুলো মৌখিক ঐতিহ্য থেকে সংগৃহীত। এ-গ্রন্থের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন মেরীর পিতা বোম্বাই প্রদেশের গভর্নর স্যর বার্টলি ফ্রিয়ার। মিস্ ফ্রিয়ার তাঁর আয়া অ্যানা দ্য সুজার কাছে এই কাহিনীগুলো সংগৃহীত করেছিলেন।

ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও পাদরীদের দৃষ্টি পার্বত্য, আরণ্য এবং উপজাতীয় লোকদের উপর নিবদ্ধ হয়। এরই ফলে টমাস হার্বার্ট লুয়িনের **Wild Races of South-Eastern India**(লণ্ডন, ১৮৭০)র মত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এতে বাংলাদেশের চাকমা, তিপারা, লুসাই ও কুকি উপজাতীয়দের কথা আছে। লুয়িন পুরাণ কাহিনী ও সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক কিছু কিছু কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। এই সময়ে বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশে জাতিতত্ত্ববিষয়ক দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এর একটি হল **The Indian Antiquary** এবং অন্যটি হল ডেল্টন সাহেবের **Descriptive Ethnology of Bengal** (কলিকাতা, ১৮৭২)। **The Indian Antiquary**-র ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৯ম সংখ্যাসমূহে **Damant** এ-দেশের লোককাহিনী প্রকাশ করেন। উত্তর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত কতকগুলো কাহিনী তিনি দিনাজপুর জেলা থেকে সংগৃহীত করে উপরোক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত করেন। এডওয়ার্ড টি. ডেল্টন **Descriptive Ethnology of Bengal** গ্রন্থে অনেক লোককাহিনী প্রকাশ করেন। লুসাই-কুকি উপজাতির ভাষায় পঠন-পাঠন করতে গিয়ে হার্বার্ট লুয়িন তিন তিনটি কাহিনীর অনুবাদসহ পাঠ প্রদান করেন। তিনি তাঁর কথকদের সম্বন্ধে সংবাদ ও অন্যান্য তথ্যপঞ্জীও সরবরাহ করেন।

এস. এস. থরবার্ণ নামক জরীপ বিভাগীয় একজন কর্মচারী বান্নুতে (পাকিস্তান) থাকার সময় ৫০টি লোককাহিনী সংগ্রহ করেন এবং পরে তা **Bannu or Our Afgan Frontier** নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তবে তাঁর কাহিনী সংগ্রহ মোটেই সন্তোষজনক নয়। তিনি কথকদের সম্বন্ধে সংবাদাদি না দিলেও পাঠানদের মধ্যে কাহিনী বলার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা থেকে জানা যায় যে, পাঠানদের মধ্যে কথক মাত্রই ভালো নাটুকেপনাও জানতো। পাঠানদের প্রতিটি গাঁয়ে দু'তিনজন করে কথক থাকতেন। পাঠানরা তাদের অঢেল অবসরে কাহিনী শোনার জন্য জমায়েত হত। কথকের বলার ভঙ্গী দরদী না হলে তাদের বলা কেউই শুনতো না। কিন্তু দরদী কথকের কণ্ঠে কান্না-হাসি মূর্ত হলে শ্রোতারাও গভীর আবেগে তাতে সাড়া দিতো।

বাংলাদেশ-ভারতীয় লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাসে ১৮৭৯—১৯২০ সাল পর্যন্ত সময়কাল খুবই তাৎপর্যময়। কারণ ১৮৭৮ সালে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হল **Folklore Society** এবং **Folklore Record** নামক সাময়িকীও প্রকাশিত হতে লাগলো। বলাবাহুল্য, উনিশ শতকের শেষ পর্যায়টি লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। শুধু বাংলাদেশ-ভারতীয় উপমহাদেশে নয়, এ সময়ে সারা বিশ্বেই লোক-ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপাদান সংগৃহীত হতে থাকে। ইংল্যাণ্ডে এডওয়ার্ড বি. টাইলর, ম্যাক্স মুলার, এনড্রু ল্যাণ্ড, উইলিয়াম থম্‌স্ (ইনিই **Folklore** শব্দটি প্রথমে ব্যবহার করেন), ডব্লু. আর. এস. র‍্যালস্টন্ এবং জি. এল. গম প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিত ও গবেষকরা লোক-ঐতিহ্যের চর্চার আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের সঙ্গে পরবর্তীকালে যোগ দেন ই. এস. হার্টল্যাণ্ড, এডওয়ার্ড ক্লড্ ও জেম্‌স্ জর্জ ফ্রেজারের মত পণ্ডিত ব্যক্তিরা। আরও পরে রিচার্ড কার্ণাক টেম্প্‌ল্, লংওয়ার্থ ডেম্‌স্, উইলিয়াম ক্রুক ও জন শেক্সপীয়র সক্রিয়ভাবে উপরোক্ত পণ্ডিতদের সাথে কাজ করতে থাকেন---আর এঁরা সবাই ছিলেন বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশের প্রাক্তন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী।

Floklore Society প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে লোক-ঐতিহ্যের সংগ্রহ বা পঠন-পাঠন বৈজ্ঞানিক হতে থাকে। দ্বিতীয়ত এই পর্যায় থেকেই লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শৌখিন সংগ্রাহকদের স্থানে শিক্ষাপ্রাপ্ত পেশাদার সংগ্রাহক কাজ করতে থাকে।

কাজেই ১৮৭৯ সাল থেকে বাংলাদেশ-ভারতীয় লোককাহিনী সংগ্রহের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গী পালটে যায়। যদিও বহু ক্ষেত্রে নানা ত্রুটি থেকে যায়, তবু সংগ্রাহক মাত্রই ভুলত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।

যাই হোক, সংগ্রহের দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হল মেইভ স্টোক্‌স্-এর **Indian Fairy Tales** (লণ্ডন, ১৮৭৯)। সংগ্রহটি পাদটীকা, ব্যাখ্যা, শব্দ ও তথ্যপঞ্জী ও নির্বাচিত গ্রন্থ-তালিকা সরবরাহ করে। অবশ্য এগুলো গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন স্টোক্‌স্-এর পিতামাতা। কিন্তু তাতে করে গ্রন্থের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়ে বরং বেড়েই যায়। মিস্ স্টোক্‌স্ কাহিনীগুলো দু'জন আয়া ও একজন খিদমতগারের (ভৃত্য) নিকট থেকে সংগ্রহ করেন।

পাঞ্জাবের তৎকালীন শিক্ষাবিভাগের পরিচালক ডঃ জি. ডব্লু. লেইটনার তাঁর The Bashgali Kafirs and Their Language (সিমলা, ১৮৭৯) গ্রন্থে কয়েকটি কাহিনী সন্নিবেশিত করেন। জন ডাউসন্ তাঁর Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion (লণ্ডন, ১৮৭৯) নামক বইতে কিছু পুরাণ-কাহিনী ও স্থানিক-কাহিনী সংগ্রহ করেন। বাংলাদেশ-ভারতীয় লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাসে ১৮৮০ সালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ-সময়ে একই সঙ্গে তিনজন বিখ্যাত সংগ্রাহক এদেশে কাজ করেন। এঁদের মধ্যে আর. সি. টেম্প্‌ল্‌-এর তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ The Legends of the Punjab (বম্বে, ১৮৮৪) কাহিনী সংগ্রহের ক্ষেত্রে অপূর্ব সংকলন বলে গণ্য হয়েছে। প্রথম খণ্ডে ৭০টি স্থানিক-কাহিনী সংগৃহীত হয়। ডঃ মযহারুল ইসলামের মতে এ-সংগ্রহের অন্তর্গত "রাজ-কুমারী নেওয়াল দেই"-এর কাহিনীটি বাংলাদেশ-ভারতের সংগৃহীত কাহিনীগুলোর মধ্যে দীর্ঘতম। দ্বিতীয় খণ্ডে উনিশটি এবং তৃতীয় খণ্ডে কুড়িটি স্থানিক-কাহিনী স্থান পায়। অবশ্য এসব কাহিনী যদিও বর্ণনামূলক লোক-গীতি তবু তার কাহিনী-অংশে লোককাহিনীর সব উপাদানই বর্তমান। টীকা-টিপ্পনী ও তথ্যাদির সন্নিবেশ করে তিনি তাঁর সংগ্রহকে বৈজ্ঞানিক করবার প্রয়াস করেছেন।

ঠিক একই পর্যায়ের আর একটি সংগ্রহ হল ফ্লোরা এনি স্টীলের Wide Awake Stories (বম্বে, ১৮৮৪)। এ-সংগ্রহের সম্পাদনা ছিল একান্তই পাণ্ডিত্যপূর্ণ। টীকা-টিপ্পনীতে, ব্যাখ্যায়, পরিশিষ্ট ও বিশ্লেষণে এই সংগ্রহটি খুবই মূল্যবান বলে পরিগণিত হয়েছে। মিসেস স্টীল অনেক কাহিনী সরাসরি কথকের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। অন্যান্য কাহিনীগুলো সংগ্রহ করেছিলেন আর. সি. টেম্প্‌ল্‌। ইউরোপীয় পাদরী-দের মধ্যে চার্লস সুইনার্টন হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি উল্লেখযোগ্য ভাবে কাহিনী সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগ্রহটির নাম The Adventures of the Punjab Hero Raja Rasalu and other Folktales of the Punjab (কলিকাতা, ১৮৮৪)। রাজা রাসালুর তিন তিনটি ভাষ্য সুইনার্টন সংগ্রহ করলেও তাঁর সংগ্রহে তিনটি ভাষ্য স্থান পায় নি। তদুপরি তাঁর সংগৃহীত অন্যান্য কাহিনীগুলো সম্পর্কেও তিনি কোনো সুষ্ঠু আলোচনা করেন নি। স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন তাঁর Bihar Peasant Life গ্রন্থে গুটিকতক কাহিনী প্রকাশ করেন, কিন্তু কাহিনীর তুলনামূলক

আলোচনা তিনি করেন নি। ই. জে. রবিনসনের **Tales and Poems of South India**-তে দক্ষিণ ভারতের কিছু কিছু কাহিনী প্রকাশিত হয়। রবিনসনও দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারের কাজ করেন। যে-সমস্ত পাদরী লোককাহিনী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জেম্‌স্ হিন্টন নোলেসের নাম স্মরণীয়। তাঁর **Dictionary of Kashmiri Proverbs** (বম্বে, ১৮৮৫) এবং **Folktale of Kashmir** (লণ্ডন, ১৮৮৮) কাশ্মীরের লোককাহিনী সংগ্রহের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে তিনি কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। বলা-বাহুল্য এ-কাজের জন্য ধৈর্যের সঙ্গে কাশ্মীরী ভাষাও তিনি শিখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কাহিনীর সকল ভাষ্য ও তার তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি বৈজ্ঞানিক রস-দৃষ্টির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। মার্ক থর্ণহিলের **Indian Fairy Tales** (লণ্ডন, ১৮৮৯) সংগৃহীত হয় তখন, যখন তিনি তৎকালীন বাংলার প্রশাসনিক বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু সংগ্রহটিতে ভূমিকা, তথ্যপঞ্জী এমন কি কথকদের সম্পর্কে কোনো তথ্যও নেই।

বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশের সাঁওতালদের কাহিনী সংগ্রহ করেন পাদরী এ. ক্যাম্পবেল। এই সংগ্রহটির নাম Santal Folktales (মানভূম, ১৮৯১)। এই সংগ্রহের ২৩টি কাহিনী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হার্টল্যাণ্ড বলেছিলেন যে ইউরোপ ও আফ্রিকায় এসব কাহিনীর বহু পাঠান্তর পাওয়া যায়। সুইনার্টনের **Indian Nights' Entertaintment** (লণ্ডন, ১৮৯২) আর একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। কাহিনীর শ্রেণী নির্ণয় করে তিনি একটি আদর্শ স্থাপন করলেও তাঁর আলোচনায় কোনো তুলনা-মূলক দৃষ্টিভঙ্গী নেই। তাঁর **Romantic Tales of the Punjab** (লণ্ডন, ১৯০৩) এবং **Romantic Tales From the Punjab with Indian Nights' Entertaintment** (লণ্ডন, ১৯০৮) সংগ্রহ দুটিতে একই পন্থা অনুসৃত হয়। ডঃ মযহারুল ইসলামের মতে পণ্ডিত হিসেবে না হলেও সংগ্রাহক হিসেবে তিনি ধন্যবাদার্হ। উইলিয়াম ক্রুক নামে এক সুযোগ্য লোকতত্ত্ববিদ উনিশ শতকের শেষাশেষি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। তাঁর **The Popular Religion and Folklore of Northern India** (লণ্ডন, ১৮৯৩) এবং **North Western Provinces of India** (লণ্ডন, ১৮৯৭) নামক গ্রন্থে লোক-ঐতিহ্যের বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও লোক-

কাহিনী সংগৃহীত হয়। লোক ঐতিহ্যের চর্চার রীতিনীতির সঙ্গে পরিচয় থাকার জন্য তিনি তাঁর আলোচনাকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন। বাংলা-দেশ-ভারতীয় ভূতের গল্প সংগ্রহ করে তিনি একটি নজির স্থাপন করেন। তাঁর আর একটি সংকলন **Folktales of Northern India**-তে ২৩টি নীতি-কাহিনী ও রূপকাহিনী সংগৃহীত হয়। এছাড়া জীব-জানোয়ারের ৪৩টি কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেছি পরে কাহিনীগুলো ডব্লু. এইচ. ডি. রুজের সম্পাদনায় **The Talking Thrush** (লণ্ডন, ১৮৯৯) নামে প্রকাশিত হয়। শিশুদের পক্ষে এমন একটি উপযোগী সংকলন নাকি এর আগে প্রকাশিত হয় নি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞেরা। প্রকৃত-পক্ষে বাংলাদেশ-ভারতীয় লোকঐতিহ্য সম্পর্কে ক্রুকের ধারণা ছিল সব-চেয়ে স্বচ্ছ।

ক্রুকের পরে উল্লেখযোগ্য লোকতত্ত্ববিদ জর্জ গ্রীয়ারসনের নাম করতে হয়। তাঁর **Linguistic Survey of India** (কলিকাতা, ১৯০৩—১৯২৮) একাদশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। সমগ্র ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তিনি ১৩৯টি লোককাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত কাহিনীগুলোর সঙ্গে 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'জাতকে'র কাহিনীমালার সাদৃশ্য দেখা যায়। এছাড়াও তিনি স্টেইন-য়ের সংগৃহীত **Hatin's Tales**-য়ের সম্পাদনা করেন।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মিসেস এলিজাবেথ ড্রাকটের **Simla Village Tales** (লণ্ডন, ১৯০৬) এবং সিসিল হেনরি বম্পাসের **Folklore of the Santal Parganas** (লণ্ডন, ১৯০৯) প্রকাশিত হয়। ড্রাকট-য়ের সংগ্রহে মোট ৫৭টি কাহিনী স্থান পায়। কিন্তু কাহিনী সংগ্রহ ও বিচার-বিশ্লেষণের ব্যাপারে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁর সংগ্রহটি অনেকাংশে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তিনি নীচু-তলার পাহাড়ীদের কাছে কাহিনী শুনতে রাজী ছিলেন না। কারণ তাঁর ভয় ছিল পাছে কথক অশ্লীল ভাষায় অশ্লীল গল্প না বলে বসে।

এদিক থেকে বম্পাসের সংগ্রহটি মূল্যবান। সংস্কারমুক্ত পাণ্ডিত্য, সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী ও সরল অনুবাদের জন্য এ-সংগ্রহটি উল্লেখযোগ্য। সংগ্রহটিতে মোট ২০৭টি কাহিনী স্থান পেয়েছে। অবশ্য এগুলোর মধ্যে ১৮৫টি কাহিনী তিনি পল ওলাফ বডিং-য়ের কাছে

পেয়েছিলেন। বম্পাস কাহিনীগুলোর ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য উপস্থিত না করলেও প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি ভূমিকা স্বরূপ যে ব্যাখ্যা দেন তাকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলতেই হবে।

এই সময়ে ভারতের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে সংগ্রাহকদের দৃষ্টি পড়ে। জেম্‌স্‌ ড্রামণ্ড এণ্ডারসন আসামের কাছাড়ি উপজাতির লোক-কাহিনী সংগ্রহ করে তা **A Collection of Kachari Folktales and Rhymes** (শিলং, ১৮৯৫) নামে প্রকাশ করেন। অবশ্য কাছাড়ি উপজাতির ভাষার উদাহরণ হিসেবেই তিনি কাহিনীগুলো সংগ্রহ করে-ছিলেন। মেজর পি. আর. টি. গার্ডন **The Khasia** নামে আর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এতেও কিছু কিছু লোককাহিনী সংগৃহীত হয়। আসামের মিকির উপজাতি সম্পর্কে আর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন স্যর চার্লস লিয়াল। মিকির উপজাতির কাহিনী উদাহরণ হিসেবে এতেও স্থান লাভ করে। একই সময়ে থমাস ক্যালান হডসন আর একটি আসামী উপজাতি মিথিস্‌ সম্বন্ধে—**The Meithis** (লণ্ডন, ১৯০৮) নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এতে মাত্র ছ'টি লোককাহিনী প্রকাশিত হয়। এভাবেই মণিপুরী নাগা ও আসাম এবং পূর্ববঙ্গের গারোদের সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশিত হয়। হডসনের **The Naga Tribes of Manipur** (লণ্ডন, ১৯১১) এবং মেজর অ্যালান প্লেফেয়ারের **The Garos** (লণ্ডন, ১৯০৯) সালে প্রকাশিত হয়। উভয় গ্রন্থেই সামান্য সংখ্যক কাহিনী মুদ্রিত হয়ে-ছিল। ভারতের পূর্বাঞ্চলের জাতিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদির মধ্যে জন সেক্স-পীয়রের **The Lushai Kuki Clans** (লণ্ডন, ১৯১২) অন্যতম। লোক ঐতিহ্যের চর্চায় সেক্সপীয়রের অনুরাগ ছিল সুবিদিত।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলেও একই ভাবে কাজ শুরু হয়। হোরেস আর্থার রোজের **Popular Religion in the Punjab** (সিমলা, ১৯০২), **A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and North-West Frontier Province** (লাহোর, তিন খণ্ড) দুটি মূল্যবান গ্রন্থ। দুটি পুস্তকেই অনেকগুলো কাহিনী প্রকাশিত হয়। এ সময়েই ডি. ডোনাল্ড ও ফ্রাঙ্ক হেইল্‌স্টোন ম্যাল্রিয়ন পশতু লোককাহিনী সংগ্রহ করেন।

অন্যদিকে বাংলা দেশে উইলিয়াম ম্যাককুলোচ ১৮৮৭ সালের গোড়ার দিকে কাহিনী সংগ্রহ করেন, যদিও তাঁর সংগ্রহটি প্রকাশিত হয়

Bengal Household Tales নামে ১৯১২ সালে। এদেশীয় আর একজন পাদরী লালবিহারী দে Folktale of Bengal নামক একটি সংগ্রহে অনেক কাহিনী সংগ্রহ করেন।

ভারতীয় লোক ঐতিহ্য সংগ্রহের ইতিহাসে ১৮৭৯—১৯২০ সাল পর্যন্ত সময়কাল ছিল ভাষাতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহের কাল। কিন্তু ১৯২১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যে-সমস্ত সংগ্রাহক লোক-ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে কাজ করেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন। জন হেনরী হাটন এবং জেম্স্ ফিলিপ মিল্স্-য়ের মত নৃতত্ত্ববিদ, ও পল ওলাফ বডিং, নর্মান মোস্লি পেনজার ও ভেরিয়ার এলউইনের মতো লোকতত্ত্ববিদ্‌রা ভারতীয় লোক-ঐতিহ্য চর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগেরই পত্তন করেন। জাতিতাত্ত্বিক পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে লোক-ঐতিহ্যের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। অন্যদিকে কাহিনী সংগ্রহের ব্যাপারে পল ওলাফ বডিং এমন সব নীতি গ্রহণ করেন যা ইতিপূর্বে অনুসৃত হয় নি। টনি সাহেবের অনুবাদিত 'কথাসরিৎ সাগর' সম্পাদনা করে দশখণ্ডে প্রকাশ করেন পেনজার। কাহিনীর নতুন সংগ্রহ না হলেও লোককাহিনী আলোচনার ব্যাপারে ঘটনাটি তাৎপর্যময়।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে, বিশেষত আসাম এলাকায় বহু উপজাতির বসবাস। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এদের সম্বন্ধে উৎসাহ ও ঔৎসুক্য দেখা দেয়। জন হেনরী হাটন আই. সি. এস. ও জেম্স্ ফিলিপ মিল্স্ আই. সি. এস্. এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। হাটনের The Angami Nagas (লণ্ডন, ১৯২১) ও The Sema Nagas (লণ্ডন, ১৯২১) গ্রন্থ দুটি জাতিতত্ত্ব ও লোক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট দান হিসেবে গণ্য হতে পারে। উভয় গ্রন্থেই লোককাহিনী সংগৃহীত হয়। হাটন সংগৃহীত কাহিনীগুলোর বিভিন্ন সাদৃশ্যমূলক ভাষ্যেরও উল্লেখ করেন। মিল্স্-য়ের The Lhota Nagas (লণ্ডন, ১৯২২), The Ao Nagas (লণ্ডন, ১৯২৬) ও The Rengma Nagas (লণ্ডন, ১৯৩৭) তিনটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থগুলোর ভূমিকা লিখেছিলেন হাটন আর সূচী রচনা করেছিলেন শেক্সপীয়র। তিনটি গ্রন্থেই লোককাহিনী স্থান পেয়েছে। এলউইন মিল্স্-য়ের অনুবাদের প্রশংসা করতেন এবং অনুবাদের বেলায় তিনি মিল্সকে অনুসরণ করতেন।

এ-সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহক হলেন পল ওলাফ বডিং। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান এই পাদরী সাঁওতাল পরগনায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। সাঁওতালদের বিশ্বাস, আচার ও ভাষা সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা বিস্ময়কর ভাবে সমৃদ্ধ। তাঁর **A Chapter of Santal Folklore** (ক্রিশ্চিয়ানা, ১৯২৪) এবং তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ **Santal Folktales** (অসলো, ১৯২৫—১৯২৯) সাঁওতালী লোককাহিনীর বিখ্যাত সংগ্রহ। **Santal Folktales** গ্রন্থটি বিষয়বস্তুর প্রাচুর্যে এবং তার সার্থক ব্যবহারে উদাহরণস্বরূপ হয়ে থাকবে। সাঁওতালী ভাষায় লিখিত কাহিনীর পাশাপাশি ইংরেজি অনুবাদ প্রদান করে, সমালোচনা ও ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য পেশ করে বডিং তাঁর সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করেন। কিন্তু সংগৃহীত কাহিনীসমূহের বিভিন্ন ভাষ্য উল্লিখিত না হওয়ার দরুন বাংলাদেশ-ভারতীয় লোক-ঐতিহ্যে প্রাপ্ত কাহিনী-মালার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব হয়নি।

বডিং-য়ের পরেই বিখ্যাত সংগ্রাহক ভেরিয়ার এলউইনের নাম উল্লেখ করতে হয়। ভারতীয় নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর দানকে বলা হয়েছে অদ্বিতীয়। ১৯২৭ সালে এলউইন ভারত উপমহাদেশে আসেন পুনরায় উদারপন্থী খ্রীষ্ট সেবা সংঘের সদস্য হিসেবে। 'বাইগা' উপজাতি সম্বন্ধে তাঁর বর্ণনা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে বেশ কিছু সংখ্যক কাহিনীও স্থান পেয়েছে। একইভাবে তিনি 'গন্দ' ও 'আগারিয়া' উপজাতিদের তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর **The Agaria** গ্রন্থে সৃষ্টি সম্পর্কিত পুরাণ-কাহিনী সংগৃহীত হয়। এছাড়া ভেরিয়ার এলউইন ভারতীয় নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ও লোক-ঐতিহ্য সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

এলউইনের **Folktales of Mahakoshal** (লণ্ডন, ১৯৪৪) কে শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ বলে মনে করা হয়। এই সংগ্রহটির ভূমিকায় ভারত উপ-মহাদেশের পূর্বতন সংগ্রহগুলোর যে আলোচনা তিনি করেন তাও তুলনাহীন ঘটনা বলে গণ্য হবার যোগ্য। তিনি তাঁর সংগ্রহের কাহিনীসমূহকে ২৫টি ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র ভূমিকা রচনা করেন। তাঁর প্রদত্ত পাদটীকা ও ব্যাখ্যা যেমন প্রচুর তেমনি যথার্থও বটে। সংগ্রহটির পরিশিষ্টে তিনি যে-সব উপজাতির মধ্যে কাহিনীগুলো সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। অন্যান্য

সংগ্রাহকরা যে-সব কাহিনী ঐ অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলোও তিনি বিশ্বস্তভাবে উল্লেখ করেন। তদুপরি, একটি গ্রন্থপঞ্জী ও সূচীও তিনি পরিশিষ্টে যুক্ত করেন। তাঁর আলোচনা ও তথ্যসমূহ একান্তই পাণ্ডিত্যপূর্ণ। বাস্তবিকই পরবর্তীকালের সংগ্রাহকের কাছে সেগুলো আদর্শ হয়ে থাকবে। তাঁর অনুবাদও মূলানুগ এবং সরল। ভারতীয় লোক-কাহিনীর সংগ্রাহক হিসেবে ভেরিয়ার এলউইনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশ

ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে যেমন বাংলা দেশেও তেমনি প্রধানত ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও মিশনারীদের উদ্যোগেই লোক-কাহিনী সংগৃহীত হয়। কলিকাতা থেকে **The Indian Antiquary** এবং **Delton**-য়ের **Descriptive Ethnology of Bengal** ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, ১৮৭২ সাল থেকেই জাতিতাত্ত্বিক আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু জাতিতাত্ত্বিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহের কাজও চলতে থাকে। জি. এইচ. ডামাণ্ট **The Indian Antiquary**-র ১ম খণ্ডে **Bengali Folklore from Dinajpur** নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বিস্তৃত অনেক-গুলো লোককাহিনী এতে প্রকাশিত হয়। এডওয়ার্ড টুইট ডেল্টন বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটির নির্দেশে **Discriptive Ethnology of Bengal** প্রকাশ করেন। এতে বাংলা দেশের জনসমষ্টির একটি বিস্তৃত আলোচনা ছাড়াও কতকগুলো লোককাহিনী প্রকাশিত হয়। এতে 'কর্ম ও ধর্ম' নামে দুই ভাইয়ের কাহিনী, 'নদীর দেবী' এবং 'সাত ভাইয়ের কাহিনী' সংগৃহীত হয়। ডঃ মযহারুল ইসলাম সাহেবের মতে কাহিনীগুলো উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ডামাণ্টই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলা লোককাহিনীকে পাশ্চাত্যের সামনে তুলে ধরেন। ডামাণ্ট কিংবা ডেল্টন কেউই বাংলা কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা করেন নি, কিন্তু প্রথম সংগ্রাহক হিসেবে চিরকালই তাঁদের নাম উল্লিখিত হবে।

লুয়িন তাঁর **Progressive Colloquial Excercises in the Lushai Dialect of The Dzo or Kuki Language with Vocabularies**

and Popular Tales (কলিকাতা, ১৮৭৪) লিখেছিলেন প্রধানত কুকি ভাষার উদাহরণ দেবার জন্য। চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চলে এই উপজাতির বসবাস দেখা যায়। যাই হোক, কুকি ভাষার দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্যই তিনি তিনটি সম্পূর্ণ লোককাহিনী তাঁর গ্রন্থে স্থান দেন। তাঁর কাহিনী-গুলো কুকি ভাষায় সংগৃহীত হলেও তিনি সেগুলোর অনুবাদও পাশা-পাশি দিয়েছিলেন। এছাড়া কথকদের তথ্যাদি ও কাহিনীগুলোকে সুবোধ্য করবার জন্য তিনি ব্যাখ্যা দান করেন। তাঁর সংগৃহীত প্রথম কাহিনীটির একটি ইংরেজি ভাষ্যেরও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। পরবর্তী কালের সংগ্রাহক ও পণ্ডিতেরা তাঁদের নিজ নিজ পুস্তকে লুয়িনের সং-গৃহীত কাহিনীর যথাযোগ্য আলোচনাও উল্লেখ করেন।

পাদরীদের মধ্যে একজন বাঙালী রেভারেণ্ড লালবিহারী দে Folktales of Bengal (লণ্ডন, ১৮৮৫) নামে একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। সংগ্রহটিকে আজও একটি ক্লাসিক হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু লাল-বিহারী দে সংগ্রহের নীতি-নিয়ম মানেন নি, যার ফলে কথকদের সম্বন্ধে কোনো তথ্যই তিনি সংগ্রহ করা প্রয়োজন বোধ করেন নি। এছাড়া তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে অনেকগুলো কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এরই দরুন একটি কাহিনীর শেষাংশ অন্য একটি কাহিনীর গোড়ায় যুক্ত হয়ে এক জগাখিচুড়ির সৃষ্টি হয়েছে। লোককাহিনীর পণ্ডিতসুলভ সংগ্রহ ও সম্পাদনার নীতি বাস্তবিক পক্ষেই তাঁর জানা ছিল না।

ডেল্টনের পর এইচ. এইচ. রিসলে ভারতীয় জাতিতত্ত্বের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব অবদান রেখে যান। তাঁর The Tribes nd Castes of Bengal (কলিকাতা, ১৮৯২) দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইউরোপীয় নৃতত্ত্বে সেকালে পঠন-পাঠনের যে রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত হত, রিসলে তাকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বিস্তৃত তথ্যাদি ছাড়াও তিনি পুরাণ কাহিনী, স্থানিক কাহিনী ও অন্যবিধ লোককাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন।

জর্জ গ্রীয়ার্সনের নাম বাংলা দেশে সুপরিচিত। তাঁর Linguistic Survey of India (১৯০৩—১৯২৮) নামক গ্রন্থে উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় উদাহরণ সংগৃহীত হয়। রংপুর জেলা থেকে গোপীচাঁদের গান তিনিই সংগ্রহ করেন।

বাংলা দেশের লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাসে পাদরী উইলিয়াম ম্যাককুলোচের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর **Bengali Household Tales** বাংলাদেশ-ভারতীয় লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করতে পারে। সংগ্রহটি ১৯১২ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এতে বাংলার দক্ষিণ অঞ্চল থেকে মোট আটাশটি কাহিনী সংগৃহীত হয়। ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন সংগ্রহ থেকে তিনি তাঁর সংগৃহীত কাহিনীসমূহের সাদৃশ্যমূলক ভাষ্যেরও উদাহরণ দেন। দুটো কারণে এ-সংগ্রহটি তাৎপর্যপূর্ণ; এর একটি হলো কাহিনীগুলো মৌখিক ঐতিহ্য থেকে সংগৃহীত হয় আর দ্বিতীয়টি হলো কাহিনীর সম্ভাব্য ভাষ্যের দৃষ্টান্ত প্রদান। এছাড়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরিশিষ্ট এ-সংগ্রহের আর একটি আকর্ষণ। অবশ্য তিনি তাঁর কথকের নাম প্রকাশ করেন নি। তাছাড়া কাহিনীগুলোর সাহিত্যিক রূপান্তরকালে তাঁর হাতে সেগুলো বিকৃতও হয়। যাই হোক, তাঁর বক্তব্য থেকে এটুকু জানা যায় যে তাঁর কথক ছিলেন একজন সুশিক্ষিত রুচিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ।

ম্যাককুলোচের পরে কাশীন্দ্রনাথ ব্যানার্জির **Popular Tales of Bengal** (কলিকাতা, ১৯০৫), শোভনা দেবীর **The Oriental Tales** (লণ্ডন, ১৯১৫) এবং ফ্রান্সিস ব্রাডলি বার্টের **Bengal Fairy Tales** (লণ্ডন, ১৯২০) প্রকাশিত হয়। কিন্তু এসব সংগ্রহও প্রকৃতপক্ষে বাংলা লোককাহিনীর প্রতিনিধিস্থানীয় সংকলন নয়।

বাংলা লোককাহিনীর ক্ষেত্র এত সমৃদ্ধ যে তার তুলনা নেই। কিন্তু সংগ্রহ যা হয়েছে তা পরিমাণে সামান্য অন্তত ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোককাহিনী সংগ্রহের কথা স্মরণ করলে সে কথাই মনে হয়।

বাংলাদেশ

স্বাধীনতা লাভের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে লোককাহিনী সংগ্রহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করে বাংলা একাডেমী। কয়েক সহস্র লোককাহিনী বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহকরা বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সংগৃহীত কাহিনীসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশের কাজ খুব বেশিদূর এগোয় নি। যদিও ১৩৭০ সাল থেকে বাঙলা একাডেমী

'লোকসাহিত্য' নামে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উদাহরণের একটি সংকলন খণ্ডাকারে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করে আসছে, কিন্তু তাতেও খুব বেশি লোককাহিনী প্রকাশিত হয় নি। 'লোকসাহিত্যে'র ২য় ও ৩য় খণ্ডে তিনটি কাহিনী প্রকাশিত হয়। ২য় খণ্ডে,[১৬] 'ধার্মিক রাজার কিস্সা'র দুটি ভাষ্য প্রকাশিত হয়। এর একটি রংপুর ও অন্যটি ঢাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়। দুটি ভাষ্যই ঐ দুই জেলার আঞ্চলিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ৩য় খণ্ডে[১৭] কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষায় 'এক-তোলা কন্যার কিস্সা' ঐ জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। 'লোকসাহিত্যে'র[১৮] ষষ্ঠ খণ্ডটিতে শুধুমাত্র লোককাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। এতে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, রংপুর, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ও ঢাকা জেলার লোককাহিনী উল্লিখিত জেলাগুলোর আঞ্চলিক ভাষায় মুদ্রিত হয়। এইসব সংগৃহীত কাহিনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো কাহিনীতে বিধৃত বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক ভাষা। আর্নে-থম্পসন টাইপ ও মটিফসূচী অনুযায়ী 'লোকসাহিত্যে'র সংগৃহীত কাহিনীগুলোর মটিফ ও ও টাইপ নির্ণয় করা হয় নি। এছাড়া সাধারণভাবে লোককাহিনীর কোনো আলোচনাও নেই এতে। বোধ করি, একাডেমী কর্তৃপক্ষের তা উদ্দেশ্যও ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও একাডেমী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে যে-কটি কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে, তা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা যেতে পারে। দ্বিতীয় খণ্ডে একই কাহিনীর দুটি ভাষ্য প্রদান করায় তুলনামূলক আলোচনার সুবিধে হয়েছে। এ-ধরনের একই কাহিনীর সাদৃশ্যমূলক ভাষ্য 'লোকসাহিত্যের'র ষষ্ঠ খণ্ডে আছে। রংপুরের কিস্সা-গুলোর সপ্তম এবং ফরিদপুর জেলা থেকে সংগৃহীত পঞ্চম কাহিনীটি একই কাহিনীর দুটি সাদৃশ্যমূলক পাঠান্তর। কাহিনী সংগ্রহের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল স্থানীয় ও আঞ্চলিক ভাষার পঠন-পাঠন। এককালে ভারতীয় কাহিনীর ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশী সংগ্রাহকরা এ-উদ্দেশ্যে সমগ্র উপমহা-দেশ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। গ্রীয়ার্সনের **Linguistic Servey**

[১৬]লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৩৭০
[১৭]লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৩৭১
[১৮]লোকসাহিত্য, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ ১৩৭৩

of India-তে এ-ভাবেই লোককাহিনী সংগৃহীত হয়েছিল। স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষাসমূহের পঠন-পাঠন করতে এইসব কাহিনী বিশেষভাবে সাহায্য করতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত একই কাহিনী দুটি আঞ্চলিক ভাষায় কথকদের মুখে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যঞ্জনা লাভ করতে বাধ্য। এই ঘটনাও লোককাহিনীর আলোচনায় বিশেষভাবে তাৎপর্যময়।

এদিক থেকে বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত ও আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত 'কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী'[১৯] একটি ভালো সংকলন হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য কারণে আমাদের আশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় লিপিবদ্ধ না করে একেবারে সাধুভাষায় কাহিনী মুদ্রিত করার কোনো সার্থকতা নেই। বিশেষত কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় কাহিনী প্রকাশ করতে কোনো বাধা ছিল বলে মনে হয় না। কাহিনী যে-মুহূর্তে কথকের মুখ থেকে সংগ্রহে স্থান পায় তখনই তার অনেকখানি মাধুর্য ও রস বিনষ্ট হয়। তদুপরি যে-আঞ্চলিক ভাষায় কাহিনী রসমূর্তি লাভ করে সেই ভাষা থেকে কাহিনীকে বঞ্চিত করার অর্থ কাহিনীর সমগ্র চরিত্রকে নষ্ট করা। এ-সত্য সম্পাদকের কাছেও অজ্ঞাত ছিল বলে মনে হয় না। এ-সংগ্রহের বাষট্টি পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা পড়লেই সে-কথা বোঝা যায়। আর্নে-থম্পসন টাইপ ও মটিফ-সূচী অনুযায়ী কাহিনীর টাইপ ও মটিফ নির্ণয় করা আজ একটি সহজ কাজ। এবং শুধুমাত্র টাইপ ও মটিফ নির্ণয় করাও কাহিনী সংগ্রহের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কাহিনী যদি তার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য হারায় তবে তার পঠন-পাঠন করে একটি জাতি বেশি লাভবান হতে পারে না। একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'লোকসাহিত্যে'র ষষ্ঠ খণ্ডে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় লিপিবদ্ধ কাহিনীর ভাষা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার অধিবাসীদের কাছে দুর্বোধ্য বলেই মনে হবে। কিন্তু সম্পাদক দুর্বোধ্য শব্দসমূহের অর্থ প্রতিটি পৃষ্ঠার শেষে যুক্ত করে তাঁর যথাযোগ্য দায়িত্ব পালন করেছেন। চট্টগ্রামের এ-সব কাহিনীর যে কোনও সাবধানী পাঠক কাহিনী পড়তে পড়তে কথকের হাস্যোজ্জ্বল মুখটি

[১৯] কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, বাঙলা একাডেমী' ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৩৭১

দেখতে পাবেন। অনুভব করবেন কথকের চোখের সেই আলোর শিখাটি যা মুহূর্তের মধ্যে কাহিনীকে দিয়েছিল অপূর্ব সীমাহীন ব্যঞ্জনা।

অবশ্য আশরাফ সিদ্দিকী সাহেবের ভূমিকা একান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। Folklore-য়ের বাংলা প্রতিশব্দ নির্ণয়, Folklore-য়ের আলোচ্য বিষয়, লোককাহিনীর উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, এন্টি আর্নে ও থম্পসনের টাইপ ও মটিফ-সূচীর পরিচয়, আজাদভস্কির কথক ভিনকুরোভা ও কুপ্রা-নিকার প্রসঙ্গ, লোককাহিনীর আলোচনায় নৃতত্ত্বের ভূমিকা ও লোক-কাহিনীর শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ তাঁর ভূমিকায় স্থান পেয়েছে। তাঁর মতামতকে জোরদার করবার জন্য তিনি বহু পুস্তক থেকে প্রচুর ইংরেজি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সংগৃহীত কাহিনীসমূহের কথকদের নাম এবং তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদিও তিনি সন্নিবেশিত করেছেন। সংগ্রহটির এই অংশটুকু বিশেষ মূল্যবান। এছাড়া সংগৃহীত কাহিনীগুলোর টাইপ ও মটিফ নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি কাহিনীগুলোর বিশদ আলোচনা করেছেন। এ-অংশেও প্রচুর ইংরেজি উদ্ধৃতি আছে। কাহিনীতে বিধৃত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রণিধানযোগ্য।

কিন্তু সমগ্র ভূমিকাটিতে অযথা ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের এক আশ্চর্য প্রবণতা আছে। উদ্ধৃতি সম্পর্কেও এ-কথা প্রযোজ্য। মনে হয় স্বল্প সংখ্যক ইংরেজি জানা লোকের জন্যই এ-সংকলনটি প্রকাশ করা হয়েছে। ইংরেজি উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ দেবার তাগিদ সম্পাদক অনুভব করেন নি। এমন কি যে-কথা অনায়াসে বাংলায় ব্যক্ত করা সম্ভব তাও তিনি ইংরেজিতে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সমগ্র ভূমিকাটি এই একটি কারণে সাধারণ পাঠকদের জন্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অথচ লোককাহিনীর পঠন-পাঠনকে সার্থক করতে হলে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এ-সম্পর্কে আগ্রহ জাগানো একান্ত প্রয়োজন। সিদ্দিকী সাহেবের ভূমিকা এই উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী। অথচ তাঁর কাছে একটি সর্বজনবোধ্য ভূমিকার আশা করা অন্যায় ছিল না বলেই মনে হয়।

কাহিনীর টাইপ ও মটিফ নির্ণয় করলেও, কিশোরগঞ্জের লোক-কাহিনীতে অনির্ধারিত মটিফ আছে কিনা সে-প্রসঙ্গে সম্পাদক কিছুই বলেন কি। কাহিনীর সম্পাদনায় প্রতিটি কাহিনীর সঙ্গে তথ্যপঞ্জী, ব্যাখ্যা ও বিষয়সম্পর্কিত উদ্ধৃতি পৃষ্ঠাশেষে দেওয়াই উচিত ছিল। কারণ

সর্বদা ব্যবহারযোগ্য করে পাদটীকা রচনা সম্পাদনার অপরিহার্য অঙ্গ। লোককাহিনীর শ্রেষ্ঠ সংকলনগুলোতে সে-পদ্ধতিই অবলম্বিত হয়েছে। একাডেমীর 'লোকসাহিত্যে' এ-পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে। যদিও কথকদের বিস্তৃত তথ্যাদি 'লোকসাহিত্যে' নেই তবুও একাডেমীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'লোকসাহিত্য' লোককাহিনীর আলোচনায় অনেক বেশি সাহায্য করতে সক্ষম।

অবশ্য এই সংগ্রহটি বাংলাদেশের একমাত্র সংগ্রহ--- যাতে ত্রিশটি কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। বলাবাহুল্য, ভবিষ্যতে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে এ-সংগ্রহটি সাহায্য করতে পারবে। কথকদের সম্পর্কে যে-সব বিস্তৃত তথ্য এতে আছে, তাও সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত আর একটি সংগ্রহ হল 'ঢাকার লোককাহিনী।[২০] এতে মোট তিনটি লোককাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। কথকদের সম্পর্কে এতে কোনও বিস্তৃত তথ্য নেই। এটি যে-কোনও কাহিনী সংগ্রহের ত্রুটি বলে গণ্য হতে বাধ্য। এর সবগুলো কাহিনীও ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় গৃহীত হয়নি। এ-প্রসঙ্গে সম্পাদকের বক্তব্য:

"বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত প্রথম ও তৃতীয় কাহিনী দুটি সংগ্রহকালীন নির্দেশানুযায়ী মূলত সাধুভাষার কাঠামোতে গৃহীত। তবে আঞ্চলিক চরিত্র কাব্যাংশে অক্ষুণ্ণ আছে; বর্ণনা অংশসমূহেও আঞ্চলিক বাকভঙ্গি যথাসম্ভব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় কাহিনী সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষায় গৃহীত।"[২১]

সম্পাদকের বক্তব্য মেনে নিলেও, সবগুলো কাহিনী আঞ্চলিক ভাষায় গৃহীত না হওয়ার দরুন সংগ্রহটির মূল্য অনেকাংশে নীচে নেমে যেতে বাধ্য। কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী আলোচনায় যে-কথা বলা হয়েছে, এ-ক্ষেত্রেও তা সত্য। যাই হোক এ-সংগ্রহের 'চূড়ামনির কিস্সা'টি

[২০]ঢাকার লোককাহিনী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, সংস্করণ, ১৩৭২।

[২১]প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২

একটি চমৎকার লোককাহিনীর উদাহরণ। এ-প্রসঙ্গেও সম্পাদকের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল:

"এই সংগ্রহের প্রথম কাহিনীর নাম 'চূড়ামনির কিস্সা'। দীর্ঘ কলেবর এই কিস্সা সাত খণ্ডে বিভক্ত। একটি কেন্দ্রীয় কাহিনীর আধারে সাতটি কাহিনীর গ্রন্থনায় সমগ্র 'কিস্সা' সমাপ্ত। ঘটনাবিন্যাসের এই রীতি আরব্য রজনীর প্রভাবজাত। কিন্তু আরব্য রজনীর বা বেতাল পঞ্চবিংশতির মত কোন রাজা-বাদশা এখানে কাহিনীর শ্রোতা নন। জনৈক জ্ঞান পিপাসু তালবিলিমকে (শিষ্যকে) আশ্চর্য ঘটনার মাজেজা (তাৎপর্য) বর্ণনা প্রসঙ্গে তার গুরু এই সাতটি কাহিনী বলেছে। শিষ্যের নাম চূড়ামনি এবং তাঁর প্রশ্নোত্তরের কল্যাণে এই কাহিনী কথিত বলে এর সামগ্রিক নাম 'চূড়ামনির কিস্সা'।[২২]

এই কাহিনীটির সংগ্রহ প্রসঙ্গে সম্পাদক যে তথ্য দিয়েছেন, তাও উল্লেখ করা হল:

সাত খণ্ড চূড়ামনির কিস্সা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে থেকে সংগৃহীত। সংগ্রাহক জনাব দেওয়ান আবদুল খালেক একাডেমীতে প্রদত্ত বিবরণে জানিয়েছেন যে: আটিরহাটের জনাব জয়নাল আবেদিনের বাড়ির জনৈক বৃদ্ধ হিন্দু কর্মচারীর কাছে সন্ধান পেয়ে তিনি কেনারগাঁও-এর প্রেমানন্দ বৈরাগীর আখড়ায় যান। এই প্রেমানন্দ বৈরাগী সংগ্রাহককে প্রথম দুই খণ্ড কিস্সা শোনান এবং বলেন যে, প্রায় তিরিশ বছর আগে আলফু দেওয়ানের কাছে তিনি এই কিস্সা শেখেন, কিস্সা মোট সাত খণ্ড কিন্তু তিনি জানেন মোটে দু খণ্ড। এরপর অনুসন্ধান করে সংগ্রাহক ভাওয়ালের জনাব মফিজ মিয়ার কাছ থেকে তৃতীয় খণ্ড ও কলমারচর নিবাসী জনাব এরিন আলীর কাছ থেকে চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড উদ্ধার করেন। অতঃপর জনাব করিম ফকির প্রদত্ত সংবাদসূত্রে ষষ্ঠ ও সপ্তম কিস্সার সন্ধান মেলে কলমারচর নিবাসী মেঘু মিয়ার কাছে।[২৩]

চড়ামনির কিস্সাটিতে একটি কেন্দ্রীয় কাহিনীর আধারে সাতটি কাহিনীর গ্রন্থনা এবং কাহিনীটির সংগ্রহ উভয়েই বিশিষ্ট ঘটনা।

[২২]প্রাগুক্ত, পৃ: ৭
[২৩]প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮

মরমিয়াবাদ এবং তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বাংলা লোককাহিনীকে কি বিচিত্রভাবে ব্যবহার করেছে, তার উদাহরণ এই চূড়ামনির কিস্‌সা। সমস্যাটি মূলত লোককাহিনীর সামাজিক, ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক ভূমিকার সঙ্গে জড়িত। সাম্প্রতিককালের গবেষণায় একথা ধরা পড়েছে যে, লোককাহিনী একটি জনসমষ্টিতে একই সঙ্গে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।[২৪] শুধু চূড়ামনির কিস্‌সাতেই নয়, অন্যত্রও একই উদ্দেশ্যে লোককাহিনীর ব্যবহার চমকপ্রদ তথ্যের সন্ধান দেয়। সংগ্রহের ব্যাপারে যে প্রভূত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সংগ্রহের প্রসঙ্গে যে সামান্য তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে, তা যথেষ্ট বলে গণ্য হতে পারে না। কাহিনীটি যে জনপ্রিয় ছিল তা কাহিনীটির বিস্তৃতি দেখেই বোঝা যায়। এ-কাহিনীটির একাধিক পাঠান্তর না পাওয়া পর্যন্ত কাহিনীটির সার্বিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তবু বাংলাদেশের লোককাহিনী সংগ্রহের ক্ষেত্রে চূড়ামনির কিস্‌সা একটি অনন্য ব্যতিক্রম বলে গণ্য হতে বাধ্য।

কাহিনীটির মধ্যে মুসলিম প্রভাব পড়েছে বলে সম্পাদকের ধারণা। তিনি বলেন, 'মুসলিম কথা সাহিত্যের, বিশেষত আরব্য রজনী, পারস্য উপন্যাস প্রভৃতির আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য এই তিনটি গীতিকায় প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। কোথাও কোথাও বিষয়-সাদৃশ্যও লক্ষ্যগোচর হয়।[২৫] কিশোরগঞ্জের লোককাহিনীতে এ-ধরনের প্রভাবের কথা আশরাফ সিদ্দিকী সাহেবও আলোচনা করেছেন। লোককাহিনীর ইতিহাস, বিশেষ করে এক একটি কাহিনীর প্রামাণ্য জীবনী রচনা করবার সময় এই সব তথ্য বিপুলভাবে সাহায্য করে। একটি কাহিনী ভ্রমণ করতে করতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় বা সংস্কৃতিবিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে গিয়ে স্বতন্ত্র মহিমা লাভ করে। বলাবাহুল্য, বাঙালীর ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার ও সংস্কার ইত্যাদির প্রভাব লোককাহিনীতে থাকতে বাধ্য। লোককাহিনীর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয়কে তুলে ধরে। সেদিন থেকে উপরোক্ত তথ্য খুবই মূল্যবান। বাংলাদেশের লোককাহিনীতে আরব্য রজনী বা পারস্য উপন্যাসের প্রভাব কতটা তা চূড়ান্তভাবে নির্ণয় করা সম্ভব

[২৪] এ-প্রসঙ্গে এ-গ্রন্থের অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭

নয়। কিন্তু সৈয়দ আমীর হামজার 'হাতেমতাই' পুথির প্রভাব বাংলাদেশের লোককাহিনীতে বিপুলভাবে পড়েছে—এতে কোনও সন্দেহ নেই। চূড়ামনির কিস্সাতেও প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে এই হাতেমতাইয়ের, আরব্য রজনীর নয় বলেই মনে হয়।

'ঢাকার লোককাহিনী'তে চূড়ামনির কিস্সা ছাড়াও আরও দুটি লোককাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সাহেব একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় (২২ পৃষ্ঠা মাত্র) কাহিনী তিনটি গীতিকা কিনা তা নির্ণয় করেছেন। কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য, মিশ্র-সংস্কৃতির প্রসঙ্গ, বাউল ভাবনা, কাহিনীর মানবিক দিক—যেমন গল্পরস এবং তার অন্তরালে 'মানবচিত্রের বিচিত্র চাঞ্চল্য' প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যপূর্ণ। কিন্তু একটি ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত হওয়া সহজ নয়। তিনি এ-কাহিনীগুলোকে **Ballad** বা গীতিকা বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী। তার কারণ কাহিনীর মধ্যে 'গান' স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ এ-কাহিনীর অন্তর্গত 'গান' গাওয়া হয় এবং কথা সহযোগে তা মূর্ত হয়। সম্পাদকের মতে:

সংগৃহীত কিস্সা তিনটি গীতিকা জাতীয় রচনা। সংযোগমূলক কথা সহযোগে, প্রধানত গানের মাধ্যমে এসব কিস্সা কোন সুকণ্ঠ গায়েন, লোক-সাধারণ্যে শুনিয়ে থাকেন। গীতিকার স্বীকৃত-সংজ্ঞা আলোচনা করলেও এই শ্রেণীভুক্তিকরণের তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করা যাবে।[২৬]

গীতিকার স্বীকৃত সংজ্ঞা তিনি উদ্ধৃত করেছেন:

(১) গীতিকা একটি কাহিনী, (২) গীতিকা গাওয়া হয়, (৩) নামকরণ, স্টাইল ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে গীতিকা জনগণের সম্পত্তি, (৪) গীতিকা একটি মাত্র ঘটনার উপরই আলোকপাত করে

[২৬]প্রাগুক্ত, পৃঃ ১

ও (৫) গীতিকা নৈর্ব্যক্তিক, সংলাপ ও ঘটনার সহযোগে ঘটনাপ্রবাহ আপনা আপনি দ্রুত পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়।[২৭]

গীতিকার উপরোক্ত সংজ্ঞা মেনে নিলেও ঢাকার লোককাহিনীগুলোকে গীতিকা বলার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় না। কাহিনীগুলোতে গান আছে বটে কিন্তু গানের চেয়ে কথা-অংশই প্রধান। সম্পাদক 'প্রধানত গানের মাধ্যমে' যে-কিস্সা পরিবেশিত হয়—তাকেই গীতিকা বলেছেন। কিন্তু সম্পাদিত কাহিনীতে তার কোনও প্রমাণ নেই। এমন কি চূড়ামনির সপ্তম কাহিনীটির কাহিনী অংশে একটিও গান নেই। এছাড়া ব্রিটিশ ও মার্কিন গীতিকার প্রসিদ্ধ সংকলনসমূহে এমন কোন গীতিকা নেই যেখানে 'প্রধানত গানের মাধ্যমে' কিস্সা পরিবেশিত হয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বা ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী প্রদত্ত সংজ্ঞাও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের মতামতের পক্ষে সায় দেয় না। একথা ঠিক যে গীতিকায় কাহিনী থাকবে, কিন্তু তার সবটুকুই গেয়। ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাই তার প্রমাণ। বাংলাদেশে কাহিনী বলার সময় কিছু ছড়া বা গীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্ত হয়। এ-রীতিটি ভারতীয় কাহিনী সংগ্রহেও দেখা যায়। তাছাড়া কতকগুলো কাহিনীতে গীতির সংখ্যা বেশিও থাকে। এজন্যই 'ঢাকার লোককাহিনী'র কাহিনীগুলোকে গীতিকা বলা সঙ্গত হবে না বলেই মনে হয়। তাছাড়া এই কাহিনীগুলোতে

[২৭]সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইংরেজিতে উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন, তাও নীচে উদ্ধৃত হল:

(1) A ballad is a narrative, (2) A ballad is sung, (3) A ballad belongs to the folk in content, style and designation, (4) A ballad focuses on a single incident, (5) A ballad is impersonal, the action moving of itself by dialogue and incident quickly to the end.

Mac Edward Leach, 'Ballad', Funk and Wagnalls, Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend (hereafter cited as SDFML) edited by Maria Leach. Funk and Wagnalls Company. Newyork, (Vol. II. 1950) p. 106, (সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত)

গুরু ও তালবিলিমের প্রশ্নোত্তর গানে রচিত হয়েছে। সেজন্যই গানের সংখ্যা একটু বেশি বলে মনে হয়। যাই হোক, এ-কাহিনীগুলোকে গীতি প্রধান লোককাহিনী বলে আখ্যায়িত করা যায়। অবশ্য চূড়ান্ত মতামত দেওয়ার পূর্বে এ-প্রসঙ্গে আরও আলোচনা হওয়া উচিত।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে প্রচুর ইংরেজি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। পূর্বেই বলেছি, ইংরেজি উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ না দিলে তা সর্বসাধারণের পক্ষে বোধগম্য হয় না। অবশ্য কথায় কথায় বাংলা শব্দের স্থানে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা থেকে তিনি মুক্ত। এই একটি কারণে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী সাহেবের ভূমিকা তাঁর মূল্যবান আলোচনা সত্ত্বেও নিরাশ করে। এতে কাহিনীর টাইপ ও মটিফ নির্ণয়ের কোন প্রচেষ্টা নেই। এ-কালের যে-কোনও সংগ্রহে আর্ণে-থম্পসন টাইপও মটিফ সূচীর ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। এটিও এ-সংকলনের ত্রুটি বলে গণ্য হবে। অবশ্য এসব ত্রুটি সত্ত্বেও 'ঢাকার লোককাহিনী' বাংলাদেশের কাহিনী সংগ্রহের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করবে।

বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত ও রওশন ইজদানী লিখিত 'মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য'[২৮] গ্রন্থে গুটিকত লোককাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। পাড়া গাঁয়ের শিল্কী কিস্সা', 'দরবারী শিলুক', 'পাড়াগাঁয়ের লম্বা কিস্সা', 'বড়-দের ছুটকী গল্প' ও 'ছোটদের কিস্সা' এই কয়েকটি পর্যায়ে তিনি লোক-কাহিনীর উদাহরণ ও তার আলোচনা করেছেন। পল্লীকবি রওশন ইজদানী প্রকৃতই লোকসাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর আলো-চনায় একটি দরদী মনেরও পরিচয় আছে। পাড়াগাঁয়ের 'শিল্কি কিস্সা' বলতে যে-সব কিস্সাতে শ্লোক থাকে তাকেই বোঝানো হয়। অন্তত সেকথাই রওশন ইজদানী বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি 'শিল্কী কিস্সা'র একটি উদাহরণ দিয়েছেন। 'দরবারী শিলুকে'র সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি এভাবে:

গ্রাম্য 'শিল্কী' কিস্সারই দ্বিতীয় পর্যায় "দরবারী শিলুক"। গায়ের বিয়ে-শাদীর মজলিসে বা এমনিতর কোন উৎসবানুষ্ঠানে এসব

[২৮]রওশন ইজদানী, মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৩৬৪।

শিলুক কথিত হয়। এমন কি এসব নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে---হারজিত হয়। হয়ত কোন শাদীর মহফিলে এক পক্ষ প্রশ্ন করে---অপর পক্ষ জওয়াব দেয়। যেমন 'শিলুক কথক' প্রথম মজলিসে পা দিয়েই সালাম জানালো :

"আচ্ছেলাম আলেকুম ভাই ডোনে-ডানে।"

সালাম শুনেই প্রতিপক্ষ বুঝে নেয় এ ব্যক্তি 'শিলুক কথক'। তারা তখন প্রত্যুত্তরে প্রশ্ন করে :

"সালামের নাই কালাম
বাওনের নাই ঠাঁই
এই ছেলাম জানাইলেন আপ্নে
কার কার পাই?"

শিলুক-বক্তা মজলিসে আসন গ্রহণের পূর্বেই তার জওয়াব দেয়,

"ছেলামের আছে কালাম
বাওনের আছে ঠাঁই,
এই ছেলাম জানাইছি আমি
দশজনের পাই"।।[২৯]

কবি রওশন ইজদানীর মতে এক সালাম সম্পর্কেই বহু শিলুক প্রচলিত আছে। আসরে আগত ব্যক্তিদের মধ্যে তখন হাসি-রহস্যের মাধ্যমে ছুটকী শিলুক আরম্ভ হয়। 'দরবারী শিলুক' সম্বন্ধে এই তথ্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত কথকেরা কিভাবে কাহিনীটি শুরু করেন, তার বর্ণনা এভাবে অন্যত্র পাওয়া যায় না। 'দরবারী শিলুকে'র উদাহরণও তিনি দিয়েছেন। বহুদিন প্রবাসে দিন কাটিয়ে স্বামী ঘরে ফিরে দেখতে পেলো যে তার স্ত্রী একটি ছেলেকে গোসল করাচ্ছে। অথচ তার নিজের কোন ছেলেপুলে নেই। সে তখন ছড়ার মাধ্যমে ছেলেটি কে তার খোঁজ নিচ্ছে :

"শাখাহাতী বলি তোরে
পুলা ধোস তুই কার ঘরের?"

চতুরা স্ত্রীও ছড়াতেই জওয়াব দেয় :

---

[২৯]প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২

"পুলার বাপ যার শ্বশুর
তার বাপ আমার শ্বশুর ।।"[৩০]

এর মানে হলো ছেলেটি স্ত্রীর ভাই এবং স্বামীর শ্যালক। এমনি আরো কয়েকটি উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। "পাড়া গাঁয়ের লম্বা কেচ্ছা' বলতে রওশন ইজদানী আধা-ঐতিহাসিক কিংবদন্তী জাতীয় কাহিনীকেই বোঝাতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য:

"মোমেনশাহীর পল্লী অঞ্চলে এক জাতীয় কাহিনী প্রচলিত আছে, সেগুলিকে সাধারণত লম্বা কেচ্ছা বলে অভিহিত করে পল্লীবাসীরা। সেগুলিকে অশিক্ষিত গ্রাম্য গীতালুরা গেয়ে থাকে। মোমেনশাহীতে প্রচলিত পালা-গীতিগুলিতে ছন্দ আছে, পদ আছে, কবিতার মত একটা নিয়মানুগ পদ্ধতিতে তার আগাগোড়া রচিত; কিন্তু 'লম্বা গীতি' ঠিক তার বিপরীত...এতে রাগিণীর চেয়ে কথা বেশি, মিলের চেয়ে অমিল বেশি।"[৩১]

এ-ধরনের কেচ্ছার উদাহরণ হিসেবে তিনি 'আদম খাঁ'-বিরাম খাঁ', 'ডেংগু মিয়া', 'চিমুরাণী' ও 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। কবির মতে, 'ডেংগু মিয়া'র কাহিনীটি একটি ঐতিহাসিক কাহিনী। মনে হয় এগুলো সবই স্থানিক কাহিনীর নিদর্শন। যাই হোক, কবি মোমেনশাহীতে যে এ-ধরনের অসংখ্য কাহিনী প্রচলিত আছে তার উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি 'আদম খাঁ-বিরাম খাঁ'র কাহিনীটির একটি আলোচনাও উপস্থিত করেছেন।

'বড়দের ছুটকী গল্প' প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে গাঁয়ের দশ পাঁচজন একত্রিত হলে এ-রকম বৈঠকী কাহিনী পরিবেশিত হয়। তবে তাঁর মতে এ-সব কাহিনী পেশ করবার সময় কোনও প্রতিযোগিতা হয় না,

[৩০]প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৩
[৩১]প্রাগুক্ত, পৃ: ১২১

নিছক অবসর বিনোদনের জন্য এগুলো বলা হয়ে থাকে। এ-সব কাহিনীরও উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। 'ছোটদের কিস্সা' বলতে তিনি ছড়াকারে পরিবেশিত কাহিনীকেই বোঝাতে চেয়েছেন। যাই হোক, বাংলাদেশে তিনিই বোধহয় প্রথম ব্যক্তি যিনি একইসঙ্গে লোককাহিনী ও তার আলোচনা প্রকাশ করেন।

লোককাহিনীর আধুনিক পঠন-পাঠনের সঙ্গে পল্লী-কবি রওশন ইজ-দানীর পরিচয় ছিল না বটে, তবু তার গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন ধরনের লোককাহিনীর যে সংগ্রহ ও আলোচনা তিনি করেছেন তা একান্তই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। আর সে-কারণেই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে যাঁরা শহরে বসে শুধুমাত্র পুঁথিপত্রের সাহায্যে লোককাহিনীর আলোচনা করতে ব্যস্ত—তাঁদের সঙ্গে মরহুম কবির পার্থক্য সেখানেই। লোককাহিনীর পরিবেশন প্রসঙ্গে কবির বক্তব্য সংগ্রাহকদের সাহায্য করবে।

বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত লোকসাহিত্যের ৫ম খণ্ডে[৩২] ১৮-৮-৪৭ থেকে ১৪-৮-৬৩ পর্যন্ত সময়কালে লোকসাহিত্য সম্পর্কে বাংলা দেশের যে-সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তার একটি তালিকায় মোট ৩৮২টি প্রবন্ধের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই ৩৮২টি প্রবন্ধের মধ্যে লোককাহিনী সংক্রান্ত আলোচনা মাত্র ১২টি। বাঙলা একাডেমীর সংকলনাধ্যাক্ষের মন্তব্যসহ প্রবন্ধগুলির তালিকা উদ্ধৃত হল:

১। 'আদম খাঁ-বিরাম খাঁ' (পল্লীকাহিনী): রওশন ইজদানী—আজাদ, ১৩ই আষাঢ়, ১৩৬৬—(ময়মনসিংহে প্রচলিত এই লম্বা কেচ্ছার বিষয়বস্তুর পরিচয় দান)

২। কয়েকটি পল্লী গ্রাম্য গল্প: সংগ্রাহক, অধ্যাপক আবু তালিব দিলরুবা—কার্তিক, ১৩৫৭। [পাঁচটি গ্রাম্য গল্পের সংগ্রহ]

৩। কিংবদন্তী ও কাহিনী: আশরাফ সিদ্দিকী, ইত্তেফাক, ১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৫—(আমাদের দেশের কিংবদন্তী ও কাহিনী নিয়ে রচিত গান সম্পর্কে আলোচনা)

[৩২] লোকসাহিত্য, ৫ম খণ্ড, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৩৭২

৪। পূর্ববাংলার লোককাহিনী: আতোয়ার রহমান, সওগাত, কার্তিক, ১৩৬৩। (পূর্ব বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন লোককাহিনী সম্পর্কে আলোচনা)

৫। বাঙালীর হাসির গল্প: আশরাফ সিদ্দিকী, ফাল্গুন, ১৩৬৭ [ইউরোপ ও আমেরিকার লোকবিজ্ঞানের আলোকে বাঙালীর হাসির গল্প তথা বাংলা লোকসাহিত্যের আলোচনা এবং এর বৈজ্ঞানিক উপাদানের বিশ্লেষণ]

৬। বাঙালীর হাসির গান: আশরাফ সিদ্দিকী, মাহেনও, ফাল্গুন, ১৩৬৭। (পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্যের ভাব ও রূপে যে ঐক্য রয়েছে সে সম্পর্কে ইউরোপ ও আমেরিকার লোকবিজ্ঞানীদের গবেষণার পরিচয় দান এবং বাঙালীর হাসির গল্পের সঙ্গে অন্য দেশের হাসির গল্পের যোগসূত্রের কারণ অনুসন্ধান)

৭। মোমেনশাহীর লম্বা কেচ্ছা : রওশন ইজদানী, আজাদ, ১০ই মাঘ, ১৩৬০। [উদ্ধৃতিসহ ময়মনসিংহে প্রচলিত কয়েকটি লম্বা কেচ্ছার পরিচয় দান]

৮। রাজশাহীর লোক-কথার ভূমিকা : আমিনুল হক, আজাদ, ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৭০। [রাজশাহীর লোক-কথার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আলোচনা]

৯। রূপকথার অপুত্রক রাজা: আশরাফ সিদ্দিকী, মাহেনও, মাঘ, ১৩৬৮। [পৃথিবীর প্রায় সব দেশের রূপকথার অপুত্রক রাজার অলৌকিক সন্তান জন্মের কাহিনীর মূলগত ঐক্যের কারণ অনুসন্ধান ও আমেরিকার লোকবিজ্ঞানের আলোচনার অনুসরণে এই কাহিনীর মটিফ (Motif) এর পরিচয় দান।]

১০। রূপকথার ইতিকথা : আশরাফ সিদ্দিকী, ইত্তেফাক, ১০ই কার্তিক, ১৩৬৭। [রূপকথার সৃষ্টি এবং ইউরোপ ও আমেরিকার লোক-বিজ্ঞান পদ্ধতিতে রূপকথার আলোচনার পরিচয় দান]

১১। রূপকথার টাবু বা বিধিনিষেধ: আশরাফ সিদ্দিকী, মোহাম্মদী, পৌষ, ১৩৭৮। [বাংলার রূপকথায় বহুল ব্যবহৃত কতকগুলি টাবু বা বিধিনিষেধের নমুনাসহ টাবুর অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা]

১২। রূপকথার বাংলাদেশ: আতোয়ার রহমান, সংবাদ, ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৭। [বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর রূপকথার লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা এবং বিদেশী রূপকথার সঙ্গে বাংলা রূপকথার তুলনা]"[৩৩]

এই ১২টির মধ্যে ৬টিই লিখেছেন ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী। দুটি করে লিখেছেন কবি রওশন ইজদানী ও আতোয়ার রহমান। মুহম্মদ আবু তালিব ও আমিনুল হক লিখেছেন একটি করে। মুহম্মদ আবু তালিবের পাঁচটি গ্রাম্য গল্পের সঙ্গে লোককাহিনীর আলোচনা আছে কিনা তা বোঝা যায় না। সাম্প্রতিক কালে ডঃ মযহারুল ইসলাম মোট ছয়টি প্রবন্ধে লোককাহিনীর বিভিন্ন শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রেও ডঃ মযহারুল ইসলাম সাহেবের আলোচনা পথিকৃৎ হয়ে থাকবে। নিম্নে তার প্রবন্ধগুলোর তালিকা প্রদত্ত হল:—

১। বাংলাদেশের লৌকিক পুরা কাহিনী ও লোকগীতিকা, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭১।

২। বাংলাদেশ-ভারতীয় লোকলোরের একটি দিক: বোকা জামাতা, সাহিত্যিকী (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণামলক পত্রিকা), বসন্ত, ১৩৭১।

৩। লোককাহিনী সম্পাদনার রীতি ও পদ্ধতি, সাহিত্যিকী, শরৎ ও বসন্ত, ১৩৭৩।

৪। খাদ্যলোভী ফাঁকিবাজ ও তার শাস্তি, সাহিত্য পত্রিকা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণামূলক পত্রিকা) শীত, ১৩৭২

৫। একটি লোককাহিনীর পাঠ পর্যালোচনা, সাহিত্য পত্রিকা, শীত, ১৩৭৩

৬। ইউরোপীয় লোককাহিনীর আফ্রিকান ও আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান পাঠান্তর, সাহিত্যিকী, ১৩৭৪

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের লোককাহিনীর সংগ্রহ ও আলোচনা এ-পর্যন্ত যা হয়েছে, তা পরিমাণে খুবই

[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২

কম। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রচুর উৎসাহ দেখা গেলেও লোককাহিনী সম্পর্কে কোনো উল্লেখযোগ্য আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নি। বাঙলা একাডেমীর একক প্রচেষ্টায় ৬ থেকে ৮ হাজার লোককাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা একেবারে অনুপস্থিত বললেও চলে। এই কথা লোককাহিনীর আলোচনার ক্ষেত্রেও সত্য। বাঙলা একাডেমীর সংকলনাধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক প্রদত্ত তালিকা দেখলেই তো বোঝা যায়। এককথায় বাংলাদেশের লোক-কাহিনীর সংগ্রহ ও তার আলোচনা লোকসাহিত্যের অন্যান্য দিকের তুলনায় অবহেলিত। এর মধ্যে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী ও ডঃ মযহারুল ইসলাম সাহেবের প্রবন্ধসমূহ উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। অবশ্য এর মূল কারণ এঁরা উভয়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে লোকঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এঁদের দুজনের আলোচনাই বাংলাদেশের লোককাহিনীর বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠনের সূত্র-পাত করেছে।

ডঃ মযহারুল ইসলাম সাহেবের প্রবন্ধগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তাঁর প্রবন্ধেই শুধু লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। একটি মাত্র লোককাহিনীকে কেন্দ্র করে লোক-কাহিনীর আলোচনা যে কি পাণ্ডিত্যপূর্ণ হতে পারে, পশ্চিমা দেশগুলোতে তার প্রমাণের অভাব নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র দুটি সংখ্যায় (শীত সংখ্যা, ১৩৭২, এবং শীত সংখ্যা, ১৩৭৩) শুধু একটিমাত্র লোককাহিনীকে অবলম্বন করে তিনি যে আলোচনা করেছেন, লোককাহিনীর আলোচনায় তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হচ্ছে, রাজশাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্যিকী'-তে (শরৎ ও বসন্ত সংখ্যা' ১৩৭৩) মুদ্রিত 'লোককাহিনী সম্পাদনার রীতি ও পদ্ধতি'[৩৪] নামক প্রবন্ধটি।

[৩৪]এ-গ্রন্থের ৫নং পৃষ্ঠায় 'কথা, গল্প, না কাহিনী?' এই পর্যায়ে ডঃ মযহারুল ইসলাম সাহেবের মতামত উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে

এই প্রবন্ধটিই একমাত্র প্রবন্ধ যেখানে বাংলা লোককাহিনীর সম্পাদনা করবার রীতি ও পদ্ধতিটি ডঃ মযহারুল ইসলাম সাহেব তুলে ধরেছেন। পাবনা জেলা থেকে তিনি পাঁচটি লোককাহিনী সংগ্রহ করে তার বৈজ্ঞানিক সম্পাদনা করেছেন। সংগৃহীত কাহিনীগুলোর বড় ত্রুটি তা আঞ্চলিক ভাষায় গৃহীত হয় নি। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে তাঁর মতামত স্মরণ করা যেতে পারে:

"অবিকল কথকদের ভাষায় গল্পগুলো এখানে তুলে ধরতে পারলে আনন্দের ব্যাপার হত। কিন্তু প্রবন্ধের কলেবরের দিকে লক্ষ্য রেখে গল্পগুলোকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখতে হয়েছে।"[৩৫]

কিন্তু কাহিনীগুলোকে আঞ্চলিক ভাষায় লিপিবদ্ধ না করার কারণ যাই থাক না কেন, এতে কোনমতেই মৌলিক প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয় সম্ভব নয়। সেই মৌলিক প্রশ্নটি হল লোককাহিনী কথকের অবিকল ভাষায় গৃহীত বা প্রকাশিত না হলে—সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হতে বাধ্য। অবশ্য এই ত্রুটি ছাড়া প্রবন্ধটি লোককাহিনী আলোচনার ক্ষেত্রে মৌলিক বলে দাবি করতে পারে। প্রতিটি কাহিনীর কথকদের সম্বন্ধে তথ্যাদি এতে যথাযথ লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর্নে-থম্পসন টাইপ ও মটিফসূচী অনুযায়ী প্রতিটি কাহিনীর টাইপ ও মটিফ নির্ণয় ছাড়াও—তিনি কাহিনীর অন্তর্গত যে-সব মটিফ আর্নে-থম্পসন মটিফ সূচীতে নেই—তার উল্লেখ করেছেন। এদিক থেকে এই প্রবন্ধটি লোককাহিনী সম্পাদনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত ঠিক কি ভাবে লোককাহিনীর আলোচনা হওয়া উচিত—তারও দৃষ্টান্ত হিসেবে এই প্রবন্ধটি দিশারী হয়ে থাকবে।

তিনি **Folktale** শব্দটির পরিবর্তে 'লোকগল্প বা লোককাহিনী' ব্যবহারের পক্ষপাতী। কিন্তু সাম্প্রতিককালে তিনি শুধু 'লোককাহিনী'ই ব্যবহার করছেন।

[৩৫]সাহিত্যিকী, পৃঃ ২

বাংলাদেশের লোককাহিনী সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাঙলা একাডেমী একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সংগৃহীত কাহিনীসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার দিক থেকে খুব বেশি অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। সম্পাদনার জন্য একটি নীতি-নিয়ম স্থির করারও সময় উপস্থিত হয়েছে। একাডেমী কর্তৃপক্ষ যদি লোককাহিনী সম্পাদনার জন্য রীতি-পদ্ধতি স্থির করেন, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। কারণ শুধু 'সংগ্রহের জন্য সংগ্রহ' নীতিটি অনুসৃত হওয়া উচিত নয়। লোক-কাহিনীর পঠনে যে আনন্দ আছে---শুধুমাত্র সে-কারণে লোককাহিনীর সংগ্রহ প্রকাশ বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। একাডেমী প্রকাশিত লোক-সাহিত্যের ভূমিকায় বারংবার এ-আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উদাহরণ সংগ্রহ বাংলাদেশের লোকমানসকে জাতির সামনে তুলে ধরবে। কিন্তু লোককাহিনীর সঠিক সম্পাদনা সম্ভব না হলে সেই মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। লোককাহিনীর আলোচনা ইউরোপ ও আমেরিকায় এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেচে যে, তা প্রায় গণিতের মত নিখুঁত হতে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে লোককাহিনীর আলোচনা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে করা হচ্ছে। আমাদের লোক-কাহিনীরও বিপুল ঐতিহ্যের সঠিক মূল্যায়ন হওয়া উচিত। বাংলাদেশে এখনও ইউরোপ ও আমেরিকার মত Folklore Society গঠিত হয় নি। এ সম্পর্কেও আজ ভেবে দেখবার সময় উপস্থিত হয়েছে। বাঙলা একাডেমী আজ জাতীয় আশা-আকাঙক্ষার প্রতীক। এবং সঙ্গত কারণেই এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহ ও তার বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে---এই আশা করা অন্যায় হবে না।

এদিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। কারণ বাঙলা একাডেমীর প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর

সহযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া লোক-ঐতিহ্যের সংগ্রহ ও গবেষণার ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এগিয়ে আসা উচিত। লোক-ঐতিহ্য যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচীতে সম্মানিত স্থান পায়---তার জন্যও চেষ্টা থাকা দরকার। সুখের কথা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ লোককাহিনী তো বটেই লোক-ঐতিহ্যকেও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্যের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে একটি প্রচণ্ড উৎসাহের সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুত জাতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত মূল্যায়ন লোক-ঐতিহ্যের পঠন-পাঠন ছাড়া সম্ভব নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

লোককাহিনীর আন্তর্জাতিক পঠন পাঠন

কার্ল ক্রোন লোককাহিনীর পঠন-পাঠন করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন যে, প্রতিটি কাহিনীর নিবিষ্ট অধ্যয়ন ছাড়া, প্রতিটি কাহিনীর যত বেশী সম্ভব পাঠান্তর সংগ্রহ করা ছাড়া, অন্য কোনভাবে লোককাহিনীর চূড়ান্ত পঠন-পাঠন সম্ভব হতে পারে না। তাঁর উপলব্ধিতে একথাও ধরা পড়ে যে, লোককাহিনীর এই ধরনের পঠন-পাঠনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। স্টিথ থম্পসনের মতে কার্ল ক্রোন সমস্যাটিকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। ক্রোন ক্রমাগত অনুভব করেন যে, সমগ্র বিশ্ব থেকে লোককাহিনী সংগ্রহ করা, শ্রেণীবদ্ধ করা এবং সংরক্ষণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। যাতে গবেষকদের কাজ করবার সুবিধে হয় সেজন্য সংগৃহীত কাহিনী যাতে সকলের কাছে পৌঁছায় তারও যথাযথ ব্যবস্থা করা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শুধুমাত্র এতেও সঠিক কাজ করা সম্ভব হবে না। লোককাহিনীর বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন তখনই সম্ভব, যখন পঠন-পাঠনের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসৃত হবে। এই পদ্ধতি ব্যতীত সংগৃহীত কাহিনীর টাইপ নির্ণয় করা সম্ভব হবে না—সম্ভব হবে না গবেষণার ফলাফলকে সমীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ করা এবং লোককাহিনীর পঠন-পাঠনের জন্য সাধারণ সূত্র স্থির করা।

ক্রোন যে উচ্চাশা প্রকাশ করেছিলেন তাকে পূর্ণভাবে রূপায়িত করতে হলে সকল দেশের গবেষক ও পণ্ডিতদের সহযোগিতা ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য ক্রোনের মত বলিষ্ঠ গবেষক তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার দরুনই শেষপর্যন্ত জয়লাভ করেন। বিভিন্ন দেশ ও সম্প্রদায়ের গবেষকদের সহযোগিতা তিনি লাভ করেন আর সেই সঙ্গে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যেও সৃষ্টি

করেন নতুন কর্মোদ্যম ও প্রেরণা। এ-প্রসঙ্গে ষ্টিথ থম্পসন বলেন যে, প্রায় চল্লিশ বছরের অধিক কাল ইউরোপ ও আমেরিকার গবেষকরা বারংবার হেলসিংকিতে গিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এ-ছিল তাঁদের কাছে তীর্থযাত্রার মত একটি ঘটনা। কেননা ক্রোনের সান্নিধ্য তাঁদেরকে দিয়েছে অনন্য অভিজ্ঞতা।

তিনি যথাসম্ভব সবস্থান থেকেই লোককাহিনী সংগ্রহের জন্য উৎসাহ দিতেন। কাহিনীগুলো কিভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় তা নিয়ে তিনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করতেন। তিনি তাঁর সহযোগী সহকর্মী এণ্টি আর্ণেকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করতেন। তিনি যে কাহিনীর সূচী তৈরী করতেন, আর্ণে তা প্রকাশ করতেন।

ক্রোনের শিষ্য আর্ণে বাস্তবিকই ছিলেন একান্ত সুযোগ্য। তিনি ফিনল্যাণ্ডের লোককাহিনীর একটি সূচী প্রকাশ করেন। পরে এটিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে আরও সূচী তৈরি হয়। বলাবাহুল্য, একাজের আন্তরিক প্রেরণা জুগিয়েছিলেন ক্রোন। সূচীগুলো মুদ্রিত করবার আয়োজনও করেন তিনিই। ক্রোন যে-ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি অবলম্বন করে কাজ শুরু করেছিলেন, আর্ণের হাতে তা আরও উন্নত হয়। আবার ক্রোন নিজেও পদ্ধতিটিকে ক্রমাগত বৈজ্ঞানিক করবার ব্যাপারে প্রভত পরিশ্রম করেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি অনেকগুলো প্রবন্ধ রচনা করেন। এসব প্রবন্ধকে আদর্শ করে বিভিন্ন দেশে অনুরূপ পঞ্চাশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবনের শেষে, প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে নিরলস কাজ করবার পর, তিনি তাঁর গবেষণার ফলাফলকে **Verzeichnis der Marchentypen** নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ষ্টিথ থম্পসন পরবর্তীকালে এটিকে সংশোধিত করে **The Types of the Folktale** নামে প্রকাশ করেন।

এ-প্রসঙ্গে স্টিথ থম্পসন বলেন যে, লোককাহিনী সংক্রান্ত ক্রোনের যে সাধনা তা তাঁর একক দানে সমৃদ্ধ নয়। বরং ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিত ও গবেষকদের মিলিত প্রচেষ্টা ক্রোনের সাধনাকে সম্ভব করে তোলে। তবে ক্রোনের নেতৃত্ব ও আর্থিক ব্যাপারে ফিনল্যাণ্ডের বদান্যতা লোককাহিনীর পঠন-পাঠনকে সহজসাধ্য করে তুলেছিলো।

ক্রোনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হল ১৯০৭ সালে। ঐ বছরেই বিশ্বের লোক-ঐতিহ্যের পণ্ডিত ও গবেষকদের নিয়ে গড়ে উঠলো নিরপেক্ষ নামের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। ইংরেজিতে একে সংক্ষিপ্ত করে FF (Folklore Fellows) নামে অভিহিত করা হল। বিভিন্ন দেশের ভাষানুযায়ী এভাবে নিরপেক্ষ নাম দিয়ে সংগঠনটির পরিচয় প্রকাশ করা হয়ে থাকে। থম্পসন বলেন যে FF খুব একটা শিথিল সংগঠন। কারণ এর কোনো নিজস্ব কর্মচারী বা সর্বজনসমর্থিত কোনো সদস্য নেই। অবশ্য তবুও এরই ফলে বিভিন্ন দেশের লোক-ঐতিহ্যের কর্মী, গবেষক ও ছাত্রদের মধ্যে যোগাযোগ হল সহজসাধ্য। FF প্রধানত যে-কাজটি সম্পন্ন করে তাহল FF Communications নামে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের মুদ্রণ ও প্রকাশনা। ১৯০৭ সালে ক্রোন এই কাজটি শুরু করেছিলেন। আন্তর্জাতিক লোক-ঐতিহ্যের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এই প্রকাশনার গুরুত্ব অসীম। প্রায় ১২৫টি সুসম্পূর্ণ গ্রন্থই FF Communications নামে প্রকাশিত হয়।

FF Communications সংগৃহীত কাহিনীর তালিকা, কাহিনীর শ্রেণীবিভাগ করে তার দুটি অনুবাদ, কয়েকটি মটিফ-সূচী এবং বিশেষ বিশেষ কাহিনী সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। এছাড়াও লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে মূল্যবান নিবন্ধও এতে প্রকাশিত হয়।

কাহিনীর শ্রেণীবিভাজনের যে-প্রচেষ্টা ক্রোন প্রথম থেকে শুরু করেছিলেন তার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের যে-সব দেশে লোককাহিনীর সংরক্ষণাগার রয়েছে সেখানে তা বিতরণ করা। যাতে গবেষকরা লোককাহিনীর সম্বন্ধে সহজেই গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে পারেন সেজন্যই এ-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এর পূর্বে লোককাহিনীর সংগ্রহগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোনো কাজেই লাগতো না। কারণ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় হস্তলিখিত পুঁথিতে তা অকেজো হয়ে পড়ে থাকতো। সুতরাং বিভিন্ন দেশের লোককাহিনীর গবেষকদের কাজে আসতো না। কাজেই সংক্ষিপ্তভাবে হলেও লোক-কাহিনীর পরিচয় যাতে গবেষকদের কাছে পৌঁছয়, সেজন্য এই চেষ্টা লোককাহিনীর আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি করে।

আর্ণের সূচী প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আর্ণের সূচীকে আদর্শ করে সূচী গড়ে উঠতে থাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো বিভিন্ন দেশের সংরক্ষণাগারে পাঠানো হয়। আজকে যাঁরা লোককাহিনীর গবেষণায় নিযুক্ত আছেন তাঁরা চেষ্টা করলেই কাহিনীর মুদ্রিত তালিকা পেতে পারেন। যদি মুদ্রিত তালিকা নাও থাকে তাহলে সংরক্ষণাগারে লিখলেই তা পাওয়া যায়। অনেকক্ষেত্রে সেগুলো অনুবাদ করিয়ে নিতে হয়।

ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে লোক-ঐতিহ্যের সংরক্ষণাগার দ্রুতগতিতে গড়ে উঠতে থাকে। একমাত্র ফিনল্যাণ্ডেই লনরটের কাল থেকে ৫০ হাজারের বেশি লোককাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। এস্টোনিয়ায় জে. হার্ট ও এম. জে. আইসেনের নেতৃত্বে লোককাহিনীর সংগ্রহের অভিযান শুরু হয়। পরবর্তীকালে ওয়াল্টার এণ্ডারসন ও অস্কার লুরিস তাঁদের আরব্ধ কাজকে শেষ করেন। আর্ণে এসব কাহিনীর একটি সূচীও তৈরী করে দেন। লিথুয়ানিয়ার সংরক্ষণাগার ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়েছে বিপুল সংগ্রহের মাধ্যমে। এর পরিচালক জে. বেলিসের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এসব কাহিনী গবেষকদের পক্ষে সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়েছে। ইংরেজিতে এসব কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাও এখানে পাওয়া যায়। সুইডেনে চার চারটি কেন্দ্রে লোককাহিনী সংরক্ষিত হয়েছে। এগুলো হল উপসালা, স্টকহল্‌ম্‌ গটেনবার্গ ও লাণ্ড। এসব কেন্দ্রের কাহিনীগুলো সুন্দরভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এবং এগুলো অন্য দেশের পক্ষে আদর্শ তালিকা হিসেবেও কাজ করছে। সমগ্র সুইডেনব্যাপী বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য এই কেন্দ্রগুলো নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অ্যাক্সেল ওলরিক 'Dansk Folkemin-desamling নামে একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। রাজকীয় গ্রন্থাগারের একটি অংশে এই কেন্দ্র অবস্থিত। বলাবাহুল্য ডেনমার্ক এর জন্য প্রচুর আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে। এই কেন্দ্রটি লোককাহিনীর প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির প্রাচুর্যে ঐশ্বর্যময়। স্ভেন্দ্র গ্রুন্দৎভিগ্‌ এখানকার কাহিনীসংগ্রহকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে শ্রেণীভুক্ত করেন। অবশ্য এর সঙ্গে আর্ণের পদ্ধতি অনুযায়ী একটি তালিকাও এতে গ্রথিত করা হয়।

নরওয়ের অসলোতে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কেন্দ্রে লোক-কাহিনীর একনিষ্ঠ গবেষক ক্রিশ্চিয়ানসেন নেতৃত্ব দান করছেন। কেন্দ্রটি থেকে Norsk Folkminnelag নামে নিয়মিত একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। থম্পসনের মতে নরওয়ের লোককাহিনীর যে-সংকলন ক্রিশ্চিয়ানসেন প্রকাশ করেন তা পৃথিবীর যে-কোনো দেশের সংকলনের চেয়ে বিস্তৃত এবং বৈজ্ঞানিক। জার্মানীর ফ্রিবুর্গে জার্মান লোকসঙ্গীতের একটি কেন্দ্র দীর্ঘকাল ধরে পরিচালিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বার্লিনে লোককাহিনীর সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হস্তলিখিত সংগ্রহের একটি ভালো গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে এখানে রিচার্ড ওসিল্‌ডোর নেতৃত্বে। ফ্রান্সের প্যারিসে Department et Musee National des Arts et Traditions Populaires ১৯৩৭ সালে এখানে আহুত International Folklore Congress-য়ের অধিবেশনের ফলে এক বিপুল প্রেরণা লাভ করে। গত মহাযুদ্ধের আগেই সমগ্র দেশব্যাপী শুরু হয় সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ। লোককাহিনী সংগ্রহের ক্ষেত্রে Irish Folklore Commission সিমাস ও'দুলিয়ার্গার নেতৃত্বে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। দক্ষ ও ট্রেনিং-প্রাপ্ত সংগ্রাহকের দল গেলিক ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে হাজার হাজার কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। সংগৃহীত কাহিনীসমূহের তালিকা প্রস্তুত করা, যদিও ছিল একটি পরিশ্রমসাধ্য কাজ, তবু তা দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন কেন্দ্রের পরিচালক সিয়ান ও'সুলিভান। কমিশন Bealoideas নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করে থাকেন। রাশিয়াতে বিভিন্ন সংগঠন লোককাহিনী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Library of Congress-য়ের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ কেন্দ্রটিকে বর্তমানে সম্প্রসারিত করে লোক-ঐতিহ্যের সকল উপাদান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এসব কেন্দ্র ছাড়াও বিশ্বের বহু ব্যক্তি লোককাহিনীর প্রতি অনুরাগ বশত লোককাহিনী সংগ্রহ করেছেন। তাদের সংগ্রহশালাগুলোও গবেষণার জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে।

লোক-ঐতিহ্যের এ-সব কেন্দ্র বা সংগ্রহশালার দরুনই আজ লোক-কাহিনীর তুলনামূলক পঠন-পাঠন সম্ভব হয়েছে। বাস্তবিকই বহু গবেষকের

পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ই বিশ্বব্যাপী লোককাহিনীর বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠনে উৎসাহ জুগিয়েছে।

আজকে এ-কথা স্বীকৃতি পেয়েছে যে, লোককাহিনী মূলত একটি বিশ্বজনীন ঘটনা। অবশ্য এ-স্বীকৃতি সম্ভব হয়েছে প্রাচীন জনগোষ্ঠীর লোককাহিনী সংগৃহীত হওয়ার ফলে। উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের লোককাহিনীর সংগ্রহ এ-প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ বলে দাবি করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোয়াস এই সংগ্রহের কাজে তাঁর সমগ্র জীবনই ব্যয় করেছেন। এসব কাহিনীর টাইপ ও মটিফের বিস্তৃতি কোথায় কতটা পরিমাণে ঘটেছে তাও তিনি নির্ণয় করেছেন। আফ্রিকার, বিশেষ করে কঙ্গো ও সাহারার মধ্যাঞ্চলের লোককাহিনীগুলিও ফ্রোবিনিয়াসের নেতৃত্বে সংগৃহীত হয় এবং সেগুলো Atlantis নামে প্রকাশিত হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে লোককাহিনীর সংগ্রহ ও আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু এসব সংগ্রহ ও আলোচনা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ, এর জন্য দরকার সাময়িক পত্র-পত্রিকা। মাঝে মাঝে এরকম পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জীর সহায়তাও এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। বার্লিনের হফম্যান-ক্রেয়ার ও পরবর্তীকালে পল গিগারের সম্পাদনায় এ-ধরনের গ্রন্থপঞ্জীও প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার লোক-ঐতিহ্যের সুবিপুল তথ্যপঞ্জী র‍্যালফ এস. বগ্‌সের সম্পাদনায় প্রকাশ করা হয়।

জর্মান ভাষাভাষী লোক-ঐতিহ্যের বিশেষজ্ঞরা লোক-ঐতিহ্যের সামগ্রিক পরিচয় দিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ প্রকাশ করেছেন। বেসেলের Hanns Bachtold Staubli এটি সম্পাদনা করেন। এতে শুধু জার্মান ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর লোক-ঐতিহ্যের পরিচয়ই নেই—আছে সমগ্র বিশ্বের লোক-ঐতিহ্যের বিস্তৃত আলোচনা। তাছাড়া ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় লোকতত্ত্ববিদ্‌দের মতামতও এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। Johannes Bolte লুৎস্‌ ম্যাকেনসেনের নেতৃত্বে এ-ধরনের আর একটি কোষ প্রস্তুত করেন। স্টিথ থম্পসন দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন যে গত মহাযুদ্ধের সময় এই কাজটি বন্ধ হয়ে যায়।

লোককাহিনীর পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অসুবিধা মালমশলা বা তথ্যাদির অভাব। তার কারণ হাতের কাছে সেগুলো পাওয়া যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে-সব সংগৃহীত কাহিনী সংরক্ষিত অবস্থায় আছে—তা সকলের ব্যবহারের জন্য পাওয়া দরকার। ফ্রেড্‌রিখ্‌ ভন্‌ ডার লেইয়েন ত্রিশ খণ্ডেরও বেশি লোককাহিনীর সংগ্রহ সম্পাদনা করেন। এই সংগ্রহসমূহ লোককাহিনীর গবেষকদের বিশেষ সাহায্য করে। এই একই উদ্দেশ্যে ফরাসী দেশেও লোককাহিনীর সংগ্রহ প্রকাশিত হয়।

লোককাহিনীর আন্তর্জাতিক পঠন-পাঠনের বিষয়ে ক্রোনের দান সর্বাধিক। তাঁকে অনুসরণ করে ওয়াল্টার এণ্ডারসন দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে যাচ্ছেন। লোককাহিনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ক্রোন ও আর্ণের পদ্ধতিকে আরও সমৃদ্ধ ও যথাযথ করবার ব্যাপারেও তিনি প্রভূত পরিশ্রম করেছেন। লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে ক্রোনের ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির গুরুত্বকে তিনি আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছেন। এবং যখনই এ-পদ্ধতিকে কেউ আক্রমণ করেছেন, তখনই তিনি তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন। স্টিথ থম্পসনের মতে কাহিনী সম্বন্ধে এণ্ডারসনের জ্ঞান অদ্বিতীয়—অন্ততঃপক্ষে বাল্টোশ্লাভিক অঞ্চলের কাহিনী সম্পর্কে তো বটেই। এছাড়াও লোককাহিনীর তরুণ ছাত্র ও গবেষকদের তিনি সর্বদা উৎসাহ জুগিয়েছেন।

নরওয়ের বহুভাষাবিদ গবেষক ক্রিশ্চিয়ানসেন নরওয়ের লোককাহিনীর তালিকা প্রস্তুত করা ছাড়াও লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনায় ব্যাপক সাহায্য করেছেন। Irish Folklore Commission-কে গেলিক লোককাহিনীর তালিকা প্রস্তুত করতেও তিনি বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। লিডেনের (হলাণ্ড) Jan de Vries লোক-কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনায় উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব দান করেন। তিনিই প্রথম ইন্দোনেশিয়ার মত একটি উপেক্ষিত অঞ্চলের কাহিনী সংগ্রহ করেন। অবশ্য The Clever Peasant Daughter নামক কাহিনীটির তুলনামূলক আলোচনা করেই তিনি লোককাহিনী আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবের সূচনা করেন। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে তিনি লোকতত্ত্ববিদদের সংগঠন গড়ে তুলবার ব্যাপারে যথেষ্ট কাজ করেন।

আয়ারল্যাণ্ডের গবেষক সিমাস ও'দুলিয়ার্গা লোককাহিনীর সংগ্রহ-সংরক্ষণ ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। লাণ্ডের (সুইডেন) লোককাহিনী সংগ্রহ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক সি. ডব্লু. ভঁন সিডো নরওয়ে ছাড়াও আয়ারল্যাণ্ডে কাজ করেন এবং তাঁরই প্রেরণায় আয়ারল্যাণ্ডে Folklore Commission স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্বের লোককাহিনী-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি স্বতন্ত্র ও মৌলিক চিন্তাধারার জন্য বিশিষ্ট বলে পরিচিত। তাঁর মতামতের সঙ্গে সবাই যে একমত তা নন, কিন্তু লোককাহিনীর আন্তর্জাতিক পঠন-পাঠনে তাঁর দান বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আন্তর্জাতিক দিক্ থেকে লোককাহিনীর পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ফ্রান্সিস জেমস্ চাইল্ড (১৮২৫—১৮৯৬) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে লোক-ঐতিহ্যের পঠন-পাঠনের কেন্দ্রে পরিণত করেন। চাইল্ডের আরব্ধ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান জর্জ লিমান কিট্রেজ। হার্ভার্ডের লোক-ঐতিহ্যের লাইব্রেরী লোককাহিনীর পঠন-পাঠনকে নানাভাবে সাহায্য করে। কিট্রেজের ছাত্র আর্চার টেলস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম লোকতত্ত্ববিদ যিনি ইউরোপের লোকতত্ত্ববিদদের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন করেন। FF Communications-য়ের সম্পাদকীয় পরিষদের সদস্য হিসেবেও তিনি কাজ করেন। লোককাহিনীর আন্তর্জাতিক পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে তাঁর উপদেশ ও সাহায্য বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। টেলরের অনুসারীদের মধ্যে র‍্যাল্ফ্ এস, বগ্‌স্ Index of Spanish Tales প্রকাশ করেন। ল্যাটিন আমেরিকার লোককাহিনীর বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি সুপরিচিত। দুই আমেরিকার লোককাহিনীর আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি প্যান-আমেরিকান আন্দোলন গড়ে তোলেন।

কিট্রেজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন স্টিথ থম্পসন। তিনি ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের লোককাহিনীর তুলনামূলক আলো-

চনা সমাপ্ত করেন।[৩৬] এছাড়া তিনি উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের কাহিনীগুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।[৩৭] থম্পসন আর্ণের টাইপ-সূচী ও মটিফ-সূচী পরিমার্জিত করে পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এছাড়াও তাঁর The Folktale গ্রন্থটি লোককাহিনীর আলোচনার ক্ষেত্রে একটি অমর অবদান বিশেষ।

লোককাহিনীর যে-আলোচনার সূত্রপাত ক্রোন করেছিলেন উপরোক্ত গবেষকরা শুধু সেই ঐতিহ্যকেই কোন না কোনভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এঁরা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবেই কাজ করেছেন, তবুও ক্রোনের সাধনাকেই তাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন। উপরোক্ত গবেষকরা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের মাধ্যমে (কখনও চিঠি-পত্র ও কখন দেখাসাক্ষাৎ) নানা সমস্যার সমাধান করেছেন। এঁরা ক্রমাগত উপলব্ধি করেছেন যে শুধুমাত্র চিঠি-পত্র বিনিময় বা স্বল্প সময়ের দেখাসাক্ষাৎ বা সংক্ষিপ্ত সফরসূচীর মাধ্যমে খুব বড় একটা কাজ করা যাবে না। এই উপলব্ধির ফলেই ১৯৩৫ সালে সুইডেনের লাণ্ডে লোককাহিনীর পঠন-পাঠনের জন্য একটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। রয়াল গুস্তাভ আকাদেমী এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। বিশ্বের প্রখ্যাত লোককাহিনী বিশেষজ্ঞেরা এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনেই Folk নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। Jan de Vries এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। পরে গুস্তাভ আকাদেমী Folk-Liv নামে একটি পত্রিকা বের করলে, Folk পত্রিকাটিকে এই পত্রিকাটির সঙ্গে একত্রিত করা হয়।

১৯৩৭ সালে এডিনবরায় পুনরায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই কংগ্রেসও লোককাহিনী আলোচনার ক্ষেত্রে একটি প্রবল প্রেরণা সৃষ্টি

[৩৬] European Tale Among the North American Indian. Colarado College Publications, Vol, II (Colarado Springs, 1919)

[৩৭] Tales of the North American Indians, Cambridge, Mass. 1929

করতে সক্ষম হয়। ১৯৩৮ সালে প্যারিসে লোকঐতিহ্যের আন্তর্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই কংগ্রেসেই বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ থেকে গবেষকরা একত্রিত হন। অন্যান্য কংগ্রেসগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর ইউরোপের লোকঐতিহ্যই ছিল আলোচ্য বিষয়, কিন্তু প্যারিস কংগ্রেস মোটামুটি আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন করে।

সংগ্রাহকদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায় না। অথচ এঁদের অনেকের অভিজ্ঞতা ছিল সমৃদ্ধ। সংগ্রহের ক্ষেত্রে একজন সংগ্রাহক প্রতিদিন যে সমস্যার সম্মুখীন হন, যে-ভাবে তিনি তার সমাধান করেন, এবং শেষ পর্যন্ত কি ভাবে তিনি কাহিনী সংগ্রহ করলেন--- সে অভিজ্ঞতা আজ বহু সংগ্রাহকের আলোকবর্তিকা হয়ে থাকতে পারতো।

কাহিনী সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সংগঠনের ভূমিকা কার্যকরী হলেও, সংগ্রহের কাজ সবসময়ই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। প্রকৃত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংগ্রাহক কর্তৃক অবলম্বিত কৌশল ও পদ্ধতির উপরই সংগ্রহের কাজ নির্ভর করে। আমাদের দেশে বাঙলা একাডেমী কাহিনী সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক তৎপরতা দেখালেও, সংগ্রহের কাজ করেছেন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি। এইসব ব্যক্তি স্ব স্ব পদ্ধতিতে সংগ্রহের কাজ চালিয়ে গেছেন। দুঃখের বিষয়, একাডেমী কর্তৃপক্ষও সংগ্রাহকদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রকাশ করেননি। অথচ সংগ্রহের কাজকে বৈজ্ঞানিক করতে হলে এটি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

কাহিনী সংগ্রহের প্রথম পর্যায়ে কথকের সন্ধান অপরিহার্য। কাহিনী যাঁরা জানেন ও বলে থাকেন, তাঁদের সন্ধান পাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় নিজেদের সমাজ থেকেই কাহিনীসমূহ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁদের কথকেরা ছিলেন শিক্ষিত। এঁরা সবাই বাল্যকালে নিজ নিজ নার্সের কাছে কাহিনী যেভাবে শুনেছিলেন ঠিক সেভাবেই সেগুলো বিবৃত করেন। কাহিনীগুলো নার্সদের কাছে সংগৃহীত হলে যতটা বিশ্বস্ত হতো, এক্ষেত্রে তা হয় নি।

অনেক স্কুলের ছেলেমেয়েরা নিজেরাই চমৎকার কথক হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু এদের কাছ থেকে আরও ভালো বয়স্ক কথকের সন্ধানও পাওয়া গেছে। বয়স্ক, বিশেষত প্রৌঢ়া কথকরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাৎপর্যময় কাহিনী বলতে সক্ষম। খুব সম্ভব, বয়সের দরুন অভিজ্ঞ হওয়ার ফলেই তাঁদের কাহিনীর ভাণ্ডারটি যেমন পূর্ণ থাকে, তেমনি কাহিনী বলার আর্টও তাঁরা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই কাহিনী বলতে অভ্যস্ত। কিন্তু কোন কোন সমাজে, উপজাতির মধ্যে

ও কোন কোন দেশে হয় পুরুষ, না নয় স্ত্রীলোকেরাই কাহিনীর কথক হিসেবে কাজ করেন। স্টিথ থম্পসন বলেন যে আয়ার্ল্যাণ্ডে সাধারণত পুরুষেরাই কাহিনী বলে থাকেন। অথচ সেদেশের মেয়েরা যে কাহিনী জানেন---তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্য দিকে পূর্ব প্রাশিয়া থেকে সংগৃহীত কাহিনীর বেলায় দেখা যায় যে এর বেশির ভাগ কথক ছিলেন স্ত্রীলোক। অবশ্য, থম্পসনের মতে সংগ্রাহক নিজেও একজন নারী হওয়ার ফলে এরকম ঘটা বিচিত্র নয়।

কোনো কোনো লোকসমাজে কাহিনী বর্ণনার ভার থাকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর। এসব ব্যক্তি পেশাদার কথক হিসেবে কাজ করেন। কেউ বা তাঁর নিয়মিত কাজকর্ম সেরে আংশিকভাবে কাহিনী বলে জীবিকা অর্জন করেন। এসব ব্যক্তি পুরুষ, মোল্লা-মৌলভী বা গ্রামাঞ্চলের পেশাদার গল্প-বলিয়ে সম্প্রদায়ের লোকও হতে পারেন। এক-কথায় কে বা কারা কথক হিসেবে কাজ করেন---সেটা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তবে সংগ্রাহক সচেতন হলে তাঁদেরকে খুঁজে বের করতে পারবেন।

আবার একথাও সত্য যে কথক খুঁজে বের করা সম্ভব হলেও কথকের কাছ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করা সহজসাধ্য বলে প্রমাণিত হয় না। অবশ্য অভিজ্ঞ সংগ্রাহক বাধা-বিপত্তি অপসারিত করে কিভাবে সমস্যার সমাধান করতে হয়---তা ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে করে থাকেন। কথকদের নিকট থেকে কাহিনী শুনতে হলে সর্বদাই কলা-কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। এসব কলা-কৌশল সর্বত্র সবক্ষেত্রে একরকম নাও হতে পারে। কথকদের টাকা-পয়সা দিতে হয় কিনা তা স্থানীয় নিয়মের উপর নির্ভরশীল। স্টিথ থম্পসনের মতে উপহার সবক্ষেত্রেই দেওয়া যায়। খাবার, পানীয় বা বিড়ি-সিগারেট সবসময়ই এসব ব্যাপারে ভাল ফলাফল দিতে পারে।

অনেক সময় এরকম ঘটেছে যে কথক পেলেও তিনি কাহিনী বলতে চান না। সেক্ষেত্রে সংগ্রাহকের দায়িত্ব এই যে তাঁকে নিজেই এগিয়ে আসতে হবে। বলতে হবে কাহিনী, এবং তৈরী করতে হবে কাহিনী বলার উপযুক্ত পরিবেশ। কথক যদিইবা কাহিনী বলতে শুরু করেন---

তাহলে দেখা যাবে যে সংগ্রাহক যে-ধরনের কাহিনী চান তা পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম ক্ষেত্রে সংগ্রাহক যদি কথককে বলতে যান যে ও-ধরনের কাহিনী তিনি চান না---তাহলে কথক নিরুৎসাহ বোধ করবেন---এবং শেষ পর্যন্ত আর কোন কাহিনীই বলতে চাইবেন না। একমাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সমস্ত অসুবিধে দূর করে কথকের কাছ থেকে কাহিনী সংগ্রহের উপায় স্থির করতে হবে। কথককে অনুপ্রাণিত করবার মতো বিদ্যেবুদ্ধি অবশ্যই সংগ্রাহকের থাকতে হবে।

কাহিনী সংগ্রহ করার অন্যতম দিক হল---কাহিনীর সঠিক লিপিবদ্ধ-করণ। কথক যখন কাহিনী বিবৃত করতে থাকেন, ঠিক তক্ষুণি কাহিনীটি লিখে ফেলা দরকার। অবশ্য কথক যদি ধীরে ধীরে বলেন এবং বলার সময় মাঝে মাঝে থামেন, তাহলে লিপিবদ্ধ করার কাজটি সহজ হয়। কিন্তু এ-পদ্ধতির একটি বড়ো অসুবিধে এই যে কথককে এ-ভাবে ধীরে এবং থেমে থেমে বলার জন্য নির্দেশ দিলে কথক কাহিনী বর্ণনার সময় স্বাভাবিক অবস্থা হারিয়ে ফেলে এবং ফলে খেই হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। আর তাছাড়া কথক কাহিনী বলতেই অভ্যস্ত---কাহিনী লেখার কথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। কোনো কোনো কথক আবার দ্রুতগতিতে কাহিনী বলার পক্ষপাতী। এক্ষত্রে লিপিবদ্ধ করার কাজ আরও সংকটময় হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য পৃথিবীর বেশির ভাগ সংগ্রাহক এ-পন্থাতেই কাহিনী সংগ্রহ করেছেন।

কেউ কেউ শর্টহ্যাণ্ডে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু শর্টহ্যাণ্ড সব সংগ্রাহকের জানার কথা নয়। যে-সব কথক দ্রুত কাহিনী বর্ণনা করেন---তাঁদের ক্ষেত্রে এ-পদ্ধতিতে ভালো কাজ হতে পারে। অবশ্য শর্টহ্যাণ্ডের মাধ্যমে খুব বেশি কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে মনে হয় না। এ-প্রসঙ্গে স্টিথ থম্পসন বলেন যে কার্ল ক্রোন এ-পদ্ধতিতে কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। ডব্লু, উইসার (জর্মানী) তাঁর পুত্রকে দিয়ে এ-পন্থায় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

অবশ্য লোককাহিনী লিপিবদ্ধকরণের শ্রেষ্ঠ উপায় হল টেপ রেকর্ডারের ব্যবহার। কথককে যদি এ-যন্ত্রটির ব্যবহার শেখানো যায়,

তাহলে কাহিনী সংগ্রহের ক্ষেত্রে এর চেয়ে ভালো মাধ্যম আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু টেপ রেকর্ডারের সামনে বসলে কথকের সচেতন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে। সেজন্য সংগ্রাহককে সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। টেপ রেকর্ডারের বড়ো সুবিধে এই-খানে যে কথক ধীরে বা দ্রুত যে-ভাবেই বলুক, তাতে কিছু আসে যায় না। সংগ্রাহক শুধু কথককে যন্ত্রটি ব্যবহার করতে শেখালে আর কোনো কষ্ট করতে হবে না। কথক যদি একবার অভ্যস্ত হন, এবং পরে যদি টেপ রেকর্ডার বাজিয়ে তাঁকে এবং উপস্থিত সকলকে তা শোনানো যায়---
---তবে কথক তো বটেই; অন্যান্য সকলেও উৎসাহ বোধ করবেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কাহিনী বর্ণনাকালে আজেবাজে কথাবার্তা না হয়। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলের লোকেরা বারংবার টেপ রেকর্ডার বাজাবার অনুরোধ করতে পারে। এতে সংগ্রাহকের অযথা সময় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

টেপ রেকর্ডারে ভুল-ত্রুটি কম হবে। একজন কথকের কণ্ঠ অন্যেরা শুনলে তারাও তখন কাহিনী বলার জন্য এগিয়ে আসবে। তাছাড়া যদি কথকেরা জানতে পারে যে তাঁদের কণ্ঠ স্থায়ীভাবে ধরে রাখা হচ্ছে---তাহলে তাঁদের খুশির অন্ত থাকবে না। কিন্তু টেপ রেকর্ডার সকলের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই যন্ত্রটি বহন করে গ্রামাঞ্চলে যাওয়া-আসা করারও অনেক অসুবিধে। এখন অবশ্য খুবই ছোট্ট (একটি বইয়ের সমান) টেপ রেকর্ডার পাওয়া যাচ্ছে। এর দাম কম ও বয়ে নিয়ে বেড়াবার পক্ষেও খুব অসুবিধে নেই। তবুও আমাদের দেশের সংগ্রাহকের পক্ষে টেপ রেকর্ডার সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এ-রকম ক্ষেত্রে সমাজহিতকর সংগঠনগুলোর এগিয়ে আসা উচিত।

টেপ রেকর্ডারে কাহিনী সংগ্রহের আর একটি চমৎকার দিক হলো এই যে শুধু এতেই কথকের আঞ্চলিক ভাষা সঠিকভাবে ধরা পড়ে। বলার ভঙ্গি, সরস মন্তব্য, এমন কি সামান্য ইঙ্গিতও নিখুঁতভাবে এতে সংগৃহীত হতে পারে। সংগ্রাহক সব অঞ্চলের সব ভাষা নাও জানতে পারেন। সেক্ষেত্রে কাহিনী সংগ্রহের পর তা অনুবাদ করাতে হবে। মূল ভাষার পাঠও অবিকৃত রাখতে হবে। এ-ব্যাপারে যিনি মূলভাষাটি

জানেন, তার সাহায্য অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে। অবশ্য দোভাষী পাওয়া গেলে সবচেয়ে ভালো হয়।

যে-সমস্ত নৃতত্ত্ববিদ প্রকৃত স্থানে গিয়ে সেই দেশের বা উপজাতির ভাষায় কাহিনী সংগ্রহ করেন, তারা বিশ্বাস করেন যে সেই বিশেষ দেশ বা উপজাতির ভাষায় কাহিনী সংগৃহীত হলে তবেই সে-দেশের বা সে-উপজাতির ঐতিহ্যের সম্যক পরিচয় পাওয়া সম্ভব। কারণ কাহিনীর মেজাজ ও চারিত্র্য শুধুমাত্র আঞ্চলিক ভাষাতেই ধরা পড়ে। অবশ্য স্টিথ থম্পসন মনে করেন যে মূলভাষা ছাড়াও সংগ্রাহকের ভাঙা ভাঙা ভাষাতেও যদি কাহিনী সংগৃহীত হয়, তাও কম মূল্যবান নয়। কারণ কাহিনীর রূপকল্পগত বা আঙ্গিকগত পরিচয়টি এতে অক্ষুণ্ণ থাকে। বহু কাহিনী এ-ভাবেই সংগৃহীত হয়েছে।

কাহিনী যে-ভাবেই সংগৃহীত হোক না কেন, সংগ্রহের সার্থকতা শেষ-পর্যন্ত সংগ্রাহকের উপরই নির্ভর করে। কথকদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে অবশ্যই সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর হতে হবে। কথকদের জীবনের সুখদুঃখ সম্পর্কে সংগ্রাহককে খোঁজ-খবর নিতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে যে সংগ্রাহক এসব ব্যাপারে মোটেই উদাসীন নন। অবশ্য এর মানে এ নয় যে সংগ্রাহককে তাঁদেরই একজন হয়ে উঠতে হবে। স্টিথ থম্পসন বলেন যে শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহকদের অনেকেই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবলিক স্কুলের শিক্ষক। ডাক্তার, উকিল ও পুরোহিতরা তাঁদের পেশার জন্যই অত্যন্ত সহজে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন, ফলে সংগ্রাহক হিসেবেও তাঁরা ভালো কাজ করতে পারেন। এ-কারণে বাংলাদেশ-ভারতীয় কাহিনী সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাদরীরা সত্যিই জনপ্রিয় ছিলেন।

যে-সব দেশ কোনো একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের মাধ্যমে সংগ্রহের কাজ চালিয়েছেন, সে-সব দেশে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের লোকেরাই সংগ্রাহক হিসেবে কাজ করেছেন। সুইডেনে এ-ভাবেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রাহকরা কাহিনী সংগ্রহ করেন। মাঝে মাঝে এঁদেরকে নির্দেশ

দেওয়া হয় এবং তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ-খবরও নেওয়া হয়। অভিজ্ঞতা ও কাজকর্মের ভিত্তিতে তাঁদেরকে বেতন দেওয়া হয়। আমাদের দেশে বাংলা একাডেমীও বিভিন্ন অঞ্চলের সংগ্রাহকদের নিকট থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেন। বলাবাহুল্য, একাডেমীও কাজকর্ম ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁদের বেতনাদি নির্ধারণ করেন।

ডাবলিনে অবস্থিত আইরিশ ফোকলোর কমিশন সবচেয়ে সুশৃংখল-ভাবে সমগ্র দেশ থেকে লোককাহিনী সংগ্রহের কাজ করে যাচ্ছেন। কমিশনের আট থেকে দশজন সর্বক্ষণের সংগ্রাহক রয়েছে। এঁরা প্রধানত স্কুল-শিক্ষক। তাঁরা নিয়মিত শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থেকেও মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে সংগ্রহের কাজ করেন। অবশ্য ছুটি নিলেও তাঁরা পুরো বেতন পান। এক একটি বিশেষ অঞ্চলে তাঁরা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে কাজ করেন। এর ফলে সেই বিশেষ অঞ্চলের সকলের নিকটে তাঁরা যেতে পারেন। তাঁরা রেকর্ডে কাহিনী সংগ্রহ করে তা পরে কাগজে লিখে---রেকর্ড-সহ তা কমিশনের অফিসে পাঠিয়ে দেন। এসব নিয়-মিত সংগ্রাহক ছাড়াও, কমিশনের ১৫০ জন অনিয়মিত সংগ্রাহক রয়েছেন। কমিশনের পরিচালক এসব সংগ্রাহকদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রয়োজন বোধে সংগ্রহের সময় তাঁদের সঙ্গেও বেরিয়ে পড়েন। পরিচালকের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা স্বতোৎসারিত হতে দেখা যায়। স্টিথ থম্পসন বলেন যে সাম্প্রতিককালে আয়ারল্যাণ্ডের সমস্ত স্কুলের ছেলেমেয়েদেরকে তাদের রচনার অংশ হিসেবে লোককাহিনী লিখে আনতে বলা হয়। এসব ছেলেমেয়েরাই কোন্ কোন্ স্থানে কাহিনীর কথকদের পাওয়া যেতে পারে, তার সন্ধান দিয়েছে। এই সূত্র ধরেই তখন নিয়মিত সংগ্রাহকরা কথকদের খুঁজে বের করতেন। স্কুলের ছেলে-মেয়েদের লিখিত লোককাহিনীর হাজার হাজার হস্তলিখিত পাতা কমিশন রক্ষা করেছেন। তাছাড়া অর্ধ-লক্ষাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে সযত্নে গৃহীত কাহিনীসমূহ। কমিশন সমস্ত কাহিনীর শ্রেণী নির্ণয় করে তালিকা প্রস্তুত করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সমস্ত কাহিনী গেলিক ভাষায় বিধৃত হওয়ায় সকলের পক্ষে তা ব্যবহার সম্ভব নয়।

লোককাহিনীর সংগ্রহ ও তার সংগ্রহশালা গড়ে উঠলেও, সংগ্রাহকরা তাদের সংগ্রহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেননি। যে-টুকু সংবাদ সবাই দিয়ে থাকেন—তা কথকের নাম ও তার বাসস্থান, বয়স ও পেশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ যে-দু'একজন সংগ্রাহক সংগ্রহকালীন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা খুবই চিত্তাকর্ষক। অন্যেরা তা পড়ে আনন্দও পেতে পারেন। জার্মানীর সংগ্রাহক ভিলহেল্ম্ উইসার হলস্টেইন অঞ্চলে কাহিনী সংগ্রহকালে তাঁর রোজনামচাতে কাহিনী সংগ্রহের দৈনন্দিন বিবরণ লিখে রাখতেন। প্রায় বিশ বছর ধরে তিনি এ-ভাবে তাঁর অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। লোককাহিনী সংগ্রহের ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য ঘটনা বটে। তাঁর বর্ণনায় যে-সমাজ থেকে তিনি কাহিনী সংগ্রহ করতেন—তা মূর্ত হয়ে বেঁচে আছে।

এরকম আর একজন সংগ্রাহিকা ছিলেন জার্মানীর হার্থা গ্রাড। পূর্ব প্রাশিয়াতে তিনি কি ভাবে কাহিনী সংগ্রহ করতেন তার বিস্তৃত বর্ণনা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। কি ভাবে তিনি মহিলা কথকদেব খুঁজে বের করতেন, কি ভাবে তাদের লজ্জা-শরম কাটিয়ে তাঁদের কাছে কাহিনী সংগ্রহ করতেন, তার বিশ্বস্ত বিবরণ তিনি রেখে গিয়েছেন। তাঁর মহিলা কথকদের অনেকেরই এমন ধারণা ছিল বুঝি-বা তাঁদেরকে নিয়ে হাসি-তামাসা করবার জন্যই কাহিনী সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি ধৈর্য-সহকারে তাঁদেরকে তাঁর উদ্দেশ্য বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ-ছাড়া কাহিনী লিপিবদ্ধ করার একটি সংক্ষিপ্ত ও অথচ মূল্যবান পদ্ধতিও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন।

মার্ক আজাদভস্কি রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে কাহিনী সংগ্রহ-কালে কথকদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সঙ্গে তিনি কথকদের সম্পর্কে অন্যান্য সংগ্রাহকদের বক্তব্যও তুলে ধরেছেন। স্টিথ থম্পসনের মতে রাশিয়ানরা লোককাহিনীকে একটি সামাজিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করেন, ফলে তাঁরা কাহিনীর কথক ও সামাজিক পরিবেশের উপরই জোর দেন।

কাহিনী সংগ্রহের আদর্শ পদ্ধতি

বিশ্বব্যাপী লোককাহিনীর আলোচনা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেচে যে সংগ্রহের পদ্ধতিকেও বৈজ্ঞানিক হতে হয়েছে। অবশ্য এর মূলে প্রেরণা জুগিয়েছে বিভিন্ন মতবাদ। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় থেকে শুরু করে আজাদভক্তি পর্যন্ত সবাই কাহিনী সংগ্রহের নীতি মানতে বাধ্য হয়েছেন। সে-নীতি বৈজ্ঞানিক কি না সে-কথা পরে বিবেচ্য। লোককাহিনীর আলোচনা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়েছে আর সেই সঙ্গে সংগ্রহের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন এসেছে। একসময়ে লোককাহিনী সংগৃহীত হয়েছে প্রধানত সংগ্রাহকের খেয়াল খুশি অনুযায়ী। সংগৃহীত কাহিনীর ব্যাখ্যাও হয়েছে পণ্ডিতদের অভিরুচি অনুযায়ী। কিন্তু বর্তমানে আর সেটি হবার যো নেই। যে-লোকসমাজ থেকে কাহিনী সংগৃহীত হয়—সেই লোকসমাজে কাহিনীর বিশিষ্ট ভূমিকা অবশ্যই থাকে। লোককাহিনীর এই ভূমিকার সন্ধানও তাই অনিবার্য। আর সে-কারণেই সংগ্রহের পদ্ধতিও বদলে গেছে। নিম্নে কাহিনী সংগ্রহের আদর্শ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণিত হল :

১। কথকের সন্ধানে : সংগ্রাহক প্রধানত অক্ষরবিহীন (Nonliterate) লোকসমাজ থেকে কথক সংগ্রহ করবেন। আমাদের গ্রামাঞ্চলে সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে ঘুরে বেড়ালেই কথকের সন্ধান পাওয়া যায়। দোকানদার, ব্যবসায়ী, কবিরাজ ও স্বল্পশিক্ষিত লোকেরা কথকদের সন্ধান দিতে পারেন। সবচেয়ে ভালো সাহায্য পাওয়া যায় গ্রামাঞ্চলের প্রাইমারী, জুনিয়র স্কুল বা হাইস্কুলের শিক্ষকদের নিকট থেকে। অবশ্য সচেতন সংগ্রাহক নিজ নিজ পন্থায় কাজ করবেন বলে ধরে নেওয়া যায়। উপজাতি ও বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংগ্রহের বেলায় সংগ্রাহকের পূর্ব-প্রস্তুতি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। উপজাতীয়দের মধ্যে সংগ্রহের কাজ করতে হলে—উপজাতীয়দের ভাষা অবশ্যই জানা প্রয়োজন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা চালু আছে। এমতাবস্থায় সংগ্রাহককে অঞ্চল বিশেষের ভাষা সম্যকরূপে জানতে হবে। এককথায় সংগ্রাহক যে-অঞ্চলে কাজ করবেন, সে অঞ্চলের ভাষা-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

২। কথক পাওয়া গেলে: কথক পাওয়া গেলে সংগ্রহের দ্বিতীয় পর্যায়টি শুরু হয়। কথক যাতে সহজে বাধাবন্ধনহীনভাবে কাহিনী বলতে পারেন, তার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সংগ্রহের কাজ দুভাবে হতে পারে। একটি হল বহু শ্রোতার সামনে কথক যখন কাহিনী বলবেন—তখন তা লিপিবদ্ধ করা। অন্যটি হল শুধুমাত্র কথকের নিকট থেকে কাহিনী সংগ্রহ করা। সারা বিশ্বে উভয় পন্থাতেই কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু লোকসমাজে কাহিনীর যথার্থ ভূমিকা উপলব্ধি করতে হলে শ্রোতার সামনে কাহিনী শ্রবণ করাই ভালো। কেননা যে-মুহূর্তে কথক শ্রোতার সামনে বসেন, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তার কাহিনী বর্ণনার আর্টকে প্রয়োগ করেন। শ্রোতাদের সমর্থনসূচক ইঙ্গিত তাঁকে কাহিনী বর্ণনায় সাহায্য করে। তিনি নিজেও নানা অঙ্গভঙ্গি করে তাঁর কাহিনী বর্ণনা করেন। কাহিনীর অন্তরঙ্গ বর্ণনা শুধু এ-ভাবেই সম্ভব। কাহিনীর নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা কথক তো বটেই, শ্রোতাকেও আনন্দ-বেদনায় দুলিয়ে দিয়ে যায়। সংগ্রাহক কাহিনী বর্ণনার এইসব তথ্য নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। কথকের জীবনের সুখ-দুঃখও কাহিনী বর্ণনা কালে কাহিনীর সঙ্গে মিশে যায়। কাজেই সংগ্রাহককে একদিকে কাহিনী বর্ণনার সময়ে কথকের মুখে-চোখে ও শ্রোতার মধ্যে যে প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়—তা লিখে রাখতে হবে।

৩। কথকের পরিচয়: সংগ্রাহকের অন্যতম কর্তব্য হল কথকের নাম, ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্যক্তিগত রুচি ও মর্জি ও অন্যবিধ বিষয়সমূহ সংগ্রহ করা।

৪। কথক যে-ভাষায় তাঁর কাহিনী বর্ণনা করেন—তা সর্বদা অবিকৃত রাখতে হবে। সে-ভাষা অমার্জিত ও অশ্লীল হলেও। সংগ্রাহক তাঁর নিজের রুচি ও মর্জি কথক ও কাহিনীর বেলায় প্রয়োগ করবেন না। কথকের ভাষা যদি কোনো বিশেষ অঞ্চলের সাধারণ ভাষা হয়—তাহলে সংগ্রহের শেষে সে-ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রণয়ন অবশ্যম্ভাবী। মনে রাখতে হবে, আঞ্চলিক ভাষাসমূহ লোকঐতিহ্যের অন্যান্য বিষয়ের মত পুরুষপরম্পরাক্রমে হস্তান্তরিত সম্পদ। এবং সেজন্যই তা লোকঐতিহ্যের আলোচ্য বিষয় হতে বাধ্য।

৫। সংগ্রহের ক্ষেত্রে: সংগ্রাহক কোন্ অঞ্চলে কাজ করবেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত সুবিধে-অসুবিধে অনুযায়ী স্থির করলেই চলবে। যে-অঞ্চলটি সংগ্রাহক কাজের জন্য বেছে নেবেন, সে-অঞ্চলেই ব্যাপক সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবে কাহিনী সংগ্রহ করলে সেই বিশেষ অঞ্চলটির প্রতি সুবিচার করা হবে না। কারণ একটি অঞ্চলের বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানসিকতা নির্ণয় করতে হলে, সে-অঞ্চলটিতে প্রচলিত সমস্ত কাহিনীই সংগ্রহ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, সংগ্রাহক অবশ্যই সেই বিশেষ অঞ্চলটির প্রকৃতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাও দেবেন। এতে করে একটি অঞ্চলের লোকমানস স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৬। একই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লোককাহিনীর আলোচনা কখনও সুসম্পূর্ণ হতে পারে না—যদি তার সঙ্গে সেই অঞ্চলে প্রচলিত লোক-ঐতিহ্যের অন্যান্য উপাদান সংগৃহীত না হয়। সংগ্রাহককে সেজন্য লোককাহিনী সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে লোক-ঐতিহ্যের অন্যান্য উপাদানও সংগ্রহ করতে হবে। লোককাহিনীর সঙ্গে এসব উপাদানের তুলনামূলক বিচার করলে তবেই লোককাহিনীর সামাজিক ভূমিকা স্পষ্ট হতে পারে।[৩৮]

৭। দেখা গেছে নিরক্ষর সমাজ ছাড়াও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিরাও লোককাহিনী বলেন ও শোনেন। সংগ্রাহক এসব কাহিনীও সংগ্রহ করবেন। কেননা কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে এগুলো সাহায্য করবে। কিন্তু এ-রকম ক্ষেত্রে কাহিনীর স্বতন্ত্র তালিকা প্রণয়ন বাঞ্ছনীয়। শিক্ষিত সমাজে লোককাহিনীর আর কোনও অর্থপূর্ণ ভূমিকা নেই (অবশ্য দু'একটি ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাবে)।

৮। একই অঞ্চলে একই কাহিনীর একাধিক ভাষ্য পাওয়া গেলে তাও সযত্নে সংগ্রহ করতে হবে। এতে তুলনামূলক আলোচনার সুবিধে হবে। মনে রাখতে হবে, কাহিনীতে বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য কথকদের প্রতিভা অনেকখানি দায়ী।

[৩৮] লোককাহিনীর 'বিচার ও মূল্যায়ন' অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রীম থেকে শুরু করে মেলিনোওস্কির কাল পর্যন্ত কাহিনী সংগ্রহের বিচিত্র পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। এককালে সংগ্রহের নীতি-নিয়মটির উপর মোটেই গুরুত্ব আরোপ করা হত না। বরং লোককাহিনীর তাজ্জব ব্যাখ্যার দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া হত (মূলার-কক্স-ফিস্ক-গুবারন্যাটিস চক্রটি এই কাজে সর্বাপেক্ষা উৎসাহ দেখিয়েছেন)। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী পণ্ডিতেরাও (এনড্রু ল্যাং চক্র) সংস্কৃতির বিবর্তন প্রসঙ্গে মনোযোগ দিলেও সংগ্রহের নীতি-নিয়ম প্রসঙ্গে নীরব থাকলেন। অনুতত্ত্বে (Theory of Atomism) বিশ্বাসী (কার্ল ক্রোন—এ্যান্টি আর্ণে—ওয়াল্টার এ্যাণ্ডারসন—স্টিথ থম্পসন চক্র) গবেষক ও পণ্ডিতেরা কাহিনীর বিশ্বব্যাপী সংগ্রহের উপর জোর দিলেও কাহিনী সংগ্রহের রীতি-পদ্ধতি নিয়ে তেমন মাথা ঘামালেন না। এঁরা সবাই লোককাহিনীকে একটি মৃত বস্তু ঠাওরিয়ে তবে তার আলোচনা করার পক্ষপাতী। মূলার প্রমুখ পণ্ডিতেরা (Nature Allegory School) লোককাহিনীকে প্রকৃতি-পুরাণের রূপক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। এনড্রু ল্যাং চক্রটি কাহিনীর অভ্যন্তরে যাদু, তন্ত্র-মন্ত্র ও অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস প্রভৃতি উপাদান দেখে, এগুলোকে আদিম সমাজের থেকে চলে-আসা ভগ্নাংশ (Cultural Evolutionism) বলে রায় দিলেন। কিন্তু বর্তমান লোকসমাজে এগুলোর কোনও ভূমিকা আছে কি না তা মোটেই আলোচনা করলেন না। মনঃসমীক্ষণের (Psychoanalytic School) প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা ফ্রয়েড ও তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী ইয়ুং-অ্যাডল্যার ও সামপ্রতিককালের গবেষক অটো র‍্যাঙ্ক-আর্নেস্ট জোন্‌স্‌ চক্র প্রসঙ্গেও ঐ একই কথা খাটে।

সংগ্রহের রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদই প্রথমে সঠিক আলোক দান করেন। ফ্রান্‌জ্‌ বোয়াস সংস্কৃতির সংমিশ্রণ তত্ত্বে (Diffusionist School) বিশ্বাস করলেও সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি বিশেষ নীতি-নিয়ম মেনে চলেন। তবে সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ রীতি-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা র‍্যাডক্লিফ্‌-ব্রাউন ও মেলিনোওস্কি চক্র (Functional School)। এঁদের মতে লোকসমাজে লোক-ঐতিহ্যের যে ভূমিকা বর্তমান—তা সর্বাপেক্ষা

জরুরি বিষয়। রাশিয়ার আফানাসিয়েভ-আজাদভস্কি চক্রটিও (Marxist School) সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান দিয়াছেন। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত বিভিন্ন চক্র ও তাঁদের অনুসৃত মতামতের মধ্যে বিপুল পার্থক্য বর্তমান। কিন্তু লোকসমাজে লোককাহিনীর যে-জীবন্ত ভূমিকা আছে, তার আলোচনা করতে হলে মেলিনোওস্কি প্রমুখের সংগ্রহের রীতি-পদ্ধতিটি না মেনে উপায় নেই। উপরে কাহিনী সংগ্রহের যে-রীতি-পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা মুখ্যত মেলিনোওস্কির দান। অবশ্য মেলিনোওস্কির রীতি-পদ্ধতি মেনে নেওয়ার অর্থ অবশ্য এ-নয় যে তাঁর সকল বক্তব্যকে মেনে নিতে হবে। তাঁর ধারণা এই যে, একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি (যেমন ট্রোব্রিয়াণ্ড দ্বীপের সংস্কৃতি) অন্য কোনও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না। অর্থাৎ সংস্কৃতির সংমিশ্রণ তত্ত্বে তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর এই মত মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বোয়াস ৎসিম্‌সিয়ান (ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার উপকূলে বসবাসকারী একটি উপজাতি) উপজাতির পুরাণ কাহিনীর আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে কোনো সংস্কৃতিই বিশুদ্ধ নয়। যাই হোক, মার্কসবাদী তত্ত্বের সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন না, কিন্তু মার্কসবাদী সংগ্রাহক সমাজে লোককাহিনীর বিশিষ্ট ভূমিকা কি তা নির্ণয় করেছেন। কথকের জীবনের আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা ও সুখ-দুঃখ কি ভাবে কাহিনীর সঙ্গে মিশে যায়—এটি তাঁদেরই উপলব্ধিতে ধরা পড়ে।

কাহিনী যে-মুহূর্তে সঠিকভাবে সংগৃহীত হয়, তখনই শুধু কাহিনী সংরক্ষণের প্রশ্ন ওঠে। নিম্নোক্তভাবে সংগৃহীত কাহিনীর শ্রেণীবিভাগ করা অবশ্যই দরকার:

(১) রূপকাহিনী, (২) রোমাঞ্চকর কাহিনী, (৩) বীর কাহিনী, (৪) স্থানিক কাহিনী, (৫) ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী, (৬) পুরাণ-কাহিনী, (৭) জীব-জানোয়ারের কাহিনী, (৮) নীতি-কাহিনী, (৯) হাস্যরসাত্মক কাহিনী ও (১০) অন্যান্য কাহিনী।

উপরোক্ত উপায়ে কাহিনীকে শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব হলে, প্রতিটি শ্রেণীর জন্য ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী স্বতন্ত্র নথির ব্যবস্থা করতে হবে।

সর্বদা ব্যবহারোপযোগী একটি সূচী তৈরী করাও অবশ্যম্ভাবী। সাধু বা চলিত ভাষায় প্রতিটি কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য প্রস্তুত করতে হবে এবং প্রতিটি কাহিনীর সঙ্গে তা যুক্ত করে দিতে হবে। প্রতিটি কাহিনীর বৈশিষ্ট্য ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে, তাও কাহিনীর সঙ্গে সন্নিবেশিত করতে হবে। আর্নে-থম্পসন টাইপ ও মটিফ সূচী অনুযায়ী কাহিনীর টাইপ ও মটিফ নির্ণয় করা সম্ভব হলে, সংগ্রাহক তা অবশ্যই করবেন। কিন্তু সবার পক্ষে এটি করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু উপরে বর্ণিত শ্রেণী অনুযায়ী কাহিনীর বিভাগ করা সচেতন সংগ্রাহকের পক্ষে এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। হস্তলিখিত পুথি-পত্র রক্ষা করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে লোককাহিনীর সংরক্ষণাগার গড়ে তোলা এ-সব কারণেই অনেক সময় পরিশ্রমসাধ্য কাজ। তবে ইউরোপে এ-ধরনের ব্যক্তিগত সংরক্ষণাগারও রয়েছে। আমাদের দেশে বাংলা একাডেমী ইতিমধ্যেই পাঁচশত (হস্তলিখিত) খণ্ডে লোককাহিনী তো বটেই, লোক-ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপাদানের একটি চমৎকার সংরক্ষণাগার গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

টাইফ ও মটিফ অনুযায়ী কাহিনীর শ্রেণীবিভাগ

দেশে দেশে লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস সংক্ষেপে ইতিপূর্বে প্রদান করা হয়েছে। কাহিনীর রূপকল্প (Form) অনুযায়ী একটি শ্রেণীবিভাগের আলোচনা এ-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হলেও সমগ্র বিশ্বে যে সব লোককাহিনী সংগৃহীত হয়েছে, তা শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য আর একটি ভিন্ন কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। অবশ্য এ-পদ্ধতি যে একদিনে উদ্ভাবিত হয়েছে তা নয়। বহু গবেষকের দীর্ঘকালের সাধনা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে বটে, কিন্তু সর্বজনের ব্যবহারোপযোগী শ্রেণীবদ্ধকরণের পদ্ধতি এবং সে-পদ্ধতি অনুযায়ী তালিকা বা সূচী প্রণয়ন করার প্রচেষ্টা প্রথম দিকে নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জে. জি. ভন হান লোককাহিনীকে একটি শৃংখলাপূর্ণ উপায়ে সাজিয়ে একটি তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা করেন। ষ্টিথ থম্পসনের মতে হানের পদ্ধতি আজ শুধু ঐতিহাসিকদের কৌতূহল মেটাতেই সক্ষম, কারণ তিনি সামান্য কয়েকটি কাহিনীকে ভিত্তি করে তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাছাড়া গ্রীক পুরাণ-কাহিনীর সঙ্গে আধুনিক লোককাহিনীর সম্পর্ক নির্ণয় করতেই তিনি অধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর পদ্ধতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল এইখানে যে কাহিনীর টাইপ ও মটিফের মধ্যে যে-পার্থক্য বর্তমান, সে-সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। কাজেই হানের পদ্ধতি লোককাহিনীর বিশেষজ্ঞরা মোটেই ব্যবহার করেন নি। বরং বিশ্ববিখ্যাত লোককাহিনীর নাম উল্লেখ করে এক সময় কাহিনীর শ্রেণীবিভাগ করা হত। যদি কেউ 'কিউপিড ও সাইকি', 'সিণ্ডেরেলা', 'স্নো হোয়াইট' বা 'জ্যাক ও শিমের গাছের' মত কোন

কাহিনীর সন্ধান পেতেন, তাহলে বলতেন যে এই কাহিনীটি অমুক কাহিনীর মত। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের 'হাউসহোল্ড টেল্‌সে' কাহিনীর যে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেই সংখ্যা ধরেও কেউ কেউ কাহিনীর শ্রেণীবিভাগ করতেন। জার্মানীর কোহ্‌লার লোককাহিনীর সংগ্রহ ও সম্পাদনা করবার সময় কাহিনীতে বহু-ব্যবহৃত ঘটনা ও অন্যান্য মটিফের তালিকা সন্নিবেশিত করতেন। এ-ধরনের সংগ্রহে প্রদত্ত বহু-ব্যবহৃত ঘটনা বা বারংবার আবৃত্ত শব্দসমষ্টি (Catchword) বা শীর্ষনাম সকলের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তবুও শ্রেণীবদ্ধকরণের এই তিনটি পদ্ধতি অর্থাৎ বিখ্যাত কাহিনীর শীর্ষনাম, গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনীর ক্রমিক সংখ্যা ও বহু-ব্যবহৃত মটিফ অনেকখানি আংশিক প্রয়োজন মিটিয়েছে। কোহ্‌লার ও কস্কোঁয়া'র গ্রন্থসমূহ, বোল্ট কর্তৃক গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের 'হাউস-হোল্ড টেল্‌সে'র সম্পাদিত খণ্ডসমূহ ও তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ মূলতই উপরোক্ত পদ্ধতিতে প্রস্তুত অক্ষরানুক্রমিক সূচীর উপরেই ছিল নির্ভরশীল। ডেনমার্কের প্রখ্যাত গবেষক এইচ. এফ্. ফিলবার্গ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় ঐ একই পন্থায় কাজ করেন।

১৮৯১ সালে লণ্ডনে আহুত 'আন্তর্জাতিক ফোকলোর কংগ্রেসে' জোসেফ জ্যাকব্‌স্ ব্রিটিশ লোককাহিনীতে বহু-ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দসমষ্টি (Catchword) সমূহের একটি বিপুলকায় তালিকা উপস্থিত করেন। অবশ্য এতেও কাহিনীকে বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রেণীবদ্ধকরণের কাজ কিছুমাত্র অগ্রসর হয় নি। কেননা এক্ষেত্রে কাহিনীর টাইপ ও মটিফ মিশ্রিত হয়ে একটি জগা-খিচুড়ির সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য পূর্ব-পরিচিত বহুবার আবৃত্ত ঘটনা ও Catchword-য়ের আরও অধিক পরিচিতি ঘটে তাঁরই মাধ্যমে। কিন্তু এর বেশি আর কিছুই নয়। কিন্তু এই অক্ষরানুক্রমিক তালিকাও শুধুমাত্র ইউরোপীয় ও দূরপ্রাচ্যের কাহিনীর বেলায় প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীসমূহের শ্রেণী নির্দেশ করবার মত কিছুই ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদি অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীকে শ্রেণীবদ্ধকরণের বেলায় এ-রকম একটি প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট এইচ. লোয়ী এবং আলফ্রেড এল. ক্রোয়েবার কাহিনীর তালিকা প্রকাশ করতে থাকেন।

ফ্রান্‌জ্ বোয়াস ১৯১৬ সালে তাঁর 'ৎসিম্‌সিয়ান্ মিথোলজি' (Tsimshian Mythology)-তে ঐ তালিকা ব্যবহার করেন এবং তাকে সমপ্রসারিত করেন। পরে এ তালিকা এল্‌জি ক্লুস্ পার্সন্‌স্-য়ের মত ব্যক্তিদের হাতে ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও কাহিনীর টাইপ ও মটিফ মিশ্রিত হওয়ার ফলে প্রকৃত শ্রেণীবদ্ধকরণের কাজ মোটেই এগোয় নি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে কাহিনীকে বৈজ্ঞানিক ভাবে শ্রেণীবদ্ধকরণের চেষ্টা প্রথমাবধি লক্ষ্য করা গেলেও তা সার্থকতায় মণ্ডিত হয় নি। এটি না হওয়ার মৌলিক কারণ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী ও তার অভ্যন্তরে অবস্থিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল। লোককাহিনীর সচেতন পাঠকমাত্রই অনুভব করবেন যে লোককাহিনীর সংগ্রহ বা অনেকগুলো কাহিনী পড়বার পর একথা স্বতই মনে হবে যেন এক একটি কাহিনী অন্য কোনো কোনো কাহিনীর মত। এই যে উপলব্ধি, এর থেকেই একই ধরনের কাহিনীর শ্রেণীবিভাগের প্রশ্ন দেখা দেয়। কেন একটি কাহিনীকে অন্য আর একটি কাহিনীর মত মনে হয়? কেন এই সার্বিক সাদৃশ্য? এই প্রশ্নগুলো প্রথম থেকেই বহু গবেষকের মনে দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, কাহিনীর শরীরে বিধৃত বহু ঘটনা, বৈশিষ্ট্য, তাৎপর্যময় শব্দসমষ্টি (Catchword) একই রকমের বলে মনে হতে থাকে। যেমন আমাদের দেশের লোককাহিনীতে পাখিতে কথা বলে, কখনও কখনও মানুষ পাখিতে রূপান্তরিত হয় ও পাখিই বিপদগ্রস্ত নায়ক-নায়িকাকে সাহায্য করে। আবার একই রকম তাৎপর্যময় শব্দসমষ্টির ব্যবহার করে কাহিনীর পরিচয় তুলে ধরা হয়, যেমন, 'এক যে ছিল রাজা' জাতীয় কাহিনী। এইসব বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যময় শব্দসমষ্টি (Catchword) বহু কাহিনীতে লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্যকে কেউই কাহিনী বলে ভুল করবেন না। লক্ষ্য করা যাবে যে প্রথম দিকে এভাবে কাহিনীকে কাহিনীর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে কাহিনীর শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করা হয়। আর স্বভাবতই এ-ধরনের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

কাজেই কাহিনীর সুসম্বদ্ধ শ্রেণীবিভাগ করতে হলে কাহিনীকে টাইপ ও মটিফ অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত করা প্রয়োজন। তারও আগে টাইপ

ও মটিফ কাকে বলে তা উপলব্ধি করতে হবে। ষ্টিথ থম্পসন কাহিনীর টাইপের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেন,

"টাইপ হল স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত কাহিনী। এরকম কাহিনীকে একটি সম্পূর্ণ কাহিনী হিসেবেই পরিবেশিত করা হয় এবং তা তার ব্যাখ্যার জন্য অন্য কোন কাহিনীর উপর নির্ভর করে না। এমন হতে পারে যে সত্যি সত্যি এ কাহিনী অন্য আর একটি কাহিনীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পরিবেশিত হয়, কিন্তু সে-কাহিনী যদি এককভাবেও পরিবেশিত হয়—তবে সেটিই হল তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণ। এ-কাহিনীর একটিই বা একাধিক মটিফ থাকতে পারে।"[৩৯]

ষ্টিথ থম্পসনের সংজ্ঞাটিকে ব্যাখ্যা করলে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায়:

১। টাইপ বলতে শুধু সেই কাহিনীকেই বোঝা যাবে—যা পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সে-কাহিনীর একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা অবশ্যই থাকবে।

২। এ-কাহিনীটি যে সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা নিয়ে বেঁচে আছে—তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তক্ষুণি যখন দেখা যাবে যে কাহিনীটির অর্থ বা ব্যাখ্যা বুঝতে হলে, অন্য কোনও কাহিনীর উপর নির্ভর করতে হয় না।

৩। এই কাহিনীটি হয়তো লোকমুখে আর একটি কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এ-ভাবে আর একটি কাহিনীর সঙ্গে মিশ্রিত হলেও যদি অন্যত্র কাহিনীটি স্বাধীন ভাবে আপন সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকে, তবে বলতেই হবে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একটি বাস্তব সত্য।

[৩৯] A type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale. It may indeed happen to be told with another tale, but the fact that it may appear alone attests its independence,. It may consist of only one motif or of many.

Thompson, Stith. The Folktale, Holt, Rinehart and Winston, Newyork, পৃঃ ৪১৫

৪। এই কাহিনীটি—যাকে টাইপ বলে অভিহিত করা হবে, তাতে এক বা একাধিক মটিফ থাকতে পারে।

মটিফের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে থম্পসন বলেন,

"মটিফ হল কাহিনীর ক্ষুদ্রতম উপাদান—ঐতিহ্যের মধ্যে যার বেঁচে থাকবার মত ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতা অর্জন করতে হলে উপাদানটির মধ্যে একটি অসাধারণ এবং আকর্ষণীয় কিছু থাকতে হবে। সব মটিফই তিনটি শ্রেণীতে পড়ে। প্রথম হল, কাহিনীর নায়ক-নায়িকা, যেমন দেবতা, অথবা অসাধারণ প্রাণী, বা অত্যাশ্চর্য জীব,—যেমন ডাইনী, রাক্ষস-খোক্কস, বা পরী, অথবা এমন কি প্রথাসিদ্ধ মানব চরিত্র যেমন আদুরে কনিষ্ঠ সন্তান বা নিষ্ঠুর বিমাতা। দ্বিতীয় দফায় পাওয়া যায় ঘটনা-প্রবাহের পশ্চাৎপটে অবস্থিত কতকগুলো বিষয়, যেমন, মন্ত্রপূত বস্তু, অদ্ভুত বিশ্বাস ও এই ধরনের অন্যান্য ব্যাপার। তৃতীয় দফায় পড়ে একক বৈশিষ্ট্যময় ঘটনা—আর এগুলোই সর্বাধিক সংখ্যক মটিফকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর কাহিনীই স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে আর সে-কারণেই এগুলো সত্যিকার টাইপ কাহিনীর পরিচয়কেও তুলে ধরে। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত কাহিনীর সর্বাধিক সংখ্যক কাহিনী মাত্র একটি মটিফকেই অন্তর্ভুক্ত করে।"[৪০]

[৪০] A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it. Most motifs fall into three classes. First are the actors in a tale—gods, or unusual animals, or marvellous creatures like witches, ogres, or fairies, or even conventionalised human characters like the favourite youngest child or the cruel step-mother. Second come certain items in the background of the action—magic objects, unusual customs, strange beliefs, and the like. In the third place there are single incidents—and these comprise the great majority of motifs. It is this last class that can have an independent existence and that may therefore serve as true tale-types. By far the largest number of traditional types consist of these single motifs.

১২৮ প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১৫-৪১৬

মটিফ সর্বদাই কাহিনীর ক্ষুদ্রতম অংশ হলেও কাহিনীর সব ক্ষুদ্রতম অংশই মটিফ নয়। কাহিনীর অনেক অংশই কথকের হাতে বা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু যে-সব ক্ষুদ্রতম অংশ কথকের হাতে কিংবা কালের প্রভাবে পরিবর্তিত না হয়ে টিঁকে থাকে, শুধু তাকেই মটিফ বলা যায়। কাহিনীকে মটিফে অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম উপাদানে বিভক্ত করার এই নীতিকে অনুতত্ত্ব (Theory of Atomism) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

নীচে একটি টাইপ কাহিনী উদ্ধৃত হল:

বাড়িত্ সাগাই আইল্ছে। সাগাইক্ দেখিয়া গিরস্থের বৌ মনে মনে এলা কয়, "সাগাইক্ এলা কি দেঁও?" ভাইব্তে ভাইব্তে বৌকোনার মাথাত্ একেনা বুদ্ধি আইল্। বৌ তখন সাগাইক্ কয়, "আইল্ছেন ভালয় হইছে, তা বইসো ক্যানে। ওমরা বা কুত্তি গ্যাইছে তাঁক কাঁয় জানে। বাড়িত যদি এলা পান থাকিল্ হয়, তা হইলে তো চুন ধার করি আন্নু হায়, তার নাই ফির গুয়া।" সাগাই কথা শুনিয়া বুঝিল্ যে হেটে-কোনো বসিয়া আর কোন লাভ নাই।[৪১]

চল্তি বাংলায় এর অনুবাদ করলে এ-রকম দাঁড়ায়:

বাড়ীতে আত্মীয় এসেছে। আত্মীয়কে দেখে গৃহস্থের বৌ মনে মনে ভাবে, "আত্মীয়কে এখন কি দিয়ে অভ্যর্থনা করি?" ভাবতে ভাবতে বৌটির মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বৌটি তখন আত্মীয়ের উদ্দেশ্যে বলে, "এসেছেন ভালই হয়েছে, তা বসুন না কেন? উনি যে কোথায় গেছেন, তাও জানি না। বাড়ীতে যদি পান থাকতো, তবে চুন না হয় ধার করেই আনতাম, কিন্তু এদিকে আবার সুপারিও নেই দেখছি।" আত্মীয় তখন বুঝলো যে এখানে বসে আর কিছু লাভ হবে না।

[৪১] কাহিনীটি যে-ভাবে বর্তমান গ্রন্থকার ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছে, ঠিক সেভাবেই নিলফামারী মহকুমার (রংপুর) আঞ্চলিক ভাষায় তা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

এ-কাহিনীটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। অন্য কোনও কাহিনীর সঙ্গে এর মিশে যাবার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেই এ কাহিনী যুগে যুগে হস্তান্তরিত হয়েছে। পৃথিবীর সব দেশে এ-ধরনের কাহিনীই বেশি। বর্তমান কাহিনীটি আর্নে-থম্পসন টাইপ সূচীতে অনির্ধারিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (টাইপ ২৪১১)[৪২]

কিন্তু রূপকাহিনী বা জটিল কাহিনীর ক্ষেত্রে একটি কাহিনী আর একটি কাহিনীর সঙ্গে মিশে যেতে পারে। তখন উভয় কাহিনীকে আলাদা করে, তবেই টাইপ নির্ণয় করতে হয়। আমাদের দেশে লম্বা কাহিনীতে এর পরিচয় আছে। নিম্নে ষ্টিথ থম্পসন কর্তৃক আলোচিত একটি জটিল রূপকাহিনীর পরিচয় দেওয়া হল। কাহিনীটিতে দুটি কাহিনী একত্রিত হয়ে মিশে আছে। এর একটির নাম 'দুই ভাই' (টাইপ ৩০৩) ও অন্যটির নাম 'ড্রাগন হত্যাকারী' (টাইপ ৩০০)। ষ্টিথ থম্পসনের মতে, "দুই ভাই কাহিনীটি ড্রাগন হত্যাকারীর কাহিনীটির প্রায় সবটুকুই নিজের অবয়বের নিয়মিত অংশ হিসেবে আত্মসাৎ করেছে; কাজেই কাহিনী দুটির পারস্পরিক সম্পর্কের নিখুঁত চিত্র পেতে হলে উভয় কাহিনীর পঠন-পাঠন একই সঙ্গে হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া উভয় কাহিনী যখন একত্রে মিশে থাকে এবং যখন আলাদাভাবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে—তার ইতিহাস জানতে হলেও কাহিনী দুটির বিবেচনা একই সঙ্গে হওয়া দরকার।"[৪৩]

র‍্যাঙ্ক এ-দুটি কাহিনীর একটি সার্থক আলোচনা করেছেন। তিনি 'দুই ভাই' কাহিনীটির ৭৭০টি এবং 'ড্রাগন হত্যাকারী'র ৩৬৮টি পাঠান্তর

[৪২] Antti Aarne and Stith Thompson. The Types of the Folktale, হেলসিংকী, ২য় মুদ্রণ, ১৯৬৪, পৃঃ ৫৩৯

[৪৩] The two Brothers, as a regular part of its construction, contains almost the whole of the Dragon Slayer, so that it is necessary to study the two tales together if one is to secure an accurate picture of thier mutual relationships, and of the history of the two stories, both when they are merged together and when they exist separately.
Stith Thompson, The Folktale, পৃঃ ২৪

পেয়েছিলেন। র‍্যাঙ্কের বিশ্লেষণ থেকে এ-কথাও জানা যায় যে 'দুই ভাই' কাহিনীর যত ভাষ্য পাওয়া গেছে, তার প্রায় সবগুলোতেই ড্রাগন হত্যাকারীর কাহিনীটিও পাওয়া যায়। র‍্যাঙ্কের আলোচনার পরেও দুটি কাহিনীর একশতেরও বেশী পাঠান্তর সংগৃহীত হয়েছে। শুধু 'ড্রাগন হত্যাকারী' কাহিনীটির এ-পর্যন্ত ১১০০ পাঠান্তর পাওয়া গেছে। থম্পসন বলেন যে কাহিনীটির আরও নতুন নতুন পাঠান্তর এখনও সংগৃহীত হচ্ছে।

থম্পসন প্রথমে 'ড্রাগন হত্যাকারী'র কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন। র‍্যাঙ্ক কাহিনীটির বিচার-বিশ্লেষণ করে এমন একটি কাহিনী নির্মাণ করেন, যার মধ্যে কাহিনীটির সকল উপাদান বর্তমান। কাহিনীটির এক হাজারেরও বেশি পাঠান্তর বিদ্যমান থাকলেও, সেসব কাহিনী র‍্যাঙ্কের পুনর্গঠিত কাহিনীটি থেকেই উৎসারিত হয়েছে।

র‍্যাঙ্কের পুনর্গঠিত কাহিনীটি নিম্নরূপঃ

একটি গরীব দম্পতির দুজন সন্তান ছিল, এর একজন পুত্র আর একজন কন্যা। দম্পতির উভয়ে যখন মারা যায়, তখন তারা শুধু একটি ছোট বাড়ি ও তিনটি ভেড়া রেখে যায়। মেয়েটি পায় বাড়িটা, আর ছেলেটি পায় ভেড়াগুলো। ভেড়াগুলোর পরিবর্তে সে তিনটি অদ্ভুত কুকুর লাভ করে এবং সেই তিনটি কুকুর নিয়েই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় কোন এক বুড়ো (কখনও বুড়ি)-র উপকার করার জন্য সে তার কাছে একটি মন্ত্রপূত তরবারি বা মন্ত্রপূত একটি লাঠি পায়। এটি দিয়ে যাকে আঘাত করা যাবে সেই মারা যাবে।

চলতে চলতে সে এক রাজার দেশে উপস্থিত হয়। সে দেশে সব কিছুই কালো কাপড়ে ঢাকা। একটি সরাইখানায় গিয়ে সে এই শোক প্রকাশের কারণ জানতে পারে। সে জানতে পারে যে নিকটবর্তী এক পাহাড়ে একটি সাতমাথা-বিশিষ্ট ড্রাগন বাস করে। সে নির্দিষ্ট সময়ান্তে একজন কুমারী মেয়েকে ধরে নিয়ে যায়। যদি তাকে তা না দেওয়া হয়—তবে সে গোটা দেশকে ধ্বংস করে দেবে বলে ভয় দেখায়। কাজেই রাজ্যের লোকেরা নির্দিষ্ট সময়ান্তে একজন কুমারীকে দিতে রাজি হয়। নায়ক যখন রাজ্যে উপস্থিত হয়, তখন কুমারী রাজকন্যাকে দেওয়ার পালা

চলেছে। রাজা ঘোষণা করেছে যে যদি তার কন্যাকে কেউ বাঁচাতে পারে, তবে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব তাকে দেওয়া হবে।

নায়ক তার কুকুরগুলো নিয়ে ড্রাগন যেখানে বাস করে, সেই স্থানে উপস্থিত হয়। এদিকে রাজার কোচোয়ান রাজকন্যাকে নিয়ে সেই স্থানেই রাজকন্যাকে ড্রাগনের হাতে তুলে দেবার জন্য আসে। নায়ক রাজকন্যাকে আশ্বাস দেয় যে সে তাকে বাঁচাবে। ড্রাগন বিকট চীৎকার করে উপস্থিত হলে নায়ক বীরের মত তাকে আক্রমণ করে ও তার মন্ত্রপূত তরবারির সাহায্যে ড্রাগনের সাতটি মাথাই কেটে ফেলে। এ-কাজে নায়কের তিনটি কুকুরও তাকে সাহায্য করে। নায়ক ড্রাগনের জিভগুলো কেটে পকেটস্থ করে। কৃতজ্ঞ রাজকন্যা নায়ককে তার সঙ্গে যেতে বলে এবং রাজার প্রতিশ্রুত পুরস্কার গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায়। নায়ক কিন্তু আরও কিছু অভিযাত্রায় (Adventure) অংশ গ্রহণের পর নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসবে বলে জানায় রাজকন্যাকে। নায়ক রাজকন্যাকে ইতিমধ্যে এসব ব্যাপারে কাউকে কিছু না বলে চুপ করে থাকার জন্য অনুরোধ করে। এরপরে সে নতুন অভিযাত্রার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

এদিকে আর একটি মজার কাণ্ড ঘটে। রাজার কোচোয়ান রাজকন্যাকে হত্যা করবার ভয় দেখিয়ে তাকে বলে যে সে যেন রাজাকে একথা জানায় যে কোচোয়ানই ড্রাগনকে হত্যা করেছে। রাজকন্যাও বাধ্য হয়ে প্রতিজ্ঞা করে। কোচোয়ান তার বীরত্বের প্রমাণস্বরূপ ড্রাগনের মাথাগুলো সঙ্গে নিয়ে যায়। রাজাকে ড্রাগনের মাথা দেখিয়ে রাজার কাছে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দাবি করে। রাজা মহাখুশি হয়ে বিয়ের দিন ধার্য করে। রাজকন্যা অবশ্য কৌশলে বিয়ের তারিখ এমন ভাবে স্থগিত রাখে যাতে প্রকৃত নায়ক নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ান্তেও যখন প্রকৃত উদ্ধারকারী ফিরে এলো না, তখন বিয়ের তারিখ নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

বিয়ের দিনটিতেই প্রকৃত নায়ক এসে উপস্থিত হয়। এবার সে দেখতে পেলো সমগ্র রাজ্য লাল রঙে ঝলমল করছে। সরাইখানায় গিয়ে সে জানতে পারলো—আজ রাজকন্যার বিয়ে। সে তখন তার

কুকুরের গলায় একটি ঝুড়ি ও একটি কাগজে তার সংবাদ লিখে সেগুলো রাজকন্যার কাছে পাঠায়। রাজকন্যা কুকুরগুলোকে চিনতে পারে। এবং নায়কের উপদেশমত কাজ করে। রাজকন্যা (কোনও কোনও কাহিনীতে রাজা নিজেই) তাকে বিয়েতে নেমন্তন্ন করে। নায়ক তখন রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়। সেখানে উপস্থিত হয়েই সে ঘোষণা করে যে সেই ড্রাগন হত্যাকারী এবং সে একথাও জানায় যে ড্রাগনের যে মাথাগুলো এখানে আছে—তার ভিতরে জিহ্বা আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হোক। মাথাগুলো আনা হল—এবং পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তাতে একটিও জিহ্বা নেই। তখন নায়ক তার পকেট থেকে জিহ্বা বের করে যে মাথায় যে-জিহ্বাটি লাগে, তা লাগিয়ে দিলো। রাজা এবং উপস্থিত সবাই তখন তাকেই প্রকৃত ড্রাগন হত্যাকারী বলে রায় দিতে বাধ্য হয়। রাজকন্যার সঙ্গে নায়কের বিয়েও হয়ে যায়। মিথ্যেবাদী কোচোয়ানকে দেওয়া হয় শাস্তি।

এই 'ড্রাগন হত্যাকারী'র কাহিনীটির সঙ্গে সম্পর্কিত 'দুই ভাই' কাহিনীটির অনেক ঘটনা 'ড্রাগন হত্যাকারী'র কাহিনীতে বর্তমান। যেমন, ড্রাগন হত্যা, মিথ্যেবাদী নায়ক, প্রমাণস্বরূপ ড্রাগনের জিহ্বা আনয়ন এবং শেষপর্যন্ত রাজকন্যার সঙ্গে প্রকৃত নায়কের বিবাহ। এ-কাহিনীটির ৮০০ শত পাঠান্তর পাওয়া গেছে। এর মাত্র কয়েকটি কাহিনীতে ড্রাগনের সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ দেখা যায় না।

এই কাহিনীটি নিম্নরূপ :

একজন সন্তান-সন্ততিহীন জেলে একদিন মাছেদের রাজাকে ধরে ফেলে। মাছের রাজা জেলেকে তাকে মুক্তি দেবার জন্য অনুরোধ করে। বিনিময়ে মাছের রাজা তাকে অন্যান্য মাছ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় বা যেখানে মাছ পাওয়া যায়—সেস্থানের কথা তাকে জানায়। মাছের রাজা দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে পূর্বের মত মুক্তির প্রার্থনা জানালে জেলে তাকে মুক্ত করে দেয়। কিন্তু তৃতীয়বার ধরা পড়লে মাছের রাজা জেলেকে বলে সে যেন তাকে কেটে কতকগুলো খণ্ডে বিভক্ত করে। এবং একটি করে খণ্ড সে যেন তার স্ত্রী, তার খচ্চর ও কুকুরকে খাওয়ায় আর বাকীটা যেন সে বাগানে একটি গাছের নীচে পুঁতে

ফেলে। এর পরে জেলের স্ত্রীর যমজ পুত্র হয়, জেলের খচ্চর ও কুকুরও একইভাবে যমজ বাচ্চা লাভ করে। বাগানে একই সঙ্গে দুটি গাছ ও দুটি তরবারিও মাটি থেকে উত্থিত হয়। যমজ ভাই দুটি দেখতে একই রকম—খচ্চর ও কুকুরের যমজ ছানারাও ঠিক তাই।

যমজ ভাই দুটি বড় হলে প্রথম ভাইটি অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। যদি তার কোনও বিপদ দেখা দেয়, তাহলে বাগানের দুটি গাছের একটি শুকিয়ে যাবে। তখন ছোট ভাইটি তাকে উদ্ধার করার জন্য ছুটে যাবে। যাই হোক, নায়ক তার তরবারি, ঘোড়া ও কুকুরটি নিয়ে এক রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়।

[এখান থেকেই কাহিনীটি উপরে বর্ণিত ড্রাগন হত্যাকারীর কাহিনীকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেছে]

তবে রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ের পর কাহিনী পুনরায় অগ্রসর হয়েছে নিম্নোক্তভাবে :

বিয়ের রাতে নায়ক একটি বনে (কখনও পাহাড়ে) আগুন দেখতে পেয়ে রাজকন্যাকে তার কারণ জিজ্ঞেস করে। উত্তরে রাজকন্যা বলে যে ঐ আগুনের কাছাকাছি যারা গেছে, তারা আর কখনো ফিরে আসে নি। রাজকন্যা নায়ককে সেখানে যেতে মানা করে। কিন্তু নায়ক অভিযাত্রায় নেশায় প্রলুব্ধ হয় এবং তার তরবারি, ঘোড়া ও কুকুর নিয়ে সেই আগুনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে গিয়ে সে একটি বাড়িতে একটি বুড়িকে দেখতে পায়। এই বুড়ি ছিল একজন ডাইনী। ডাইনী এমন ভান করে যেন সে নায়কের কুকুরকে দেখে ভয় পেয়েছে। বুড়ি তার একটি চুল নিয়ে নায়ককে বলে চুলটি কুকুরের গায়ে রাখলে কুকুরটি শান্ত হয়ে থাকবে। নায়ক তার আদেশ পালন করতে যায়। বুড়ির চুলটি একটি শৃংখলে রূপান্তরিত হয়। বুড়ি তখন তাকে একটি লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং নায়ককে পাথরে পরিণত করে।

এদিকে নায়কের বাড়িতে বাগানের একটি গাছ শুকিয়ে যেতে থাকে। ছোট ভাই বুঝতে পারে হয় তার ভাই মারা গেছে, নয় কোন বিপদে

পড়েছে। সে তখন তার তরবারি, ঘোড়া আর কুকুরটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বহু দিন এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করার পর সে সেই রাজ্যের সন্ধান পায়—যেখানে তার ভাই ড্রাগন হত্যা করে রাজকন্যাকে বিয়ে করবার পর রাজ্যের রাজা হয়। সে যে সরাইখানায় উপস্থিত হয়, সেই সরাইয়ের মালিক ও রাজকন্যা উভয়েই তাকে তার ভাই বলে ভুল করে। কারণ সে দেখতে ছিল ভাইয়েরই মত। সে যখন বুঝলো যে সবাই তাকে তার ভাইয়ের মতই মনে করছে, তখন সে এ-ভুলটি ভাঙাতে রাজী হল না। তাতে বরং সে তার ভাইয়ের ভাগ্যে কি ঘটেছে—তার সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবে।

রাতে যখন সে তার ভাবীর সঙ্গে একই বিছানায় শুতে বাধ্য হত, তখন সে উভয়ের মধ্যে তার তরবারিটির খাপ খুলে রেখে দিতো। সেখান থেকে সে-ও সেই আগুন দেখতে পেয়ে রাজকন্যাকে তার কারণ জিজ্ঞেস করে। রাজকন্যা অবাক হল, কারণ ইতিপূর্বে সে এ-প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। তবুও সে ছোট ভাইকেই তার প্রকৃত স্বামী ধরে নিয়ে তাকে পুনর্বার সেখানে যেতে মানা করে। যাই হোক, সে রাজকন্যার কথায় কর্ণপাত না করে, সেই আগুনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কেননা সে বুঝতে পারে, তার ভাই ঐ আগুনের কাছে গিয়েই বিপদে পড়েছে। বাড়িতে সেও সেই বুড়িকে দেখতে পায়। বুড়ি তাকে তার একটি চুল দিয়ে কুকুরকে শান্ত করতে বললে, সে তার আদেশ পালন না করে কুকুরটিকে বুড়ির উপর লেলিয়ে দেয়। বুড়ি তখন বাধ্য হয়ে যে-লাঠির সাহায্যে তার ভাইকে পাথরে পরিণত করেছিল, তা ছোট ভাইকে দিয়ে দেয়। ছোট ভাই লাঠি দিয়ে পাথরকে আঘাত করলে বড় ভাই যাদুমুগ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে জেগে ওঠে। বুড়িকে হত্যা করে উভয়ে শহরে ফিরে আসে।

এই-ই হল সংক্ষেপে দুই ভাইয়ের কাহিনী। উভয় কাহিনীর মধ্যে ড্রাগন হত্যার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান। ড্রাগন হত্যাকারীর কাহিনীতে নায়ক সঙ্গে নিয়েছিল একটি কুকুর, দুই ভাইয়ের কাহিনীর নায়কের সঙ্গে ছিল তিনটি কুকুর। বর্ণনার ক্ষেত্রে আরও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে, কিন্তু দুটি কাহিনীই যুগ যুগ ধরে আপন আপন

অস্তিত্ব রক্ষা করে, বিশ্বের দু-তিনটি মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বেঁচে আছে।

ষ্টিথ থম্পসন টাইপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, কখনো কখনো একটি কাহিনী আর একটি কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। কিন্তু যদি কাহিনীটি স্বতন্ত্র ভাবে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়, তাহলে তাকে টাইপ কাহিনী বলে আখ্যায়িত করতে হবে। 'ড্রাগন হত্যাকারী'র কাহিনীটি সর্বদাই 'দুই ভাই' কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হলেও, কাহিনীটির স্বতন্ত্র ভাষ্য পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য, উভয় কাহিনীর যত পাঠান্তর পাওয়া গেছে, তা প্রায় সমান।

'দুই ভাই' কাহিনীটির সঙ্গে আরও অন্যান্য কাহিনীর মিশ্রণ ঘটেছে। 'মন্ত্রপূত পক্ষী-হৃৎপিণ্ড' (Magic Bird-Heart) কাহিনীটিও কখনো কখনো 'দুই ভাই' কাহিনীটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ষ্টিথ থম্পসনের মতে 'দুই ভাই' কাহিনীতে মন্ত্রপূত বস্তু থাকার ফলে উভয় কাহিনীর সংমিশ্রণ কোনো আশ্চর্য ব্যাপার নয়। যাই হোক, মন্ত্রপূত পক্ষী-হৃৎপিণ্ডের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল:

একজন গরীব লোক একটি মন্ত্রপূত পাখি পায়। পাখিটি সোনার ডিম পাড়ে। লোকাট ডিম বেচে বেশ বড়লোক হয়। একবার সে সফর করতে বেরিয়ে গেলে, পাখিটি বাড়িতে তার স্ত্রীর কাছে রেখে যায়। লোকটির স্ত্রী তার প্রেমিকের চাপে পড়ে পাখিটি তাকে কেটে খাওয়াতে মনস্থ করে। পাখিটির একটি অদ্ভুত গুণ ছিল এই যে যে-ব্যক্তি পাখিটির মাথা খাবে, সে হবে রাজা আর পাখিটির হৃৎপিণ্ড যে খাবে, সে রোজ ঘুম থেকে উঠে বালিশের নীচে পাবে সোনা। কিন্তু বাড়ির দুই ছেলে আকস্মিকভাবে একজন পাখির মাথা ও অন্যজন হৃৎপিণ্ডটি খেয়ে ফেলে। অবশ্য এদের দুইভায়ের কেউ জানতো না যে পাখিটি আসলে ছিল মন্ত্রপূত। এখান থেকে শুরু করে কাহিনীটিতে দেখা যায় যে মন্ত্রপূত বস্তুগুলো হারিয়ে যায় এবং পরে তা উদ্ধার করা হয়। অবশ্য কাহিনী অগ্রসর হতেই থাকে। পরে দেখা যায় যে দুই ভাই দুদিকে যায়। এর পরের ঘটনা সম্পূর্ণভাবে 'দুই ভাই' কাহিনীর মত। মন্ত্রপূত পক্ষী-হৃৎপিণ্ড কাহিনীটির টাইপ নং ৫৬৭।

দুই ভাই কাহিনীটির সাথে আরও একটি কাহিনীকে মিশ্রিত হতে দেখা যায়। এটি হল পূর্ব ইউরোপের বহুল প্রচলিত 'তিন ভাইয়ে'র কাহিনী। এ-কাহিনীটি 'দুই ভাই' কাহিনীর মত মাছ্ ধরার ঘটনা দিয়ে শুরু হয়েছে। তিন ভাইয়ের মধ্যে দুভাই অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। এর পরের টনা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন লোকদের কাহিনীর (টাইপ ৬৫০)[৪৪] মত। সামান্য পরিবর্তনসহ কাহিনীটি শেষ পর্যন্ত 'দুই ভাই' কাহিনীর অনুরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য কাহিনীটি স্বভাব অনুযায়ী আরও অনেক ঘটনাকে আত্মসাৎ করে। যেমন প্রথম দু ভাই একজন ডাইনীর হাতে পড়ে এবং খোলা তরবারি বিছানার মাঝখানে রেখে ঘুমাবার ঘটনাটিরও পুনরাবৃত্তি ঘটে।

ষ্টিথ থম্পসনের মতে 'দুই ভাই' কাহিনীর সমস্ত পাঠান্তরের অন্তত শতকরা কুড়ি ভাগ কাহিনীতে 'ঈর্ষাণ্বিত ভাইয়ে'র মটিফটি বর্তমান। এসব পাঠান্তরে দেখা যায় যে ছোটভাই যখন বড়ভাইকে মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়, তখন বড়ভাই জানতে পারে যে ছোটভাই তার স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে। ক্রোধান্ধ ঈর্ষান্বিত বড়ভাই ছোটভাইকে হত্যা করে। পরে স্ত্রীর কাছে সব বিবরণ শুনে বড়ভাই ছোটভাইকে জীবন দান করে।[৪৫]

'দুই ভাইয়ে'র কাহিনীর সঙ্গে ড্রাগন হত্যাকারীর কাহিনী ছাড়াও যে-সমস্ত কাহিনী মিশ্রিত হয়েছে, সেগুলো আলাদাভাবেও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। কাজেই এগুলোও টাইপ কাহিনী। যাই হোক, কাহিনী-গুলোর আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যে জটিল রূপকাহিনী অনেক সময় অন্যান্য কাহিনীকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে।

কাহিনীকে বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রেণীবদ্ধকরণের জন্য একদিকে যেমন কাহিনীর টাইপ নির্ণয় করা প্রয়োজন, তেমনি টাইপ সূচীও গড়ে তোলা

[৪৪] The Types of the Folktale, পৃঃ ২২৫

[৪৫] The Folktale, ২৪-২৮

দরকার। থম্পসন বলেন, টাইপ-সূচী প্রমাণ করে যে একই টাইপের বিভিন্ন পাঠান্তরের মধ্যে আত্মীয় সম্পর্ক বর্তমান। যাই হোক, কাহিনীর টাইপ অনুযায়ী টাইপ-সূচী তৈরী করার প্রয়োজন প্রথমে কার্ল ক্রোন অনুভব করেন। শেষ পর্যন্ত, এ-কাজের ভার এন্টি আর্নের উপর অর্পিত হয়; এই কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে আর্নে ক্রোন ছাড়াও হেলসিংকীর অস্কার হাক্‌ম্যান, কোপেনহেগেনের অ্যাক্সেল ওলরিক, বার্লিনের য়োহানেস্ বোল্ট, লাণ্ডের (সুইডেন) সি. ডব্লু. ভন সিডোর সক্রিয় সাহায্য ও পরামর্শ লাভ করেন। সূচীটি প্রস্তুত করতে গিয়ে সূচীর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আর্নের বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হল:

১। লোকসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় বিশেষত লোক-কাহিনীর বিশ্লেষণে তথ্যাদির সংগ্রহ সর্বদা একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। এই সমস্যাই Folklore Fellows-কে লোককাহিনীর একটি তালিকা প্রস্তুত করবার কাজে উদ্বুদ্ধ করে। ফিনল্যাণ্ডের লোককাহিনীর যে-বিপুল সংগ্রহ ফিনিশ লিটারেরী সোস্যাইটির তত্ত্বাবধানে ছিল, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবার ভারও আর্নের উপর দেওয়া হয়। ভাষার পার্থক্যের জন্য এই কাহিনীগুলো এতদিন সকলের পাঠযোগ্য ছিল না। আর্নের তালিকার পরই তা সকলের ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠলো।

২। আর্নে ফিনল্যাণ্ডের কাহিনীর প্রথম তালিকাটি প্রস্তুত করতে বসে কতকগুলো প্রাথমিক সমস্যার সম্মুখীন হন। লোককাহিনীর মধ্যে বিচিত্র ধরনের কাহিনীর কোনো অভাব নেই। কাহিনীর টাইপ নির্ণয় করে তাকে শ্রেণীবদ্ধকরণের কোনো পদ্ধতি তাঁর জানাও ছিল না। কাজেই প্রথমে তাঁকে টাইপ অনুযায়ী একটি তালিকা প্রণয়ন করতে হয়।

৩। সমগ্র বিশ্বেই লোককাহিনীকে শ্রেণীবদ্ধকরণের একটি সাধারণ পদ্ধতির প্রয়োজন সবাই অনুভব করতে থাকেন। শ্রেণীবদ্ধকরণের এই পদ্ধতি যে বিশেষভাবে তাৎপর্যময় সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা এর ফলে পৃথিবীর সব দেশই সংগৃহীত কাহিনীর বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ করতে পারবে। সংগ্রাহকের পক্ষেও কাহিনীর শ্রেণীবদ্ধকরণ করতে আর মোটে অসুবিধে হবে না। গবেষককেও কাহিনী সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য

আর হাতড়ে বেড়াতে হবে না। যে-বিশেষ কাহিনীটি তাঁর আলোচনায় অবশ্যম্ভাবী, তা তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে যেতে পারেন। অর্থাৎ এককথায় এই টাইপ-সূচীর ফলেই লোককাহিনীর সংগ্রহ থেকে শুরু করে গবেষণা পর্যন্ত একটি সহজসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হয়।[৪৬]

আর্ণে তাঁর সূচীকে কখনও একটি সম্পূর্ণ সূচী বলে মনে করেননি। আর্ণে হেলসিংকীতে হস্তলিখিত কাহিনীর বিপুল সংকলন ছাড়াও, কোপেন-হেগেনের গ্রুন্দৎভিগ্‌ সংগৃহীত কাহিনী ও গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের 'হাউসহোল্ড টেল্‌স্‌' ইত্যাদি ব্যবহার করে তাঁর সূচীর ভিত্তি রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো কাহিনী তাঁকে বাদ দিতে হয়। কারণ তাঁর মনে হয় যে এর অনেকগুলোই সত্যিকার লোককাহিনী নয়। আবার অন্যান্য উৎস থেকেও তিনি কিছু কাহিনী এর সঙ্গে যুক্ত করেন। তিনি এ-কথাও উপলব্ধি করেন যে তাঁর সূচী একটি সাময়িক প্রয়োজন মেটাতেই সক্ষম। অবশ্য ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের সংগৃহীত কাহিনীর সূচী হিসেবে আর্ণের সূচীটি মোটামুটি সম্পূর্ণ বলে দাবি করতে পারতো। তাঁর সূচী যে ভবিষ্যতে সম্প্রসারিত হবে, এ-বিষয়ে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। কেননা তাঁর সূচীতে মাত্র ৫৪০টি টাইপে কাহিনী শ্রেণীভুক্ত হলেও, এতে ১৯৪০টি টাইপকে অন্তর্ভুক্ত করবার ব্যবস্থা ছিল।

আর্ণের এই সূচীর নাম Verzeichnis der Marchentypen. স্টিথ থম্পসনের মতে এই সূচীটিতেই প্রথমবারের মত টাইপ ও মটিফের সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। এ-প্রসঙ্গে আর্ণের বক্তব্য সংক্ষেপে বর্ণিত হল :

১। যতদূর সম্ভব এক একটি সম্পূর্ণ কাহিনীকে প্রতিটি টাইপের ভিত্তি বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে কাহিনীর পৃথক পৃথক ঘটনা বা মটিফের আর একটি শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। কিন্তু কাহিনীকে এভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করে মটিফের সন্ধান করলে বর্তমান অবস্থায় টাইপ-সূচীটির ব্যবহার সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য।

২। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে টাইপ-সূচী প্রস্তুত করতে যে পদ্ধতি

[৪৬]প্রাগুপ্ত, পৃ: ৪১৬

গ্রহণ করা হয়েছে, তার থেকে সরে না এসে উপায় নেই। দুষ্ট রাক্ষস-খোক্কসের কাহিনী এত বিচিত্রভাবে লোকে পরিবেশন করে থাকে যে তাতে নানা ঘটনা আশ্রয় লাভ করে। কাজেই কাহিনীর অভ্যন্তরে অবস্থিত এসব ঘটনার (Episode) তালিকা ভিন্ন ক্রমিক সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। জীব-জানোয়ারের কাহিনী বা হাস্যরসাত্মক কাহিনীর ক্ষেত্রেও ঐ একই পন্থা অনুসৃত হতে পারে।

৩। এসব কারণেই কিছু কিছু অসঙ্গতি দেখা দেয় (অর্থাৎ একই সঙ্গে টাইপ ও মটিফের শ্রেণীবদ্ধকরণ)। কিন্তু বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করলে কাহিনী শ্রেণীবদ্ধকরণের যে-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে—এটি তার পরিপন্থী হতে পারে না। আর না হলে টাইপকে ভিত্তি করে যে শ্রেণী-বিভাগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তা পণ্ডিত গবেষকদের কাছে খুবই সাধারণ বলে মনে হবে।

৪। তাছাড়া দীর্ঘ কাহিনীর অঙ্গীভূত আলাদা কাহিনী, আবার অন্যত্র স্বাধীনভাবেও অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। কাজেই এসব কাহিনীর জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করা দরকার।[৪৭]

আর্ণের বক্তব্য থেকে একথা বোঝা যাবে যে তিনি টাইপ সূচী প্রস্তুত করতে বসে মটিফের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এবং সেই সঙ্গে টাইপ ও মটিফের জন্য যে স্বতন্ত্র সূচী আবশ্যক একথাও তাঁর অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে। এ-প্রসঙ্গে স্টিথ থম্পসন বলেন যে আর্ণের সূচীটির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অর্ধেকেরও বেশী টাইপ একটি মাত্র মটিফে সম্পূর্ণ। কাজেই এ-ধরনের টাইপের শ্রেণীবদ্ধকরণ খুব কঠিন নয়। সবচেয়ে জটিল সমস্যা দেখা দেয় আড়াই শ' জটিল টাইপকে শ্রেণীবদ্ধকরণের সময়। এই জটিল কাহিনীর এক একটিতে বহুসংখ্যক মটিফ বিদ্যমান। এ-সব বহুসংখ্যক মটিফের মধ্যে কোন্‌টিকে শ্রেণীবদ্ধকরণের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব? এই সমস্যাটি আর্ণেকে ভাবিয়ে তোলে। কাহিনীর নায়ক-চরিত্র, কাহিনীর কোনো বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যময় বিষয়, যেমন, মন্ত্রপূত দ্রব্য অথবা কাহিনীর কেন্দ্রীয় ঘটনা, কোন্‌টিকে অধিকতর জরুরি বলে বিবেচনা

[৪৭]প্রাগুক্ত, ৪১৭

করা উচিত? আর্ণের টাইপ-সূচীতে এর সবগুলো পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়েছে। সূচী প্রস্তুতকালে বিশেষ বিশেষ কাহিনীমালা বিশেষ বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আর্ণেও সমস্যার সমাধানে উপরোক্ত পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছেন।

তিনি তাঁর সূচীর ভূমিকায় তাঁর অনুসৃত সাধারণ পদ্ধতিটির যে স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছিলেন, তাঁর অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল:

সামগ্রিকভাবে, শ্রেণীবদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে কাহিনীগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: জীব-জানোয়ারের কাহিনী, পুরোপুরি লোককাহিনী ও হাস্যরসাত্মক কাহিনী। জীব-জানোয়ারের কাহিনীর বেলায়, কাহিনীতে যে-যে জীব-জানোয়ার যে-যে ভূমিকা অবলম্বন করেছে, ঠিক সেইভাবে ক্ষুদ্রতর উপবর্গ নির্ণয় করে তার পার্থক্য দেখানো হয়েছে। আবার এসব প্রতিটি উপবর্গের যেসব কাহিনীতে একই জীব-জানোয়ারের উপস্থিতি বর্তমান, সেগুলোকে একইসঙ্গে স্থান দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ বন্য জীব-জানোয়ারের যে-সব কাহিনী লোককাহিনীর প্রিয় জীব চতুর খেঁকশিয়াল দিয়ে আরম্ভ হয়—সেই উপবর্গটির কথা বলা যায়। যখন একটি কাহিনীতে বিভিন্ন উপবর্গের জীব-জানোয়ার দেখা যায়, তখন কাহিনীতে কোন্‌ জাতীয় জীব-জানোয়ার প্রধান ভূমিকা পালন করছে, তা দেখার পরই কাহিনীটির স্থান নির্ণয়ের প্রশ্ন ওঠে। উদাহরণ হিসেবে 'খরগোসের চেয়েও ভীরু' কাহিনীটির কথা বলা যায়। এটিকে যেসব কাহিনীতে খেঁকশিয়াল আছে, তার সঙ্গে স্থান না দিয়ে, 'অন্যান্য বন্য জন্তু'র উপবিভাগে স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ এখানে খরগোশই কাহিনীতে প্রধান চরিত্র হিসেবে উপস্থিত। ঠিক একইভাবে কুকুর ও চড়ুই পাখি (টাইপ ২৪৮)র কাহিনীকে 'গৃহপালিত জীব-জানোয়ারে'র উপবিভাগে অন্তর্ভুক্ত না করে পাখিদের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

সবচেয়ে বড় উপবিভাগটি, সাধারণ লোককাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এটিকে যাদুসংক্রান্ত বা আশ্চর্য কাহিনী, ধর্মীয় কাহিনী, রোমান্স-ধর্মী কাহিনী ও দুষ্ট প্রকৃতির রাক্ষস-খোক্কসের কাহিনী ইত্যাদি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যাদুসংক্রান্ত কাহিনীতে সর্বদাই কিছু না কিছু

অতি-প্রাকৃতিক উপাদান দেখা যাবেই। এবং সাধারণভাবে ধর্মীয় কাহিনীর পক্ষেও তা সত্য। অন্যদিকে রোমান্স-ধর্মী কাহিনীগুলো সম্পূর্ণভাবে সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। শ্রেণীবদ্ধকরণের বেলায় রাক্ষস-খোক্কসের কাহিনীর সন্তোষজনক স্থান নির্ণয় করা মুশকিল হয়ে পড়ে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে হল অতিপ্রাকৃতের কাহিনী (Wonder-tales) এবং সে-কারণেই এগুলোকে অন্যান্য অতীন্দ্রিয় কাহিনীর সঙ্গে স্থান দেওয়া উচিত, কিন্তু যেহেতু অন্যদিকে চরিত্র ও মেজাজের দিক থেকে এগুলো হাস্যরসাত্মক কাহিনীর পর্যায়ে পড়ে, সেজন্যই এগুলোকে পুরোপুরি লোককাহিনীর শেষ উপবিভাগ হিসেবে হাস্যরসাত্মক কাহিনীর পরপরই স্থান দেওয়া হয়েছে। যাদুসংক্রান্ত কাহিনীর অনুবিভাগ নির্ণয়কালে, বিস্ময়কর উপাদানের উপস্থিতি ও অতীন্দ্রিয়ের ঘটনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ-ভাবেই এই অনুবিভাগগুলো স্পষ্ট রূপ পায়: অতীন্দ্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বী সংক্রান্ত অনুবিভাগ, এখানে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত রাক্ষস-খোক্কসের কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপবিভাগের কাহিনীর তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, অতীন্দ্রিয় স্বামী বা স্ত্রী সংক্রান্ত অনুবিভাগ, অতিপ্রাকৃতিক কর্মভার (Task) সংক্রান্ত অনুবিভাগ, অতিপ্রাকৃতিক সাহায্যকারী, অতিপ্রাকৃতিক বস্তু, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বা শক্তি ও শেষে আর একটি অনুবিভাগ সন্নিবেশিত করে অন্যান্য অতিপ্রাকৃতিক উপাদানের স্থান নির্ণয় করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব এ-সমস্ত উপবিভাগকে, বিষয়বস্তু অনুযায়ী পুনর্বার নতুন অনুবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। রোমান্সধর্মী ও ধর্মীয় কাহিনীর বেলাতেও একই নীতি অনুসৃত হয়েছে।

কখনো কখনো একই কাহিনীকে দুটো উপবিভাগে শ্রেণীভুক্ত করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন অতিপ্রাকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী বা সাহায্যকারীর সঙ্গে একটি মন্ত্রপূত বস্তুও দেখা দিতে পারে। এর মধ্যে কোন্‌টিকে কোন্ স্থান দেওয়া হবে, তা নির্ণীত হবে কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহের জন্য কোন্‌টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, তা হিসেব করে। তদুপরি ঐ ধরনের কাহিনীকে দ্বিতীয় স্থানে লঘুবন্ধনীর মধ্যেও স্থাপন করা হয়। এবং সেই সঙ্গে শ্রেণীবিভাগের কোন্ জায়গায় তার বিশেষ স্থান নির্দেশ করা হয়েছে—তা টীকাতে উল্লেখ করা হয়।

তৃতীয় উপবিভাগে অন্তর্ভুক্ত ঠাট্টা-রসিকতা ও ক্ষুদ্র বাস্তব কাহিনী-সমূহ (Schwanke) নিঃসন্দেহে কালক্রমে জীব-জানোয়ারের কাহিনী বা সাধারণ লোককাহিনীর চেয়ে আরও অধিক সংখ্যায় চিহ্নিত হবে। কারণ এসব হাস্যরসাত্মক কাহিনী অন্যান্য কাহিনীর চেয়ে খুব সহজে জনগণের মধ্যে উৎপত্তি লাভ করে। হাসি-ঠাট্টা এবং ক্ষুদ্র বাস্তব কাহিনী (Anecdotes)র উপবিভাগটিকে শ্রেণীবদ্ধকরণের বেলায় হাস্য-রসাত্মক কাহিনী পর্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ কাহিনীগুলো যে যে বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন কৃষি, পশুচারণ, মাছ-ধরা; শিকার, গৃহনির্মাণ, খাদ্য প্রস্তুতকরণ বা এ-ধরনের অন্যান্য ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে, 'বিবাহিত দম্পতি'র স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। এতে কখনো প্রথমে 'স্ত্রী' বা 'স্বামী'কে উপস্থিত করা হয়েছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীটি আরও নানা উপবিভাগে বিভক্ত, কারণ এতে চতুর লোক, শুভ ঘটনা, বোকা লোক এবং যাজকের কাহিনীর অনুবিভাগ নির্দেশিত হয়েছে। যাজকের কাহিনীতে, যাজক সাধারণত বোকা লোক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিশেষত গির্জার কর্মচারী (Sexton) তাকে সে-ভাবেই দেখে। যাজকসম্পর্কিত কাহিনীগুলো শ্রেণীবদ্ধকরণের সময় এ-ঘটনাটিকে মনে রাখা হয়েছিল। হাসি-ঠাট্টা, (Jokes)ও ক্ষুদ্র বাস্তব কাহিনী (Anecdotes)-র শেষ বিভাগটি গড়ে উঠেছে, 'মিথ্যে বলার কাহিনী'কে কেন্দ্র করে। এগুলোকে আবার শিকার, প্রকাণ্ড জন্তু-জানোয়ার বা বস্তুর কাহিনী ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হয়েছে।[৪৮]

আর্নের টাইপ-সূচী Verzeichnis der Marchentypen যখন প্রকাশিত হয় তখন তা কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। ফিনল্যাণ্ডে লোককাহিনীর সংগ্রহের মধ্যে যখন আর্নে তাঁর সূচী ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন, তখনই তাঁর সূচীর গুরুত্ব উপলব্ধ হয়। ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেনের কাহিনীর টাইপ নির্ণয় করে, আর্নের পদ্ধতিতে আর একটি সূচী প্রকাশ করেন অস্কার হাকম্যান। এর ফলেও আর্নের সূচী পরিচিতি লাভ করে। এই দুটি সূচীর পরও অনেক সূচী প্রকাশিত হয়। থম্পসন

[৪৮] প্রাগুক্ত, (থম্পসন কর্তৃক উদ্ধৃত) পৃঃ ৪১৮-৪১৯

বলেন যে প্রথম মহাযুদ্ধ সত্ত্বেও ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আর্নের মৃত্যুর আগেই এ-রকম আটটি সূচী প্রকাশিত হয়। এইসব সূচীতে ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেনের কাহিনী ছাড়াও এস্টোনিয়া, নরওয়ে, ল্যাপল্যাণ্ড, ফ্লাণ্ডার্স, বোহেমিয়া এবং লিভোনিয়ার কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে। যে-সমস্ত গবেষক এ-ধরনের সূচী প্রস্তুত করেছেন, তাঁরা নতুন নতুন টাইপ সংযোজনের প্রস্তাব করলেও আর্নের সূচীকে তাঁরা নিজেদের কাজের ভিত্তি হিসেবে সর্বদা ব্যবহার করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে টাইপ-সূচী প্রস্তুত করবার কাজে আর্নে যে প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন, তা স্পষ্ট হতে বাধ্য। কাহিনীর টাইপ নির্ণয় করে, তাকে শ্রেণীবদ্ধকরণের কাজ যে খুব সুসাধ্য ছিল না, আর্নের উপরোক্ত উক্তি থেকে তা বোঝা যাবে। কিভাবে প্রথম থেকে নানা বিপর্যয়, ভুলত্রুটি ও বিভ্রান্ত গবেষণাকে পরাজিত করে কাহিনীর টাইপ সন্ধান ও পরে টাইপ-সূচী প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছে, সে-ইতিহাসও বিস্ময়কর।

আর্নে থম্পসন টাইপ সূচী

১৯২৪ সালের দিকে আরও নতুন টাইপ সংগৃহীত হয় এবং আর্নের টাইপ-সূচী 'ভার্জিকনিসে'র পুনঃপরীক্ষা ও সংশোধন অপরিহার্য বলে মনে হতে থাকে। আর্নে নিজেও এ-ধরনের সংশোধনের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তার আগেই তিনি অকালমৃত্যু বরণ করলেন। এসময়ে অধ্যাপক কার্ল ক্রোন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক ষ্টিথ থম্পসনকে আর্নের সূচীটিকে সংশোধিত করে পরিবর্ধিত করার আহ্বান জানান। ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আর্নের সূচীটিকে সংশোধিত করে তাকে পরিবর্ধিত করবার কাজ সম্পন্ন করেন। ১৯২৮ সালে পরিবর্ধিত সূচীটি 'দি টাইপস্ অব দি ফোক্‌টেল' (The Types of the Folktale) নামে প্রকাশিত হয়। ১৯২৬-২৭ সালে ইউরোপে থাকার সময় থম্পসন ইউরোপের বহু গবেষক ও লোকতত্ত্ববিদ্‌দের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য লাভ করেন। কোপেন-

হেগেনে তিনি একইসঙ্গে ক্রোন ও বোল্টের মত বিশ্ববিশ্রুত লোকতত্ত্ব-বিদের সান্নিধ্য লাভ করেন। বলাবাহুল্য, তাঁর কাজের পরিকল্পনা সম্পর্কেও তিনি পরামর্শ লাভ করেন। প্যারিস থেকে আর্নল্ড ভ্যান গেনেপ, বেসেল্‌ থেকে এডুয়ার্ড হফ্‌ম্যান-ক্রেয়ার ও হ্যান্স বাক্‌টোল্ড-স্টবলি, ফ্রিবুর্গ থেকে জন মেইয়ার, হেইডেলবার্গ থেকে ইউজেন ফার্লে, ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে হ্যান্স নৌম্যান, গিসেন থেকে হুগো হেপডিং এবং লিডেন থেকে জান দ্য ভ্রিস্‌ তাঁকে আন্তরিক সাহায্য ও পরামর্শ দান করেন। থম্পসন তাঁর কাজ মোটামুটি প্যারিসে অবস্থানকালে শেষ করলেও, প্রকৃতপক্ষে কোপেনহেগেনে দু মাসকাল থাকার সময় তা পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করে। কেননা কোপেনহেগেনেই তিনি ডেনমার্কের লোককাহিনীর বিপুল সংগ্রহকে তাঁর কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। Dansk Folkmindesamling নামক লোকঐতিহ্যের সংরক্ষণাগারের তত্ত্বাবধায়ক হ্যান্স এলুবি লুংগে সর্বদা তাঁকে সাহায্য যুগিয়েছিলেন। এছাড়াও কোপেনহেগেনের ফার্দিনান্দ ওর্ট ও আর্থার ক্রিস্টেনসেন, লাণ্ডের সি. ডব্লু. ভন সিডো এবং অসলোর আর. টি. ক্রিশ্চিয়ানসেন তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। বলাবাহুল্য, তাঁর সংশোধন, পরিমার্জনা ও পরিবর্ধনের কাজে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়েছিলেন অধ্যাপক কার্ল ক্রোনের নিকট থেকে। এককথায় ইউরোপের বহু দেশের লোকতত্ত্ববিদের অকৃত্রিম সাহায্য ও পরামর্শ ছাড়া আর্নের সূচীটি নিখুঁত হতে পারতো না। থম্পসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোককাহিনীর সমগ্র ঐতিহ্যের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। ফলে তাঁর মত ব্যক্তির পক্ষেই আর্নের সূচীটির সংশোধন করা সম্ভব হয়েছিল। যাই হোক্‌, আর্নের সংশোধিত এই সূচীই সমগ্র বিশ্বে 'আর্নে থম্পসন টাইপ-সূচী' নামে পরিচিত। এ-প্রসঙ্গে থম্পসন বলেন:

সংশোধন করবার পর আর্নের সূচীটি ইংরেজিতে অনুবাদিত হয়, কিন্তু এ শুধু অনুবাদই ছিল না, ছিল তার চেয়েও কিছু বেশি। কেননা এতে আরও কিছু টাইপ সংযোজিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন পর্যালোচনায় যে-সমস্ত নতুন টাইপ প্রকাশিত হয়, সেগুলো যেমন বাদ দেওয়া হয়নি, তেমনি মূল সূচী থেকে কিছু কিছু টাইপ পরিত্যক্ত হয়, কারণ এগুলো শুধু আঞ্চলিক প্রয়োজনই মেটাতে পারতো। অবশ্য এগুলোর একটি

তালিকা ক্রোড়পত্রে স্থান পায়। আর্নে যে সাধারণ পদ্ধতিটি অনুসরণ করেছেন, তা বিনষ্ট করা হয়নি। তিনি টাইপের যে ক্রমিক সংখ্যা নির্ধারণ করেছিলেন তাও অবিকল রেখে দেওয়া হয়। ফরাসী লোক-কাহিনী ও সুপরিচিত সাহিত্যিক পাঠান্তরের কাহিনীও সংযোজিত হয়। সাহিত্যিক পাঠান্তরের কাহিনী সংযোজিত করা হয়, কারণ এগুলো লোক-ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও কাহিনী-গুলোর উৎস নির্দেশ না করার দরুন মূল সূচীটি লোককাহিনীর দক্ষ ছাত্র ছাড়া আর সবার কাছেই গোলমেলে মনে হতো।[৪৯]

থম্পসন অবশ্য আর্নের মন্তব্যের মূল পাঠ অবিকৃত রেখেছেন, যদিও প্রয়োজনবশত বিশেষ বিশেষ বক্তব্যকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। জটিল কাহিনীর ক্ষেত্রে, টাইপ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং সেইসঙ্গে কাহিনীর মটিফসমূহের বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়। থম্পসন সূচীটিকে সমৃদ্ধ করবার জন্য বোল্ট-পলিভ্কা কর্তৃক সম্পাদিত গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের 'হাউসহোল্ড টেল্স'য়ের নতুন সংস্করণ Anmerkungen এবং ক্রিশ্চিয়ানসেনের Norse Eventyr নামক সংগ্রহটির সাহায্য গ্রহণ করেন। এ ছাড়া লোককাহিনী সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধেরও সদ্ব্যবহার করা হয়।

আর্নের সূচী 'ভার্জিকনিসে' স্থান বিশেষে গ্রন্থপঞ্জীসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান করা হলেও, তা যথেষ্ট ছিল না। থম্পসন সূচীটিকে পরিশোধিত করবার সময় গ্রীম ও গ্রুন্দৎভিগের কাহিনী সংগ্রহের ক্রমিক সংখ্যা ছাড়াও ছোট বড় সকল সংগ্রহ ও তার পঠন-পাঠনের তথ্যাদি সন্নিবেশিত করেন। তিনি বোল্ট-পলিভকার সম্পাদিত Anmerkungen ও এফ. এফ. বার্তা-সমূহের (FF Communications) ক্রমিক সংখ্যাগুলোর যথাযোগ্য উল্লেখ করেন। টাইপের সংযোজনের সময় কোন্ কোন্ আঞ্চলিক তালিকা থেকে তা গৃহীত হয়েছে, তারও উল্লেখ করা হয়। এভাবেই আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান ও আফ্রিকার কাহিনীসমূহের তালিকার তথ্যাদি যুক্ত করা হয়।

থম্পসন কর্তৃক আর্নের সূচীটির পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরও বিভিন্ন দেশ থেকে কাহিনীর তালিকা প্রকাশিত হয়। রাশিয়ান সূচী প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্নে-থম্পসন সূচীর নতুন সংস্করণে পরিবর্তন

[৪৯]প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২০

সাধন করা হয়। এফ. এফ. বার্তায় রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, আইসল্যাণ্ড, স্পেন ও ওয়ালুনের লোককাহিনীর তালিকা প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রাশিয়া ও লিথুয়ানিয়ার তালিকাও মুদ্রিত হয়। আর্ণের সূচী অনুসরণ করে আরও অনেক সূচী প্রকাশিত হয়।

[৫০]আর্ণের সূচীটি সংশোধনের সময় দুটি নতুন টাইপ এতে যুক্ত করা হয়। এর একটি হল সূত্রধারী কাহিনী (Formula Tales) ও

[৫০]সূত্রধারী কাহিনীর সংজ্ঞা দিয়ে থম্পসন বলেন যে এ-ধরনের কাহিনীতে কাহিনীর যেটুকু না থাকলেই নয়, শুধু সেটুকুই থাকে। একটি সরল কেন্দ্রীয় কাহিনীকে অবলম্বন করে একটি সূত্রের বারংবার উল্লেখ করা হয়। এতে কাহিনীর বিষয়বস্তুর চেয়ে কাহিনী কিভাবে বলা হয়, সেটাই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এ হল এক ধরনের কাহিনী বলার খেলা। এতে বলা ও খেলার আনন্দ দুই-ই পাওয়া যায়। এসব কাহিনী কখনও সম্পূর্ণরূপে বলা হয় না। অর্থাৎ অসমাপ্ত থেকেই যায়। কখনও বা ঘুরে ঘুরে বারংবার মূল কাহিনীতে প্রত্যাবর্তন করা হয়। নীচে একটি সূত্রধারী কাহিনীর বর্ণনা দেওয়া হল:

এক আজার একেনাই বেটা আছিল। সেই বেটা কোনা বড় হয়্যা বাপক্ এলা কয়, "মুই দ্যাশ-বিদ্যাশ ঘুরিবার যাইম্, মোক্ হাতীঘোড়া সাজেয়া দ্যাও, লোকলস্কর দ্যাও।" কথা শুনিয়া আজা কান্দে, আনী কান্দে, কান্দে দাস-দাসী। তাঁও বেটা চলি গ্যালো, কারো কথায় না শুনিল।

কথক এটুকু বলার পর উৎসুক শ্রোতা (বিশেষ করে শিশুরা) জিজ্ঞেস করে, তারপর? কথক বলে, "আজার বেটা তখন হাতীঘোড়া লোকলস্কর নিয়া যায় আর যায়, একদিন যায়, দুইদিন যায়, তিনদিন যায়, একক্রোশ যায়, দুইক্রোশ যায়, তিনক্রোশ যায়। কৌতূহলী শ্রোতা পুনরায় প্রশ্ন করে, 'তারপর'। কথক বলে, 'তারপর আবার যায়, তিনদিনের পথ একদিনে যায়, ১ মাসের পথ সাতদিনে যায়, ১ বছরের পথ তিনমাসে যায়'। শ্রোতা বলে, 'তারপর'? কথক বলে, 'তারপর যায় আর যায়, বন-বাদাড় ভাঙ্গি যায়, দরিয়া পার হয়্যা ফির যায়, যায় আর যায়। শ্রোতা

অন্যটি হল ক্রমপুঞ্জিত কাহিনী[৫১] (Cumulative Tales)। আর্ণে-থম্পসন সূচীর এই অধ্যায়টি ১৯৩৩ সালে মার্কিন লোকতত্ত্ববিদ আর্চার টেলর সংশোধিত করে সমৃদ্ধ করেন।

১৯৩৫ সালে লাণ্ডে লোককাহিনীর পঠন-পাঠনের জন্য আহুত কংগ্রেসে আর্ণে-থম্পসন সূচীটিকে পুনর্বার সংশোধনের প্রশ্ন ওঠে। নীতিগতভাবে এটিকে সংশোধিত করবার প্রশ্নটি মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু দাক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপে, মুসলিম দেশসমূহ ও বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশ থেকে লোককাহিনীর পর্যাপ্ত সংগ্রহ ও তালিকা না প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত সংশোধনের কাজকে মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বলে, 'তারপর'? কথক উত্তর দেয়, "আবার যায়, যাইতে যাইতে পাহাড় পায়, নদী পায়, সেটা পায় হয়্যা ফির যায়'। শ্রোতা বুঝতে পারে এ-যাওয়া আর শেষ হবে না। সুতরাং সে হতাশ হয়ে চুপ করে যায়। আর শিশুরা ঘুমিয়ে পড়ে।

[বর্তমান গ্রন্থকার কাহিনীটি যেভাবে শুনে এসেছে, ঠিক সেভাবে নিলফামারী মহকুমার (রংপুর) আঞ্চলিক ভাষায় এখানে লিপিবদ্ধ হল]

[৫১]ক্রমপুঞ্জিত কাহিনীর সংজ্ঞাদান করে থম্পসন বলেন যে এখানেও বারংবার একই সূত্র আবৃত্ত হলেও এসব কাহিনীর কেন্দ্রে মোটামুটি একটা কাহিনীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে। এর মধ্যেও কাহিনী বলার মধ্যে একটা 'খেলা খেলা'ভাব দেখতে পাওয়া যায়। তবে এসব কাহিনীর কেন্দ্রীয় ঘটনা যুগ-যুগান্তর পেরিয়ে নানা ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যেও বেঁচে থাকে। এ-রকম কাহিনী বলার ক্ষেত্রে একটা দীর্ঘ অসংলগ্নতা লক্ষ্য করা যায়। কথক ইচ্ছে করেই কাহিনীকে দীর্ঘায়িত করার জন্য নতুন নতুন ঘটনা আবিষ্কার করে থাকেন।

এরকম একটি কাহিনীর উদাহরণ নিম্নে নেওয়া হল:

এক যে ছিলো বেড়াল (টাইপ ২০২৭)। বাড়ির গিন্নী যখন বাড়িতে ছিলো না, তখন বেড়াল প্রথমে পুডিং, তারপর বাটি এবং শেষে হাতাটিও খেয়ে ফেলে। বাড়ির গিন্নী এসে বেড়ালকে বলে, 'বাব্বা কত মোটা হয়েছো তুমি।' বেড়াল বলে, 'পুডিং খেয়েছি, বাটি খেয়েছি, হাতা খেয়েছি, এবারে তোমায় খাবো।' একথা বলার সঙ্গে

আর্নে-থম্পসন টাইপ-সূচী সর্বত্র স্বীকৃতি পেলেও তার সমালোচনা কম হয় নি। প্রথমত টাইপ সূচীর শ্রেণীবদ্ধকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা আলোচিত হয়েছে। থম্পসনের মতে এ-ধরনের আলোচনা তত্ত্বভিত্তিক, তাতে শ্রেণীবদ্ধকরণের কাজে কোনো বাস্তব সাহায্য পাওয়া যায় না। অবশ্য এসব আলোচনা থেকে লাভ যে একেবারে হয়নি তা নয়। দেখা যায় যে সূচীতে টাইপের বিভাগ করবার সময় একটি বিশেষ টাইপ অন্য আর একটি বিশেষ টাইপ থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে, অথচ বাস্তবে এ-রকম দূরস্থিত টাইপের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। কেউ কেউ কাহিনীসমূহের আরও সুক্ষ্ম বিভাগের প্রয়োজনের কথা বলেছেন। আর, এস, বগ্স্ তার স্পেনীয় লোককাহিনীর সূচীতে (Index of Spanish Folktales, FF. Communications, No. 90) টাইপের আরও উপ-বিভাগ নির্ণয় করেছেন। এবং এর সঙ্গে তিনি একটি মূল্যবান অক্ষরানুক্রমিক তালিকাও সংযোজিত করেছেন। থম্পসনের মতে অক্ষরানুক্রমিক তালিকাটি আর্নে-থম্পসন সূচীর চেয়েও সমৃদ্ধ।

কেউ কেউ আর্নে-থম্পসন সূচীকে একটি বিশ্ব-সূচীতে উন্নীত করবার দাবি তুলেছেন। এটা আজ হোক বা কাল হোক, একদিন হয়তো বা সম্ভব হবে। কিন্তু তার পূর্বে পৃথিবীর সব অঞ্চলের কাহিনী সংগৃহীত হওয়া দরকার এবং সংগৃহীত কাহিনীর আঞ্চলিক সূচীও প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। থম্পসন নিজেও এই আশা প্রকাশ করে বলেছেন যে অদূর ভবিষ্যতে যে এটি সম্ভব হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আর্নে-থম্পসন টাইপ-সূচী সম্পর্কে যে কথাটি সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, তাহল এই যে লোককাহিনীর শ্রেণীবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে এই সূচী একটি

সঙ্গে সে তার মুনিবানিকে খেয়ে ফেলে। এরপর রাস্তায় যত প্রাণীর সঙ্গে তার দেখা হয়, তাকে সে একই কথা বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে একইভাবে সে তাদেরকেও খেয়ে ফেলে। এ-ভাবে অনেক খাওয়ার পর বেড়ালের পেটটি ফুলে একেবারে বেলুনের মত হয়ে যায়, শেষে পেটটি ফেটে গিয়ে সে অক্কা লাভ করে।

(স্টিথ থম্পসন, দি ফোকটেল, পৃঃ ২৩১ দ্রষ্টব্য)

অনন্য গ্রন্থ। লোককাহিনী যে মূলতই বিশ্বসংস্কৃতির একটি মহান অংশ এ কথাও এই সূচীর ঐকান্তিক অধ্যয়নে ধরা পড়ে। তাছাড়া বহু গবেষক ও পণ্ডিতের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় কিভাবে তিল তিল করে সূচীটিকে সমৃদ্ধ করেছে, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। কার্ল ক্রোন যে বীজ রোপণ করেছিলেন, অ্যান্টি আর্নে তাতে পানি সিঞ্চন করে একটি চারার সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তোলেন। সেই চারাও আর্নের হাতেই আন্তরিক পরিচর্যা লাভ করে। থম্পসন সেই চারাকে ফলদায়িনী বৃক্ষে পরিণত করেন। সে বৃক্ষ বিশাল, বিপুল শাখা-প্রশাখাসমন্বিত হয়ে নতুন নতুন পত্র-পল্লবে সুসজ্জিত রূপ ধারণ করে, একটি মহামহীরূহে পরিণতি পাবে, এ-আশা আজ আর কল্পনা নয়।

মটিফ প্রসঙ্গ

মটিফের সংজ্ঞা পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে। এখন কাহিনীর মটিফ নির্ণয় করার সমস্যাটি আলোচনা করা যেতে পারে। উপরে আলোচিত 'ড্রাগন হত্যাকারীর কাহিনীটির' মটিফ নির্ণয় করা হয়েছে নিম্নলিখিত উপায়ে:

ড্রাগন হত্যাকারীর কাহিনী (টাইপ ৩০০)

[এই টাইপটির সঙ্গে ৩০১ ৩০৩. ৩০৫*, ৩১৫, ৪৬৬, ৪৬৬*, ৪৬৬**, ৫০২, ৫৩০, ৫৩২ ও ৫৫৩-ইত্যাদি টাইপকে মিলিয়ে বিচার করতে হবে]

১। এল ১০০ অ-প্রতিশ্রুতিশীল নায়ক। পি ৪১২.১ রাখাল নায়ক। কে ২২১২ বিশ্বাসঘাতক বোন। বি ৪২১ সাহায্যকারী কুকুর। বি ৩১২.২ বিনিময়ের মাধ্যমে সাহায্যকারী জানোয়ার লাভ। বি ৩১১ সহ-জাত (একই সঙ্গে যার জন্ম) সাহায্যকারী প্রাণী। নায়কের সঙ্গে একই সময়ে যার জন্ম হয় এবং (সাধারণত) জন্ম হয় একই মন্ত্রপূত উপায়ে। বি ৩৫০ কৃতজ্ঞ জানোয়ার। বি ৩৯১ খাদ্য প্রদানের ফলে

কৃতজ্ঞ প্রাণী। বি ৩৯২ নায়ক কর্তৃক অর্জিত দ্রব্যাদি জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বণ্টন। বি ৩১২.১ উপহার হিসেবে সাহায্যকারী প্রাণী। ডি ১২৫৪ মন্ত্রপূত লাঠি। ডি ১০৮১ মন্ত্রপূত তরবারি।

২। বি ১১.১০ ড্রাগনসমীপে মানুষকে বলিদান। এস ২৬২ নির্দিষ্ট সময়ান্তে অতিকায় বিকটমূর্তি দানব সমীপে মানুষকে বলি হিসেবে নিবেদন। টি ৬৮.১ উদ্ধারকারীর হাতে রাজকন্যাকে উপহারস্বরূপ প্রদান। কিউ ১১২ উপহারস্বরূপ অর্ধেক রাজত্বদান।

৩। বি ১১ ড্রাগন। জি ৩৪৬ ধ্বংসকারী বিকটাকার প্রাণী। রাজ্য বা দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা। বি ১১.২.১১ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে অগ্নিত্যাগকারী ড্রাগন। বি ১১.২.৩.১ সাতমাথা বিশিষ্ট ড্রাগন। বি ১১.৫ ৫ ড্রাগনের কর্তিত মাথা আপনা আপনি এসে জোড়া লাগে।

৪। ডি ১৯৬২.২ মাথার উকুন তোলার মাধ্যমে মন্ত্রপূত ঘুম প্রদান। একজন বুড়ো বা একজন রাক্ষসের মাথা থেকে উকুন তোলার ঘটনাকে ঘুম-পাড়ানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ডি ১৯৭৫ ড্রাগনের প্রতিপক্ষ নায়কের মন্ত্রমুগ্ধ নিদ্রা। ড্রাগনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নায়ক হঠাৎ যাদুমুগ্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ডি ১৯৭৮ ১ আঙুল কেটে ফেলে মন্ত্রমুগ্ধ নিদ্রা থেকে জাগরণ। ডি ১৯৭৮.২ ঘুমন্ত নায়কের উপর অশ্রুর ফোঁটা পড়লে যাদুমুগ্ধ ঘুম থেকে জাগরণ। বি ১১.১১ ড্রাগনের সঙ্গে যুদ্ধ। বি ১১.১১.১ ড্রাগনের যুদ্ধ : ড্রাগন কর্তৃক যুদ্ধবিরতির প্রার্থনা মঞ্জুর এবং পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ড্রাগনের আবির্ভাব। বি ১১.১১.২ নায়কের কুকুর (কখনও ঘোড়া) ড্রাগনের কর্তিত মাথা যাতে মাথায় এসে জোড়া না লাগতে পারে—সেজন্য কর্তিত মাথাকে বাধা দেয়। বি ৫২৪.১.১ কুকুর আক্রমণকারী মানুষখেকো (ড্রাগন)-কে হত্যা করে। কে ১০৫২ ড্রাগন আয়নায় নিজের মূর্তি দেখে তাকে আক্রমণ করে। আর ১১.১১.১.৩ ড্রাগনের গ্রাস থেকে রাজকন্যার (কুমারী) উদ্ধার।

৫। এইচ ১০৫.১ প্রমাণ হিসেবে ড্রাগনের জিহ্বা গ্রহণ। ড্রাগন হত্যাকারী ড্রাগনের জিহ্বা কেটে রেখে দেয় ও পরে প্রয়োজন হলে

সেই যে ড্রাগনের প্রকৃত হত্যাকারী তার প্রমাণস্বরূপ জিহ্বা উপস্থিত করে। আর ১১১.৬ উদ্ধারকৃত কুমারী পরে পরিত্যক্ত হয়। কে ২২৬২ কাঠকয়লা পোড়াবার কাজে নিযুক্ত বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি। কে ২২৬৫ বিশ্বাস-ঘাতক লালপরিচ্ছদধারী যোদ্ধা।

৬। সি ৪২২১ বিধিনিষেধ (Tabu): ড্রাগনের হত্যাকারীর পরিচয় প্রকাশ নিষিদ্ধ। ড্রাগন হত্যাকারী রাজকন্যাকে তার পরিচয় প্রকাশ করতে মানা করে। বি ৫১৫ জন্তু-জানোয়ার কর্তৃক পুনর্জীবিতকরণ। কে ১৯৩৩ মিথ্যাবাদী নায়ক কর্তৃক ঘটনা গোপন রাখার শপথ করানো। কে ১৯৩২ মিথ্যাবাদী নায়ক কর্তৃক পুরস্কার দাবি (প্রকৃত নায়কের যা পাওয়ার কথা)। এন ৬৮১ নায়িকার সঙ্গে অন্যের বিবাহের সব ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ, তখন প্রকৃত প্রেমিকের আবির্ভাব। টি ১৫১ অবাঞ্ছিত বিবাহ থেকে এক বছরের জন্য দূরে অবস্থান। এইচ ১৫১.২ সাহায্য-কারী প্রাণী কর্তৃক বিবাহের ভোজসভা থেকে খাদ্য অপহরণের সময় মনোযোগ আকর্ষণ। এরপরই নায়কের পরিচয় প্রকাশ পায়। এইচ ৮৩ উদ্ধারের চিহ্ন। উদ্ধারের কাজে নায়ক যে কৃতকার্য হয়েছিল তার প্রমাণ। এইচ ১০৫.১ প্রমাণস্বরূপ ড্রাগনের জিহ্বা প্রদর্শন। এইচ ৮০ চিহ্নাদি প্রদর্শন করে পরিচয় দান। এইচ ১১৩ রুমাল দিয়ে পরিচয় প্রদান। কে ১৮১৬.৩.১ নায়িকার বিবাহে নায়ক ভৃত্যের বেশে উপস্থিত হয়।[৫২]

উপরোক্ত মটিফসমূহের মধ্যে শুধু 'ড্রাগন হত্যাকারী'র মটিফই নেই, আছে এর সঙ্গে সম্পর্কিত টাইপের মটিফসমূহ। 'ড্রাগন হত্যাকারী'র কাহিনীটি মনোযোগ সহকারে পড়লে ধরা পড়বে কোন্ কোন্ মটিফ কাহিনীটির মধ্যে বর্তমান। 'ড্রাগন হত্যাকারী'র কাহিনীটির মধ্যে নিম্ন-লিখিত মটিফ বিদ্যমান:

১। বিনিময়ের মাধ্যমে সাহায্যকারী প্রাণী লাভ। কাহিনীটির নায়ক উত্তরাধিকারসূত্রে পায় তিনটি ভেড়া। ভেড়া তিনটি বদল করে সে পায় তিনটি অদ্ভুত কুকুর। মটিফ বি ৩১২.২।

[৫২] Antti Aarne and Stith Thompson. The Types of the Folktale, পৃ: ৮৮

২। সাহায্যকারী কুকুর। নায়ক ভেড়ার পরিবর্তে তিনটি কুকুর পায়। এই তিনটি কুকুরই তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। মটিফ বি ৪২১।

৩। একজন বুড়োকে নায়ক সাহায্য করে। এই সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য বুড়ো নায়ককে একটি মন্ত্রপূত তরবারি বা কখনও একটি মন্ত্রপূত লাঠি দেয়। মন্ত্রপূত তরবারি—মটিফ ডি ১০৮১ ও মন্ত্রপূত লাঠি—মটিফ ডি ১২৫৪।

৪। নায়ক বাড়ি থেকে অভিযাত্রার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লে এক রাজ্যে গিয়ে সাতমাথাবিশিষ্ট এক ড্রাগনের কথা জানতে পারে। সাতমাথাবিশিষ্ট ড্রাগন—মটিফ বি ১১.১.২।

৫। নায়ক আরও জানতে পারে নির্দিষ্ট সময়ান্তে একজন কুমারী নারীকে ড্রাগনের কাছে উৎসর্গ করতে হয়। মটিফ এস ২৬২।

৬। নায়ক আরও জানতে পারে যে কুমারী উৎসর্গ না করলে ড্রাগন দেশ ধ্বংস করে দেবে। মটিফ জি ৪৩৬।

৭। নায়ক ড্রাগনকে হত্যা করতে পারলে রাজকন্যার সঙ্গে নায়কের বিয়ে দেওয়া হবে। মটিফ টি ৬৮.১।

৮। নায়ক ড্রাগনকে হত্যা করতে পারলে তাকে অর্ধেক রাজত্ব দেওয়া হবে। মটিফ ১১২।

৯। এরপর সে ড্রাগনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করে। ড্রাগনের সঙ্গে যুদ্ধ—মটিফ বি ১১.১১।

১০। ড্রাগনের সঙ্গে যুদ্ধ করে নায়ক রাজকন্যাকে উদ্ধার করে। রাজকন্যার উদ্ধার—মটিফ আর। ১১১.১.৩।

১১। নায়ক ড্রাগনকে হত্যা করে—তার সাতমাথার সাতটি জিহ্বা কেটে নিয়ে পকেটে রাখে। পরে তা প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা হবে। প্রমাণ হিসেবে জিহ্বা কর্তন—মটিফ এইচ ১০৫.১।

১২। নায়ক ড্রাগনকে হত্যা করে অন্য অভিযাত্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। যাত্রা করার পূর্বে নায়ক রাজকন্যাকে তার পরিচয় প্রকাশ করতে নিষেধ করে। পরিচয় প্রকাশে বাধানিষেধ—মটিফ সি ৪২২.১।

১৩। নায়ক চলে যাবার পর কোচোয়ান (লাল পোশাক পরিহিত) মিথ্যেবাদী নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় ও রাজকন্যাকে হত্যার ভয় দেখিয়ে প্রকৃত ঘটনা গোপন করার দাবি জানায়। মিথ্যেবাদী নায়ক কর্তৃক রাজকন্যাকে শপথ করানো—মটিফ কে ১৯৩৩।

১৪। মিথ্যেবাদী নায়ক (প্রকৃত নায়কের অনুপস্থিতির সুযোগে) রাজার কাছে প্রতিশ্রুত পুরস্কার দাবি করে। মটিফ কে ১৯৩২।

১৫। নায়ক নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হলে কোচোয়ানের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু প্রকৃত নায়ক বিয়ের দিনটিতেই উপস্থিত হয়। বিয়ের নির্দিষ্ট দিনে নায়কের (প্রেমিকের) আবির্ভাব—মটিফ এন ৬৮১।

১৬। প্রকৃত নায়কই যে প্রকৃত ড্রাগন হত্যাকারী তার প্রমাণস্বরূপ রাজকন্যাকে উদ্ধারের চিহ্ন দেখাতে হয়। উদ্ধারের চিহ্ন—মটিফ এইচ ৮৩।

দেখা যাচ্ছে 'ড্রাগন হত্যাকারী' কাহিনীটিতে মোট ১৬টি মটিফ আছে। মটিফের সংজ্ঞা নির্ণয়কালে থম্পসন বলেছেন যে মটিফ কাহিনীর এমন একটি ক্ষুদ্রতম অংশ যা লোক-ঐতিহ্যে বেঁচে থাকবার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। দ্বিতীয়ত মটিফের অসাধারণ ও আকর্ষণীয় কিছু থাকতেই হবে। ড্রাগন হত্যাকারীর কাহিনীতে ১৬টি মটিফের মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য আছে কিনা তা কাহিনীটির নিবিষ্ট পাঠে ধরা পড়তে বাধ্য। বিষয়টি আরও আলোচনা করলে দেখা যাবে যে প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি মটিফই বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। যেমন ধরা যাক কাহিনীর ড্রাগনটির কথা। আলোচ্য কাহিনীর ড্রাগনটি সাতমাথাবিশিষ্ট। এর মটিফ হল বি ১১.২.১। পৃথিবীর যে-কোনও কাহিনীতে সাতমাথাবিশিষ্ট ড্রাগনের সন্ধান পেলে তাকেও উপরোক্ত মটিফের দ্বারাই চিহ্নিত করা হবে। আবার এই কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য কোনো কোনো কাহিনীতে আগুনে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী এক ড্রাগনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এর মটিফ হল বি ১১.২.১১। কোনো কোনো কাহিনীতে শুধু ড্রাগনের

কথাই আছে। এর মটিফ হল বি ১১। এককথায় এর প্রতিটি মটিফ কাহিনীর বৈশিষ্ট্যময় ক্ষুদ্র উপাদান। কাহিনীর যে-কোন অংশে পরিবর্তন ঘটলেও এগুলো অপরিবর্তিত থেকে যাবে। মটিফেরসঙ্গে মটিফের পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য ইংরেজি বর্ণমালার বর্ণ ও তার সঙ্গে সংখ্যা যোগ করে যে-পদ্ধতিটি থম্পসন ব্যবহার করেছেন, তা দেখে অনেক সময় আতংকিত হতে হয়। টাইপের ক্ষেত্রেও সে-কথা খাটে। কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে টাইপ ও মটিফ-সূচীর অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে কি নিখুঁতভাবে টাইপ ও মটিফের শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতিটি আয়ত্ত করা হয়েছে।

নীচে আর একটি সরল লোককাহিনীর মটিফ সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

নিশ্চুপ থাকার প্রতিযোগিতা (*টাইপ ১৩৫১*)

একজন স্বামী আর তার স্ত্রী এই বলে বাজি ধরে যে তারা দুজনেই চুপ করে থাকবে, তবে এই চুপ করে থাকবার সময় যে প্রথমে কথা বলবে, সে বাজিতে হেরে যাবে। এরপর বহুক্ষণ ধরে দুজনে চুপ করে থাকে। এরকম ক্ষেত্রে হয় স্ত্রী স্বামীকে, নয় তো স্বামী স্ত্রীকে এমনভাবে প্ররোচিত করে যে একপক্ষ কথা বলবেই। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'কে আগে কথা বলে' নামক এই প্রতিযোগিতাটি খুবই জনপ্রিয়। এর মধ্যে একটিই মটিফ—আর তাহল 'কে আগে কথা বলে'—কে ২৫১১।

আমাদের দেশে এমন বহু কাহিনী আছে যার টাইপ ও মটিফ কিছুই নির্ধারিত হয় নি। তার কারণ এ দেশের লোককাহিনী বিস্তৃত ভাবে সংগৃহীত হয়নি। আর সংগৃহীত হলেও তা প্রকাশিত হয়নি। সে-কারণেই আর্নে-থম্পসন টাইপ-সূচীতে আমাদের দেশের সব কাহিনীর টাইপ পাওয়া সম্ভব নয়। আবার অন্যদিকে সব কাহিনীর মটিফও মটিফ-সূচীতে পাওয়া যায় না। তবে আর্নে-থম্পসন সূচীকে অনুসরণ

করে বাংলাদেশের লোককাহিনীর টাইপ ও মটিফ-সূচী প্রণয়ন করা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

মটিফ-সূচীর পরিচয়

আর্নে তাঁর টাইপ-সূচীর প্রণয়নকালে একথা অনুভব করেছিলেন যে কাহিনী-বিধৃত মটিফের আলাদা সূচী প্রস্তুত করা উচিত। কিন্তু তিনি মটিফ-সূচী প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারেননি। অন্যান্য যারা মটিফের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, তারাও টাইপ ও মটিফকে একসঙ্গে তালিকাভুক্ত করে একটা জগাখিচুড়ির সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আর্থার ক্রিস্টেনসেন সামান্য কিছুসংখ্যক কাহিনীর সাহিত্যিক পাঠান্তর ও নীতিকাহিনী নিয়ে একটি মটিফ-সূচী নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চালান। থম্পসনের মতে এটি এত সীমাবদ্ধ সূচী ছিল যে বিশ্বের বিপুল লোককাহিনীর মটিফ এতে স্থান পায় নি। অলবার্ট ওয়েসেলস্কি অনুরূপ আর একটি প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনিও সাধারণভাবে সকলের ব্যবহারোপযোগী সূচীর কথা চিন্তা করেন নি।

অধ্যাপক স্টিথ থম্পসনই একটি স্বতন্ত্র মটিফ সূচী প্রস্তুত করার কথা চিন্তা করেন। তিনি তাঁর ডক্টরেট উপাধির জন্য European Tales among the North American Indians নামক গবেষণা-গ্রন্থ রচনা কালে কাহিনী-বিধৃত বৈশিষ্ট্যময় উপাদানগুলো তালিকাভুক্ত করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইউরোপীয় ও আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান কাহিনীর মটিফ ছাড়াও, পূর্বে যে-সমস্ত তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল, থম্পসন সে-গুলোরও শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রতিটি মটিফ এক একটি কার্ডে লিখে রাখতেন। এভাবে বিপুল তথ্য সংগৃহীত হলে, তখন শ্রেণীবদ্ধকরণের প্রশ্ন দেখা দেয়। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের 'হাউসহোল্ড টেল্‌সে'র যে-সংস্করণ Anmerkungen নামে বোল্ট-পলিভ্‌কার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, স্টিথ থম্পসন তাও ব্যবহার করেন। তাছাড়া আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানদের ভেতর থেকে সংগৃহীত আরও অনেক কাহিনীর মটিফও তিনি লিপিবদ্ধ করেন। ১৯২২ সালে শুধু আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানদের কাহিনীতে প্রাপ্ত

মটিফসমূহের আলোচনা করতে গিয়ে থম্পসন একটি বিস্তৃত সূচী প্রণয়নের কথা ভাবতে শুরু করেন। সংগৃহীত মটিফসমূহকে ভিত্তি করে প্রথমে একটি খসড়া সূচী রচিত হয়। চার শ' পৃষ্ঠার এই সূচীও অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। বাধ্য হয়েই তিনি এটিকে একটি সম্পূর্ণাঙ্গ সূচী হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। আরও অধিক পড়াশোনা ও তথ্যসংগ্রহের কাজে তিনি মনোনিবেশ করেন। এই কাজ চলে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত। প্রকৃত সূচী তৈরীর কাজ শুরু হয়, তারও পাঁচ বছর পরে। সূচীটির প্রকাশনা শুরু হয় ১৯৩০ সালে এবং শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে।

স্টিথ থম্পসন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কাহিনী-টাইপ থেকে মটিফ সংগ্রহ করে একটি আদর্শ সূচী তৈরী করেন। আদিম মানবগোষ্ঠীর লোককাহিনী ও পুরাণ কাহিনী, ইউরোপীয় ও প্রাচ্যদেশীয় কাহিনী, গীতিকা, স্থানিক ও ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী, এবং সুপরিচিত পুরাণ কাহিনীমালা, কাহিনীর সাহিত্যিক পাঠান্তরের সংগ্রহ যেমন, পঞ্চতন্ত্র, আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা, ছন্দোবদ্ধ কাহিনী (Fabliaux) ও হাসিঠাট্টার কাহিনীর বইপুথি ইত্যাদি পঠন-পাঠন করে তিনি মটিফ সংগ্রহ করেন। এছাড়া লোকলোরের পত্র পত্রিকা, কাহিনী বা মটিফের তুলনামূলক আলোচনা, বোল্ট-পলিভ্কার Anmerkungen, এফ, এফ, বার্তার নথিপত্র, কস্কোয়ার গ্রন্থাদি, এবং এ-ধরনের বই-পত্র সবই তিনি তাঁর সূচী প্রস্তুতের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন।

কাজেই, দেখা যাচ্ছে বিশ্বের সব অঞ্চলের কাহিনী-টাইপ থেকে তিনি যেমন মটিফ গ্রহণ করেন, তেমনি সেগুলো যুক্তিসঙ্গত উপায়ে শ্রেণীবদ্ধ করেন। অবশ্য মটিফকে শ্রেণীবদ্ধকরণের সময়ে মটিফগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত কিনা তা বিবেচনা করা হয় নি। কারণ তা করাও সম্ভব নয়। তবে এক একটি মটিফ যে পাশাপাশি অবস্থিত কাহিনী-টাইপের সঙ্গে সম্পর্কিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্মরণ রাখতে হবে যে শ্রেণীবদ্ধকরণের বাস্তব প্রয়োজনে বিশ্ববিস্তৃত কাহিনী-টাইপের বৈশিষ্ট্যময় উপাদানকে একত্রিত করা ও তা যাতে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়, সে কারণেই মটিফ-সূচী প্রস্তুত করা হয়। কাজেই একটি মটিফ আর একটি

মটিফের সঙ্গে রক্ত-সম্পর্কে সম্পর্কিত কি না, সেটি এখানে গৌণ ব্যাপার। থম্পসন বলেন :

"এ-প্রসঙ্গে এটুকু বলা যায় যে এটি বড়জোর গ্রন্থাগারের বই-পুস্তক শ্রেণীবদ্ধকরণের মত একটি ব্যাপার,—যেখানে ভালো আর মন্দ বই, পুরনো আর নতুন বই, বড় আর ছোট বই পাশাপাশি একই শেলফে অবস্থান করছে: দরকারী কথা হল এই যে বিষয়গুলো মানবিক জ্ঞানের বিভাগ আর উপবিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত।[৫৩]

মটিফ সূচীর ভূমিকায় যা বলা হয়েছে, তার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল :

সাধারণভাবে বিভাগগুলো পুরাণ কাহিনী থেকে শুরু করে অতীন্দ্রিয় কাহিনী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে বাস্তবধর্মী কাহিনী ও হাস্যরসাত্মক কাহিনীতে। তবে সূচীটির সর্বত্র এই ক্রমপর্যায় দেখতে পাওয়া যাবে না। কেননা সূচীর শেষভাগটির কাহিনী প্রায়ই বাস্তবধর্মী।

এ (A) অধ্যায়ে সৃষ্টিসংক্রান্ত ও বিশ্বের প্রকৃতি সম্পর্কিত মটিফগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: যেমন, সৃষ্টিকর্তা, দেবতা, আধা-দেবতা, পৃথিবী সৃষ্টি ও ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ বিশেষত পৃথিবীর স্বরূপ, জীবনের আবির্ভাব, জীব-জানোয়ার ও উদ্ভিদ জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি।

বি (B) অধ্যায়টি জীব-জানোয়ার সম্পর্কিত। যে-সব কাহিনীতে জীব-জানোয়ার আছে, তার সবগুলো এখানে স্থান পায়নি; কেননা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাহিনীর চরিত্র নয়, ঘটনাপ্রবাহই এসব কাহিনীর ক্ষেত্রে তাৎপর্যময় হয়ে দেখা দিয়েছে। 'বি' অধ্যায়ে, সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে, কোন না কোন ভাবে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীব-জানোয়ারই স্থান পেয়েছে: পুরাণ কাহিনীর জীব-জানোয়ার যেমন ড্রাগন, মন্ত্রপূত ও সত্য কথনে অভ্যস্ত পাখি, মানুষের গুণে গুণান্বিত জীব-জানোয়ার, জীব-জানোয়ারের রাজ্য, জীব-জানোয়ারের বিবাহ ও ঐ ধরনের অন্যান্য

[৫৩] Stith Thompson, The Folkale, পৃ: ৪২৪

ঘটনা। তাছাড়া এতে আছে সাহায্যকারী ও কৃতজ্ঞ প্রাণী, জীব-জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের বিবাহ, এবং জীব-জানোয়ারের প্রসঙ্গে অন্যান্য কল্পনাশ্রয়ী চিন্তাভাবনার প্রসঙ্গ।

জীব-জানোয়ারই ছিল মানুষের পূর্বপুরুষ (Totemism)। 'বি' অধ্যায়ের মটিফসমূহ বর্বর আদিম অধিবাসীদের উপরোক্ত ধারণাটির কিছু কিছু সম্ভাব্য সম্পর্কের কথা যেমন তুলে ধরে, তেমনি সি (C) অধ্যায়টি প্রাচীন বাধানিষেধের (Tabu) ধারণাটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। নিষিদ্ধ সমস্ত জিনিসের তালিকা এখানে দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে এর বিরোধী অদ্বিতীয় বলপ্রয়োগে বাধ্য করার ধারণাটিও বিবৃত হয়েছে।

ডি (D) অধ্যায়টি সবচেয়ে বিস্তৃত বিভাগ যাদুবিদ্যা (Magic) সংক্রান্ত বিষয়ে নিবেদিত। এর বিভাগগুলো খুবই সাধারণ: যেমন রূপান্তর ও মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি (Transformation and Disen-chantment), মন্ত্রপূত দ্রব্যাদি ও সেগুলোর প্রয়োগ; যাদুর ক্ষমতা ও অন্যান্য গুপ্ত বিষয়ের প্রকাশ।

ই (E) অধ্যায়ে মৃতদের সম্বন্ধে ধ্যানধারণা সংক্রান্ত মটিফের তালিকা প্রদান করা হয়েছে—যেমন পুনরুজ্জীবন, ভূত-প্রেত, মৃত্যুর পর পুনর্বার দেহধারণ ইত্যাদি। এর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণাদি।

যাদু ও মৃতের প্রত্যাবর্তনের ধারণা ছাড়াও ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যে অনেক আশ্চর্য কাণ্ডকারখানার উদাহরণ আছে: যেমন, অন্যান্য বিশ্বে (পাতাল, স্বর্গ, পরীদের দেশ, রাক্ষসের রাজ্য ইত্যাদি) ভ্রমণ, অত্যদ্ভুত প্রাণী যেমন পরী, প্রেতাত্মা, দৈত্য, আশ্চর্য স্থান, যেমন সমুদ্রের মধ্যে প্রাসাদ, অত্যদ্ভুত ব্যক্তি ও ঘটনাবলী। এসব নিয়ে গড়ে উঠেছে অধ্যায় এফ্‌ (F)।

ভয়ংকর প্রাণী যেমন, রাক্ষস-খোক্কস, ডাইনী-পেত্নী ও এ-ধরনের অন্যান্য প্রাণীদের প্রাধান্যের কথা বিবেচনা করে, এগুলোকে নিয়ে একটি বিশেষ বিভাগ—জি (G) অধ্যায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এটা লক্ষ্য করা যাবে যে স্বভাবতই 'ই', 'এফ্‌' ও 'জি' অধ্যায়গুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক বিদ্যমান, উদাহরণস্বরূপ, রাক্ষস-খোক্কস ও দুষ্ট প্রেতাত্মার মধ্যে,

অথবা পরী এবং ডাইনী বা ভূতপ্রেতের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। এসব সম্বন্ধ পারস্পরিক পর্যায়ে (Cross-reference) প্রতি অধ্যায়ে নজীর হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।

এইচ (H) অধ্যায়টি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ অতিপ্রাকৃতের উদাহরণ সামান্যই গুরুত্ব লাভ করেছে, যদিও তা কিছু কিছু এখানেও বিদ্যমান থাকছে। 'এইচ' অধ্যায়টি মূল পরিকল্পনার তিন তিনটি অধ্যায় থেকে ক্রমপর্যায়ে গঠিত হয়েছে। যাই হোক, এগুলোকে 'পরীক্ষা' (Test) পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সনাক্তকরণের কাহিনীমাত্রই মূলত পরিচয়জ্ঞাপক পরীক্ষা, ধাঁধা এবং ঐ ধরনের ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। এর সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, চাতুরীর পরীক্ষা, কর্মসম্পাদন (Tasks) ও অনুসন্ধানের (Quest) পরীক্ষা এবং শক্তির পরীক্ষার কথা। তদুপরি চরিত্র ও গুণাবলীর নানা পরীক্ষার ঘটনাও উল্লেখ করতে হয়।

জে (J) অধ্যায়টিও মূলত তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল— যথা, জ্ঞান (Wisdom), চাতুর্য ও বোকামি। এ-তিনটির মৌলিক ঐক্যও স্পষ্ট : এগুলোর পেছনে ক্রিয়াশীল প্রেরণা সর্বদাই মানসিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত। এর প্রথম অংশে (জ্ঞান) নীতি কাহিনীর বেশির ভাগ স্থান পেয়েছে। হাস্যরসাত্মক কাহিনীর বই-পত্র (Jestbooks) থেকে এসেছে চাতুরী ও বোকামির বেশির ভাগ কাহিনী।

'জে' অধ্যায়ের মটিফসমূহে মূলত চরিত্রের মানসিক গুণাবলীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে কে (K) অধ্যায়ে, কাহিনীর ঘটনা-প্রবাহের (Action) প্রতি প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বর্ণনামূলক কাহিনী-সাহিত্যের একটা বড় অংশ প্রবঞ্চনা (Deception) ও ঠকানোর বিষয়ে নিবেদিত। চোর ও বদমায়েশ, প্রতারণাপূর্ণ আটক (Capture), চরিত্রভ্রষ্ট করার জন্য প্রলুব্ধকরণ ও সতীত্বহানি এবং ব্যভিচার, ছদ্মবেশ ও বিভ্রান্তি বা মায়াজাল (Illusion) ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছে মটিফের শ্রেণীবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্তৃত একটি অধ্যায়।

সূচীর পরবর্তী অংশ ছোট ছোট অধ্যায়ে বিভক্ত। এল (L) অধ্যায়ে অ-প্রতিশ্রুতিশীল সন্তানের কৃতকার্যতা বা অহংকারীর পতন ইত্যাদি ভাগ্য

পরিবর্তনের কথা আছে। এম (M) অধ্যায়টি সুনিশ্চিত ভবিতব্য—যা কখনও প্রত্যাহৃত হবে না, এমন সব বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে, যেমন, চুক্তি (শর্ত), প্রতিজ্ঞা এবং শপথ (কিরা)। এন্‌ (N) অধ্যায়ের কাহিনীতে ভাগ্য পরীক্ষা (Luck) যে বিস্তৃত স্থান জুড়ে আছে, তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। জুয়াখেলার কাহিনী, ভাগ্যদেবীর মন্দ ও মঙ্গলজনক বরের কথাও এখানে বলা হয়েছে।

পি (P) অধ্যায়টি সামাজিক ব্যবস্থাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। রাজা বা রাজকুমারদের সম্পর্কে যেসব কাহিনী পাওয়া যায়, তার সবগুলোই এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, এখানে শুধু সেসব মটিফকে গ্রহণ করা হয়েছে, যা একটি সমাজ ব্যবস্থার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। যেমন রাজা–বাদশা সম্পর্কিত প্রথা, অথবা সামাজিক শ্রেণী ও বিভিন্ন পেশার সম্পর্ক, অথবা আইন-কানুন বা সৈন্যসংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্য-কলাপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু থাকলে তা এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে পারস্পরিক পর্যায়ে (Cross-reference) অনেক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

কিউ (Q) অধ্যায়ে পুরস্কার ও শাস্তিবিষয়ক মটিফ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর (R) অধ্যায়ে বন্দী ও পলাতক, এবং এস্‌ (S) অধ্যায়ে বড় রকমের নিষ্ঠুরতার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। টি (T) অধ্যায়ে যৌনসংক্রান্ত মটিফ সংগৃহীত হয়েছে, যদিও সূচীর অন্যান্য অধ্যায়ে এরকম ধরনের চিত্তাকর্ষক মটিফ আছে। এ-অধ্যায়ে বিশেষত প্রেম, বিবাহ, বিবাহিত জীবন, সন্তানের জন্ম ও বিভিন্ন ধরনের যৌন-সম্পর্কের মটিফ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইউ (U) অধ্যায়ে সিধেসাধা ব্যাখ্যামূলক ধর্মোপদেশসম্পন্ন নীতি কাহিনীর সাহিত্য থেকে কতকগুলো ছোট ছোট মটিফ সংগৃহীত হয়েছে। এর এক একটি কাহিনী জীবনের প্রকৃতি নির্ণয়ের উদ্দেশেই শুধু বলা হয়ে থাকে। 'দুনিয়াটা এ-ভাবেই চলছে' বা 'সংসারটা এরকমই' হল, এসব কাহিনীর বিষয়।

কতকগুলো ঘটনা ধর্মীয় পার্থক্যের উপরই নির্ভরশীল অথবা সেগুলো বিশেষ ধর্মীয় উপাসনার বিষয়বস্তুর উপরই নির্ভর করে। ভি (V)

অধ্যায়ে এসব মটিফই স্থান পেয়েছে। ডব্লু (W) অধ্যায়ে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহই শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। নিয়মিত বিভাগের শেষটি হল অধ্যায় এক্স (X); এতে শুধু হাস্যরসাত্মক মটিফই সন্নিবেশিত হয়েছে। অবশ্য অন্যান্য স্থানে যেসব হাস্যরসাত্মক কাহিনী দেওয়া হয়েছে, তার পারস্পরিক তথ্য এখানে পাওয়া যাবে।

সূচীর শেষ অধ্যায়টি হল জেড (Z); এই অধ্যায়ে শ্রেণীবিভাগের কতকগুলো ছোট অংশ সংযোজিত হয়েছে, কেননা এগুলো আলাদা বিভাগ দাবি করতে পারে না। ভবিষ্যতে যদি আরও শ্রেণীবদ্ধকরণের জন্য ছোট ছোট বিভাগের প্রয়োজন হয়, তবে তা জেড (Z) অধ্যায়ে নতুন বিভাগ হিসেবে সংযোজন করা যাবে।[৫৪]

সূচীটির মটিফসমূহের জন্য একটি সংখ্যা-নিরূপক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। পদ্ধতিটি এমনভাবে অনুসৃত হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এটিকে প্রয়োজনবোধে অসংখ্যবার সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে। প্রতিটি মটিফকে একটি সংখ্যার দ্বারা এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে—যাতে বোঝা যায়, সূচীর কোথায় সেই মটিফটির স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। এ-পদ্ধতিটি উপলব্ধি করবার পথেও খুব অসুবিধে নেই। অধ্যায়গুলোকে ইংরেজি বর্ণমালার বড়হাতের বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়কে ১০০টি সংখ্যায় বিভক্ত করে—প্রতি ১০০টি সংখ্যাকে আবার দশে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রতিটি মটিফের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিমাণে গ্রন্থসম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে। ফলে সূচীটি তথ্যপঞ্জী হিসেবেও মূল্য লাভ করেছে। এদিক থেকে এটি আর্নে-থম্পসন টাইপ-সূচীর পরিপূরক বলে বিবেচিত হতে পারে।

টাইপ-সূচী ও মটিফ-সূচীর মধ্যে একটি আন্তরিক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যাবে। টাইপ-সূচীর বহুস্থানে বিশেষ বিশেষ কাহিনী-টাইপের মটিফ নির্দেশ করা হয়েছে। একইভাবে মটিফ-সূচীতে বিশেষ বিশেষ কাহিনী-টাইপের মটিফ আলোচিত হয়েছে। এই দুটি সূচী একইসঙ্গে ব্যবহার করতে পারলে বিপুল ঐতিহ্যবাহী লোককাহিনীর একটি সঠিক পরিচয় পাওয়া যাব। এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য, তিতিক্ষা আর অধ্যবসায়।

[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২৪-৪২৫

সপ্তম অধ্যায়

লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা

লোককাহিনীর সংগ্রহ ও প্রকাশনা অথবা তার শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং বিশেষ স্থানে সেগুলো সংরক্ষণের ব্যাপার মোটামুটি একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পেয়েছে। এসব কাজে বহু বিচিত্র জীবিকার মানুষ কাজ করেন বলে সবাই লোককাহিনীর আলোচনায় একই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন না। অবশ্য লোককাহিনীর পঠন-পাঠন, সংগ্রহ, সম্পাদনা বা নিছক পরিবেশনের মধ্যে একটা আনন্দ আছে। কিন্তু লোককাহিনীর আলোচনাকে সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক করবার ব্যাপারে সাধারণ উৎসাহ যথেষ্ট হতে পারে না। লোককাহিনীর তুলনামূলক গবেষণায় যাঁদের উৎসাহ রয়েছে, তাঁদের পক্ষে এ-কথা আরও বেশি সত্য। লোককাহিনীর তুলনামূলক পাঠকালে দেখা যায় যে গবেষকমাত্রই বিপুল সমস্যার সম্মুখীন হন। সমস্যাটি স্টিথ থম্পসনের মতে, সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। অবশ্য সমস্যার সম্মুখীন হন বলেই সমাধানের পথও তাঁরা খোঁজ করেন।

লোককাহিনীর সংগ্রহকালে দেখা যায় যে যে-মুহূর্তে একটি লোক-কাহিনী কথকের মুখ থেকে সংগৃহীত হল, কোনো কারণেই তা সেই কথকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। অন্যকথায় সে-ও সেটা কোন বৃদ্ধ বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট শুনেছে। মৌখিক ঐতিহ্যে প্রচলিত কাহিনী সে-কারণেই ব্যক্তি-বিশেষের কোন দলিল নয়—বরং তা সামগ্রিক-ভাবে দেশ বা সমাজের সম্পত্তি। কথক অবশ্য কাহিনীটি সংরক্ষণের জন্য দায়ী। এজন্যই লোককাহিনী সংগ্রহকালে স্মরণ রাখা দরকার যে লোককাহিনী মূলতঃ দীর্ঘ জীবন যাপনে সক্ষম। লিখিত বা মৌখিক

ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত যে-কোন কাহিনীই যুগ যুগ ধরে হস্তান্তরিত হয়ে আসে। আবার একই কাহিনী শুধু যে দীর্ঘ জীবনের অধিকারী তাই নয়—একই কাহিনী নানা জনের হাতে নানাভাবে রূপান্তরিত হয়। কাজেই লোককাহিনীর সংগ্রাহক যদি ভাবেন যে তাঁর সংগৃহীত কাহিনীটিই সেই বিশেষ কাহিনীর চূড়ান্ত দলিল, তাহলে চোরাবালিতে পথ হারানো ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। কেননা একই কাহিনী স্থান থেকে স্থানান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, এক ভূখণ্ড থেকে একেবারে ভিন্ন আবহাওয়ার আর এক ভূখণ্ডে ভ্রমণ করতে সক্ষম। তদুপরি একই কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন কথকের মুখে বারংবার আবৃত্ত হয়ে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে।

তাই একই লোককাহিনীর বহুতর সংখ্যা সংগ্রাহকের কাছে আসতে বাধ্য। আবার সেই কাহিনী সাহিত্যিক বা লিখিত ও মৌখিক ঐতিহ্যেও পাওয়া যায়। লোককাহিনীর তুলনামূলক গবেষণায় উৎসাহী ছাত্র যদি সেই বিশেষ কাহিনীর সামগ্রিক পাঠ (Text) তৈরী করতে চান, অথবা যদি প্রাপ্ত কাহিনীটির সাহিত্যিক বা মৌখিক পাঠের রচনাশৈলী নির্ণয় করতে চান, তাহলে তাঁকে খুব সতর্ক ও যত্নবান হয়ে কাহিনীটির সমস্ত পাঠই পরীক্ষা করতে হবে। এখন ধরা যাক একই কাহিনীর, বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানের ফলে, একশতটি পাঠ পাওয়া গেলো—তখন সমস্যাটি খুব জটিল হতে বাধ্য। একটি বিশেষ কাহিনীর মৌলিক (Original Text) পাঠ নির্ণয় করতে হলে তাই কাহিনীটির সমস্ত পাঠই আন্তরিক ভাবে পরীক্ষা করা দরকার। এ-কারণেই একটি কাহিনীর যত সম্ভাব্য পাঠ সংগ্রহ করা যায়, ততই লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা নিখুঁত ও বৈজ্ঞানিক হওয়ার দাবি করতে পারে।

লোককাহিনীর তুলনামূলক বিচারের জন্য তাই কিছু প্রাথমিক কাজ-কর্ম করা দরকার। এই অতি আবশ্যকীয় কাজকর্ম হল, লোককাহিনী সংগ্রহ ও সম্পাদনা, সংরক্ষণ ও শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং কাহিনীর সূচী তৈরী। সর্বশেষ কাজটি হল লোককাহিনী সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্র স্থাপন।

এই ধরনের কাজের সূত্রপাত গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের সংগ্রহ Kinder-Und Haus-Marchen-য়ের ভূমিকায় করে যান। কিন্তু এ-কাজের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন থিয়োডোর বেনফি। কেননা একই কাহিনীর

অঢেল পাঠসংগ্রহ করে তিনি প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন যে লোক-কাহিনী মূলতই ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্ভূত হয়েছে। বেনফির পর এ-কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেন কস্কোয়াঁ। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টি আসলে লিখিত লোককাহিনীর ঐতিহ্যে নিবদ্ধ থাকায় মৌখিক পাঠের সঙ্গে তাঁদের সামান্য পরিচয়ই ছিল। স্টিথ থম্পসন এ-কারণে মুদ্রিত পুস্তক ও হস্তলিখিত পুথির ভাষ্যের সঙ্গে মৌখিক ভাষ্যের পাঠ ও তাদের আন্তর-সম্পর্ক সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক থাকবার প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছেন। থম্পসন আরও বলেন যে মূলতই লোককাহিনীর লিখিত ও মৌখিক ভাষ্যের পাঠ একেবারে আলাদা আলাদা ব্যাপার। লোক-কাহিনীর লিখিত ভাষ্য কিছু বই ও হস্তলিখিত পুথিতেই সীমাবদ্ধ। লিখিত ঐতিহ্যে প্রাপ্ত লোককাহিনীর আলোচনা মুদ্রিত বা হস্তলিখিত বইপুথির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমেই বিচার করতে হবে। কেননা লিখিত ঐতিহ্যের বই-পুথি পড়া এবং তার থেকে নকল করাই ছিল রেওয়াজ। নকল করবার সময়ে কখনও কাহিনীর পরিবর্তন হয়েছে আর কখনও বা হয়নি। লিখিত লোককাহিনী-সংগ্রহের তারিখ নির্ণয় করা এ-কারণে জরুরি। এ-ভাবে প্রতিটি সংগ্রহের তারিখ নির্ণয় করে তা কালানুক্রম অনুসারে সাজানো দরকার। তাহলে শেষপর্যন্ত লিখিত ঐতিহ্যের একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত কোন্ পুথিটি কার নকল তাও ধরা পড়বে।

কিন্তু মৌখিক ঐতিহ্যের বেলায় ব্যাপারটা ঘটে ভিন্নভাবে। কেননা লিখিত না হওয়ার দরুন লোককাহিনীর মৌখিক ভাষ্য একটা সুসংহত রূপ পেতে পারে না। মৌখিক ভাষ্য, স্টিথ থম্পসনের মতে, সর্বদাই মানুষের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভরশীল। বহুল-পরিচিত ও প্রচলিত কোন একটি কাহিনীর এত মৌখিক ভাষ্য পাওয়া যায় যে মনে হয় যেন লোককাহিনীর মৌখিক ঐতিহ্য কোনো আইনকানুনের ধার ধারে না। একই লোককাহিনীর বিভিন্ন ভাষ্যে এত পরিবর্তন দেখা যায় যে তা বিস্মিত না করে পারে না।

স্টিথ থম্পসন এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে মৌখিক লোক-কাহিনীর ঐতিহ্যে এই-যে আপাত নৈরাজ্য তা শেষপর্যন্ত বিদূরিত হতে

বাধ্য। তাঁর মতে দূরে অবস্থিত স্থানের কাহিনীর চেয়ে একই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লোককাহিনীর মধ্যে বেশি সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। এ-সাদৃশ্যের নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। সেই কারণ এবং তার আবিষ্কার সবসময় নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা না গেলেও, কারণটা যে বাস্তব তাতে সন্দেহ থাকে না। সমস্যাটা জটিল, কেননা লোককাহিনীর মৌখিক ঐতিহ্য ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রভাবান্বিত হয়।

ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতি

লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে তুলনামূলক পাঠের একটা পদ্ধতি স্থাপনে সক্ষম হন কার্ল ক্রোন। এই পদ্ধতির নাম ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি। লোক-কাহিনীর গবেষক কিংবা ছাত্রেরা এই পদ্ধতির সাহায্যে একটি বিশেষ লোককাহিনীর সম্পূর্ণ জীবনকে উদঘাটিত করতে পারেন। এর জন্য প্রয়োজন আলোচ্য কাহিনীটির সকল ভাষ্যের বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণকালে সমস্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদান বিবেচনা করতে হবে। এই সঙ্গে জানতে হবে, কি করে একটি কাহিনী ক্রমাগত মৌখিকভাবে হস্তান্তরিত হয়। তাহলেই শুধু সেই লোককাহিনীটির 'মৌল রূপ' আবিষ্কার করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, এর ফলে বোঝা যাবে কি ভাবে একটি কাহিনী মৌখিকভাবে হস্তান্তরিত হওয়ার সময় নানা পরিবর্তনের স্বাক্ষর নিজ অঙ্গে বহন করে এবং একই কাহিনীর বিভিন্ন ভাষ্য তৈরিতে সাহায্য করে। কাহিনীর তুলনামূলক পাঠের সময় ,কাহিনীর প্রতিটি ভাষ্যের স্থানের নাম ও প্রাপ্তির তারিখ উল্লেখ করা দরকার।

কাজেই তুলনামূলক লোককাহিনীর ছাত্র বা গবেষককে প্রথমেই একই কাহিনীর বিভিন্ন ভাষ্য সংগ্রহ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত লোক-কাহিনী-গবেষকদের সম্পাদিত গ্রন্থাদি, টীকাটিপ্পনী, বিভিন্ন লোককাহিনী সংগ্রহ, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি ব্যবহার করে তার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে হবে। অবশ্য এ-সবের চাইতে জরুরি প্রয়োজন হল কাহিনীগুলোর একনিষ্ঠ

পঠন-পাঠন। এই উদ্দেশ্যে লোককাহিনীর সংরক্ষণ-কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং যে-সব ব্যক্তির কাছে লোককাহিনীর সংগ্রহ আছে, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও দরকার।

থম্পসন বলেন যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে একই কাহিনীর পাঁচ শত থেকে এক হাজার ভাষ্য সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর মতে প্রতিটি ভাষ্যের সম্পূর্ণ পাঠটি রক্ষা করাই সঙ্গত, আর না হলে সম্পূর্ণ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত ভাষ্যেও কাজ চলতে পারে। কারণ দেখা গেছে, কাহিনীর বিভিন্ন ভাষ্যের মধ্যে ছোট একটি ঘটনাও তাৎপর্যময় সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন ভাষ্য সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হলে প্রতিটি ভাষ্যকে চিহ্নিত করা এবং শ্রেণীবদ্ধ করা প্রয়োজন। কোথায় কবে কোন কাহিনী কার কাছে পাওয়া গেছে—সেসব তথ্যও প্রতিটি কাহিনীর সঙ্গে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সর্বশেষ কাজ হল কাহিনীর সাহিত্যিক ভাষ্যকে সাজাতে হবে কালানুক্রম অনুযায়ী আর মৌখিক ভাষ্যকে ভৌগোলিক পদ্ধতিতে।

"এফ. এফ.-বার্তা" (FF Communication) লোককাহিনীর মৌখিক ভাষ্যকে চিহ্নিতকরণের জন্য একটি পন্থা বের করেছেন। প্রতিটি দেশের নামকে একটি সংকেত চিহ্নে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পরে কাহিনীর ভাষ্যের সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জীগত তথ্যের উল্লেখ করে সেই দেশের সংকেত-চিহ্ন যুক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, নরওয়ের সংক্ষিপ্ত শীর্ষনাম হল GN. যদি নরওয়েতে একই কাহিনীর নয়টি ভাষ্য পাওয়া যায়, তবে তাকে এভাবে উল্লেখ করা হয়— GN^1 $GN^২$.........$GN^৯$. এই ভৌগোলিকভাবে চিহ্নিতকরণের বেলায় একটি দেশ যে-ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত—সেই ভাষার প্রথম বর্ণ ও পরে দেশের নামের প্রথম বর্ণ তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। উপরোক্ত উদাহরণে প্রথমে নরওয়ে যে ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত অর্থাৎ জর্মানের 'G' ও পরে নরওয়ের প্রথম বর্ণ 'N' তার সাথে যুক্ত করে শীর্ষনামটি তৈরি করা হয়েছে। এভাবেই সমস্ত দেশের জন্য সংক্ষিপ্ত শীর্ষনাম ব্যবহার করা হচ্ছে।

এভাবে যদি লোককাহিনীর বিভিন্ন ভাষ্যের বিধিবদ্ধকরণের কাজ সম্পন্ন করা যায়, তাহলে কাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিচার ও পর্যালোচনা সহজতর হতে বাধ্য। একটি বিশেষ কাহিনী ও তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর বিশ্লেষণ করাই হল পরবর্তী কাজ।

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতিতে একটি কাহিনীর বিচার

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতিতে ওয়াল্টার এ্যাণ্ডারসন Kaiser und Abt কাহিনীটির সুদক্ষ বিচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজি গীতিকা King John and the Bishop-য়ের মাধ্যমেও কাহিনীটি সুপরিচিত। রাজা যাজককে ডেকে বললেন যে রাজা তাকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন, তিনদিনের ভিতরে তার উত্তর দিতে না পারলে যাজকের প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়া হবে। একজন রাখাল যাজকের ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজাকে প্রশ্ন তিনটির উত্তর দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু কাহিনীটির সমাপ্তি এক এক ভাষ্যে এক এক রকম দাঁড়ানোর ফলে এক জটিল সমস্যা দেখা দেয়।

এ্যাণ্ডারসন তাঁর কাহিনীটির বিচার করতে গিয়ে তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হন, যথা—(ক) কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্র, (খ) ধাঁধাসমূহ ও (গ) কাহিনীর অন্যান্য বক্তব্য।

এই সমস্যাগুলোই কাহিনীটির বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে :

(ক) কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্রসমূহ। এ-ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

১। কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্রের সংখ্যা কত?

২। প্রশ্ন জিজ্ঞেসকারী কে?

৩। কাকে প্রশ্ন করা হয়?

৪। আর উত্তর দেয় কে?

(খ) ধাঁধাসমূহ। এটি বিশ্লেষণ করলে দুটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আবার দ্বিতীয়টির মধ্যে তিনটি উপ-বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে।

১। কতটি প্রশ্ন করা হয়?

২। প্রকৃত ধাঁধা ও তার উত্তর।

(অ) আকাশ কত উঁচু?

(আ) দরিয়া কত গভীর?

(ই) দরিয়ায় কত পানি আছে?

(গ) কাহিনীর অন্যান্য বক্তব্য।

১। ধাঁধার উত্তর চাওয়া হয় কেন?

২। ধাঁধার উত্তর দেবার জন্য কত সময় দেওয়া হয়?

৩। উত্তর দিতে না পারলে কি শাস্তি দেওয়া হয়?

৪। উত্তরদাতা ও যে প্রকৃত উত্তর দেয়—উভয়ের শারীরিক বৈশিষ্ট্য একরকম হয় কেন?

৫। একের জায়গায় অন্য একজন কি করে তার ভূমিকা পালন করে?

৬। সমগ্র ঘটনার ফলাফল কি দাঁড়ায়?

উপরোক্ত আলোচনায় একথা পরিষ্কার বোঝা যাবে যে যেভাবে কাহিনীটিকে বিভিন্ন প্রশ্নের আকারে বিভক্ত করা হয়েছে, সেগুলো কোন-মতে ঐ কাহিনীটির মটিফ নয়। এগুলোকে বরং কাহিনীটির বৈশিষ্ট্য বলা যায়। লোককাহিনীর বিভিন্ন ভাষ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, প্রশ্নগুলো তারই সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছে মাত্র। এখন বিভিন্ন দেশে, ঐ কাহিনীটির যত ভাষ্য পাওয়া যায়, সেগুলোর নির্দিষ্ট পাঠে ধরা পড়বে যে ঐ সম্ভাবনাগুলো সত্য কিনা।

আলোচ্য কাহিনীর 'প্রশ্নকারী' হিসেবে যাকে পাওয়া যায়, তিনি হলেন একজন রাজা (কখনও তিনি রুশ সম্রাট জার, কখনো তুর্কির সুলতান বা খলিফা)। কাহিনীটি সাহিত্যিক ঐতিহ্যেও পাওয়া যায়। এ্যাণ্ডারসন এরকম চার চারটি সাহিত্যিক সংকলনের উল্লেখ করেছেন, (Rom Weltcher, Jan. V. Hallant, Gesta Rom., Fastnachtsp)। অন্যদিকে কাহিনীটিকে বিভিন্ন দেশের মৌখিক ঐতিহ্যে যেখানে যেখানে পাওয়া গেছে, তার বিস্তৃত উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা গেল, কাহিনীটির জার্মানীতে ৬টি, ফ্লিমিশে ৬টি, ডেনমার্কে ১টি, নরওয়েতে ১টি, রাশিয়ায় ২০টি, হোয়াইট রাশিয়ায় ৫টি এবং আরও অনেক দেশে অনেক ভাষ্য বর্তমান রয়েছে।

সমস্ত প্রাপ্ত কাহিনীগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে (২৫৪টি পাঠান্তর) সমস্ত ভাষ্যের ৮১.৪% ভাগের মধ্যে সম্রাট বা রাজাকেই

প্রশ্নকারী হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে। মোট এগারটি ভাষ্যে (মোট কাহিনীর ২·৩% শতাংশ) প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতিকে পাওয়া যায় প্রশ্নকারী হিসেবে। কাজেই যে-সব কাহিনীতে রাজাই প্রশ্নকারী সেসব কাহিনীতেই কাহিনীটির মৌলিক পাঠ (Original Form) পাওয়া যায়। এছাড়া কতকগুলো কাহিনীতে প্রশ্নকারী হিসেবে পোপ, বিশপ, যাজক, পুরোহিত, উজির, অভিজাতবংশীয় ব্যক্তি, অধ্যাপক, জ্ঞানী, এমন কি বেদেদের পর্যন্ত পাওয়া যায়। ষ্টিথ থম্পসনের মতে সংখ্যাধিক্য যে সর্বদাই বিশ্বাসযোগ্য তা নয় বটে, কিন্তু অনেক প্রমাণের মধ্যে এটি একটি।

এভাবেই কাহিনীর সমস্ত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা সম্ভব। কাহিনীর বিভিন্ন ভাষ্যের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য কতবার ব্যবহৃত হয়েছে, তা গুণতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কি কি ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক উপাদান জড়িত, তারও যথাযোগ্য আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু কাজটি হল সুকঠিন, কেননা কাহিনীটির সকল বৈশিষ্ট্যের বিচার করা খুব সহজ নয়। কাজ করতে করতে দেখা যাবে যে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে বিপুল পরিমাণ মালমশলা স্তূপীকৃত হয়েছে। এ-কারণেই কাহিনীর তুলনামূলক বিচারে শুধুমাত্র কাহিনীটির মৌলিক পাঠ নির্ণয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না।

প্রতিটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যত তথ্য সংগৃহীত হবে, সে-গুলো কোন্ ভাষ্যে শতকরা কত পরিমাণে আছে, তা গাণিতিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই সঙ্গে সে-সব বৈশিষ্ট্যের বিস্তৃতি, কাহিনীটির জীবনেতিহাসের প্রয়োজনে লিখে রাখতে হবে।

প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে নিম্নলিখিত উপায়ে পরীক্ষা করতে হবে

(ক) আলোচ্য কাহিনীর যে-কোন বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যে যতবার উল্লিখিত হবে—তার শতকরা হিসেব, (খ) সেই বৈশিষ্ট্যের বিস্তৃতির পরিমাপ, (গ) সম্ভাব্য সুসম্পূর্ণ মৌলিক পাঠের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের

উপস্থিতির ঔচিত্য, (ঘ) সু-সংরক্ষিত ভাষ্যে এই বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি। কেননা গোলমেলে পাঠের মধ্যে ঐ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির চেয়ে উপরোক্ত পাঠে তার উপস্থিতি অনেক বেশী তাৎপর্যময়, (ঙ) ঐ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এমন কিছু থাকতে হবে, যাতে তা সহজেই লোকের স্মরণে থাকে, (চ) কাহিনীতে ঐ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি খুবই স্বাভাবিক মনে হবে, অথচ অন্যত্র তার উপস্থিতি মনে হবে অস্বাভাবিক, (ছ) কাহিনীর ঘটনা প্রবাহের মধ্যে ঐ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি মনে হবে জরুরী—মনে হবে ঐ বৈশিষ্ট্য ছাড়া কাহিনীটির ঘটনা-সংস্থান টিঁকে থাকতে পারতো না, (জ) শুধু একটিমাত্র কাহিনীতে ঐ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি এর। ফলে, মনে হবে ঐ বৈশিষ্ট্যটি অন্যান্য কাহিনীতেও থাকতে পারতো—অথচ নেই বলেই মনে হয়, এই কাহিনীটিই মৌলিক পাঠের সন্ধান দিতে পারে ও (ঝ) ঐ বৈশিষ্ট্যের অন্য রূপকল্পের (Form) সম্ভাবনা—যা নাকি ঐ বৈশিষ্ট্য থেকেই জন্মলাভ করতে পারতো।

এই নয়টি উপায়ে আলোচ্য কাহিনীর বৈশিষ্ট্যগুলোর বিচার করলে "কাহিনীর আদি পাঠ" অথবা আর্নে কথিত Archetype বা সর্বজনগ্রাহ্য কাহিনীটি পাওয়া যায়। সর্বজনগ্রাহ্য রূপটি ছাড়াও যে-সব ভাষ্য পরে তৈরি হয়েছে, তাও এই উপায়ে নির্ণয় করা সম্ভব। গবেষক যদি উপরোক্ত উপায়াদির সাহায্যে কাহিনীর প্রতিটি ভাষ্যের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যসমূহের নিঃসংশয় বিচার করতে পারেন, তাহলে মূল কাহিনীর পাঠও তিনি তৈরি করতে পারবেন। তবে, ষ্টিথ থম্পসনের মতে, তাতেও শুধু একটা সম্ভাব্য (Trial Archetype) মূল কাহিনীই গড়ে উঠবে। পরে আবার সংশোধনের মাধ্যমে তা নিখুঁত হতে পারে।

এভাবে লোককাহিনীর একনিষ্ঠ গবেষক যদি একটি বিশেষ কাহিনীর সমস্ত ভাষ্য তার হাতের কাছে পান—তাহলেই তার পক্ষে লোককাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদান নির্ণয় সম্ভব। এমন হতে পারে যে একই কাহিনীর একটি বৈশিষ্ট্য যা কোথাও পাওয়া গেল না, তার উল্লেখ দেখা গেল কাহিনীটির প্রাচীন সাহিত্যিক পাঠান্তরে। এই সাহিত্যিক ভাষ্যে আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য পাঠান্তরে হয়তো নেই।

এমতাবস্থায় কাহিনীটির সাহিত্যিক ভাষ্য নিয়েই বৈশিষ্ট্যগুলোর আর একটি স্বতন্ত্র বিভাগ গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ সাহিত্যিক ভাষ্যটিকে সেই একই কাহিনীর 'বিশেষ রূপান্তর' বলে মানতে হবে। এমন হতে পারে যে সাহিত্যিক ভাষ্যগুলো যেহেতু পুরণো সেহেতু মূল পাঠের কাছাকাছি পৌঁছয়। আবার এমনও ঘটতে পারে যে একটি বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র একটি অঞ্চলের কাহিনীতে পাওয়া যাচ্ছে—অন্যত্র নেই। তাহলে শুধুমাত্র সেই বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে সেই বিশেষ অঞ্চলের জন্য ঐ একই কাহিনীর আর একটি উপ-বিভাগ গড়ে তুলতে হবে। এখন একই কাহিনীর একটি সাহিত্যিক রূপান্তর এবং আঞ্চলিক রূপান্তর—দুটিকে মিলিয়ে একটি মৌলিক কাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব। এ-ভাবে কাহিনীর আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক কেন্দ্র খুঁজে বের করা যায়। একই লোককাহিনীর অনেক ভৌগোলিক কেন্দ্র থাকাও বিচিত্র নয়। কাহিনীর বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে একই কাহিনীর বিচিত্র বিকাশও অসম্ভব নয়। এই সব বিচিত্রভাবে বিকশিত কাহিনীকে একত্র করে একটি Archetype বা সর্বজনগ্রাহ্য মৌলিক কাহিনী নির্মাণ করা যেতে পারে। এর ফলে কাহিনীটির সমস্ত আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যাবে—আর সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে কাহিনীটির উৎপত্তির উৎসকে বা বিশেষ দেশকে।

এ্যার্নি আর্ণে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতিতে কাহিনী বিচারের একটি বাস্তব উদাহরণ প্রদান করেন। একটি বিশেষ কাহিনীর উৎপত্তি স্থল নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে কাহিনীর জন্ম কোন্ স্থান হয়েছে, তা সব সময় নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতিতে কাহিনীর পঠন-পাঠন করলে একটা সাধারণ অঞ্চল বা দেশকে-কাহিনীর জন্মস্থান বলে স্থির করা সম্ভব হয়। সত্যিকার পরীর কাহিনী কোনো বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত কিনা তা স্থির করা আরও অনিশ্চিত ব্যাপার। এক্ষেত্রে কাহিনীর পাঠের (Text) পঠন-পাঠনও বিশেষ কোনো সাহায্য করে না। এমতাবস্থায় আর্ণে কাহিনীটির প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষ্যের পরীক্ষা করে দেখার জন্য নির্দেশ দেন। যদি সাহিত্যিক ভাষ্যের

কাহিনীগুলো একই স্থানকে নির্দেশ করে, তবে তা কাহিনীটির উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করতে সাহায্য করে থাকে। অবশ্য আর্ণে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে কাহিনীর সাহিত্যিক ভাষ্যের নকল বিভিন্ন স্থানে হতে পারে। সুতরাং সাহিত্যিক ভাষ্যের উৎপত্তির স্থান ও নকলের স্থান আলাদা হতে বাধ্য। একটি কাহিনী কোনো একটি বিশেষ কেন্দ্রে উদ্ভূত হওয়ার পর তা ছড়িয়ে পড়ে। যে-কেন্দ্রে কাহিনীটি উদ্ভূত হয়, সেই অঞ্চলে কাহিনীটি জনপ্রিয় হওয়ার কথা। এটা বোঝা যাবে তখন, যখন সেই অঞ্চল (কেন্দ্রটি যেখানে অবস্থিত) থেকে কাহিনীটির অধিকসংখ্যক পাঠান্তর সংগৃহীত হবে। অর্থাৎ একটি বিশেষ অঞ্চলে কাহিনীটির ভৌগোলিক বিস্তৃতি দেখে বোঝা যাবে, কাহিনীটি সেই অঞ্চলে উদ্ভূত হয়েছে কিনা। কাহিনীর অভ্যন্তরে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য থাকে, যা বিশেষ একটি ভৌগোলিক কেন্দ্র ছাড়া অন্যত্র উদ্ভূত হতে পারে না। আর্ণে একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, একটি কাহিনীতে দেখা যায় যে একটি ভালুকের লেজ বরফে জমে যাচ্ছে। আর্ণের মতে এ-রকম ঘটনা গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশগুলোতে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত 'ড্রাগন হত্যাকারী' ও 'দুই ভাই'-য়ের কাহিনীতে ড্রাগন আছে। কিন্তু আমাদের দেশের কাহিনীতে ড্রাগন নেই। অবশ্য সাত মাথাবিশিষ্ট রাক্ষস আছে। কাজেই এই সূত্রটি ধরে কাজ করলে কাহিনী দুটি কোন দেশে উদ্ভূত হয়েছে, তা মোটামুটি স্থির করা যায়।

সাহিত্যিক ঐতিহ্যে প্রাপ্ত কাহিনী মৌখিক ঐতিহ্যে প্রচলিত কাহিনীর প্রাচীনতা সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থিত করতে পারে। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর দু'শ বছর পরে অ্যাপুলিয়াস তাঁর 'স্বর্ণ গর্দভ' (গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ বাঙলা একাডেমী প্রকাশ করেছেন) গ্রন্থে 'কিউপিড ও সাইকি'র কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইউরোপের মৌখিক ঐতিহ্যে এ-কাহিনীটি এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু অ্যাপুলিয়াসের কাহিনীটি মৌখিক ঐতিহ্যের কাহিনীটির চেয়ে অধিক সুসংহত। সে জন্য মনে করবার কারণ আছে যে 'কিউপিড ও সাইকি'র কাহিনী খ্রীষ্টপূর্ব যুগে প্রচলিত ছিল।

একটি কাহিনীর সর্বজনগ্রাহ্য পাঠ বা আদিরূপ (Archetype) নির্ণয় করতে হলে কাহিনীটির সম্ভাব্য সকল পাঠান্তরের সংগ্রহ অনিবার্য। আর্ণে

ও ওয়াল্টার এণ্ডারসন মৌখিক ঐতিহ্যে প্রচলিত লোককাহিনীর ব্যাপক পঠন-পাঠন করে মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা কতকগুলো সূত্রের সন্ধান পান। লোককাহিনীর পাঠান্তরের অধ্যয়নে ধরা পড়ে যে, সংমিশ্রণ (Diffusion) লোককাহিনীর ক্ষেত্রে একটা বড় সত্য। যাই হোক, আর্ণে কাহিনীর মধ্যে যে-সমস্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করেন, তা নিম্নে প্রদত্ত হল:

(১) কাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের বিস্মরণ। বিশেষত যেগুলো প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না। লোককাহিনীর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে কার্যকরী।

(২) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সংযোজন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি কাহিনীর মটিফ আর একটিতে সংস্থাপিত হয় এভাবেই। কখনো কখনো এটা অভিনব আবিষ্কারও হতে পারে। কাহিনীর প্রারম্ভে এ সমাপ্তিতেই এ-ধরনের সংযোজন লক্ষ্য করা যায়।

(৩) একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক কাহিনীর সংমিশ্রণ। ছোট ছোট জীব-জানোয়ারের কাহিনী, রাক্ষস-খোক্কসের কাহিনী, পাজী-বদমায়েশের চালাকির কাহিনীতেই এ-ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়।

(৪) কাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সংখ্যা বৃদ্ধি—সাধারণত তিন সহযোগে।

(৫) মূল কাহিনীর একটি বৈশিষ্ট্যের (যা কাহিনীটিতে একবারই মাত্র ঘটেছে বা যার উল্লেখ মাত্র একবারই করা হয়েছে) পুনরাবৃত্তি বা উপস্থিতি। কখনো কখনো এগুলো পুনরাবৃত্তির ব্যাপার না হয়ে একই কাহিনীর কোন ঘটনা বা অন্যান্য কাহিনীর ঘটনার সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দেয়।

(৬) একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে বিশেষত্ব প্রদান (যেমন পাখি হয়ে দাঁড়ায় চড়ুই পাখি) এবং বিশেষত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সাধারণীকরণ (যেমন চড়ুই হয়ে দাঁড়ায় পাখি)।

(৭) অন্য কাহিনীর তথ্য বা মালমশলার প্রতিস্থাপন (একটি কাহিনীর তথ্য অন্য কাহিনীতে গ্রহণ করা) বিশেষত কাহিনীর সমাপ্তিতে।

(৮) ভূমিকার পরিবর্তন, এমন কি পরস্পরবিরোধী চরিত্র হলেও: চালাক খেঁকশিয়ালের জায়গায় বোকা ভালুক স্থান পেতে পারে।

(৯) জীব-জানোয়ারের কাহিনীতে জীবজানোয়ারের স্থান মানুষ দখল করে।

(১০) মানুষের কাহিনীতে মানুষের পরিবর্তে জীব-জানোয়ার স্থান পেতে পারে।

(১১) একইভাবে জীব-জানোয়ার, রাক্ষস-খোক্কস, দেব-দৈত্য স্থান পালটায়।

(১২) প্রথম পুরুষে কাহিনীর বর্ণনা, যেন কথকও কাহিনীর একজন চরিত্র বিশেষ।

(১৩) কাহিনীর একটি পরিবর্তন অন্যান্য পরিবর্তনকেও সামঞ্জস্য বিধান করতে বাধ্য করে।

(১৩) কাহিনী ভ্রমণকালে (স্থান থেকে স্থানান্তরে নীত হওয়ার সময়) নতুন নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়ায়: যেমন, অপরিচিত প্রথা বা বস্তুর স্থানে পরিচিত বস্তু স্থান পায়। রাজকুমার ও রাজকুমারীরা আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান পাঠান্তরে গিয়ে সমাজপতির ছেলে বা মেয়ে হয়ে দাঁড়ায়।

(১৫) একই ভাবে অপ্রচলিত বৈশিষ্ট্যের স্থলে আধুনিক বৈশিষ্ট্যের স্থান লাভ ঘটে। যেমন, কাহিনীতে দেখা যায় যে নায়ক ট্রেনে চেপে অভিযাত্রায় বের হচ্ছে।

স্টিথ থম্পসনের মতে মৌখিক ঐতিহ্যে প্রচলিত কাহিনীর পঠন-পাঠনে উপরোক্ত অভিজ্ঞতা যে-কোনও গবেষকই লাভ করবেন। বলাবাহুল্য, এই অভিজ্ঞতা কাহিনীর বিস্তৃতি ও কাহিনীর স্থানান্তরে গমনের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। অবশ্য এগুলোকে কাহিনীর অভ্যন্তরে পরিবর্তন নির্ণয়ের অমোঘ সূত্র (Law) বলে ধরা চলবে না। কারণ কাহিনীর প্রকৃত হস্তান্তরণের ক্ষেত্রে এর একটিও কার্যকরী বলে প্রমাণিত নাও হতে পারে। কিন্তু লোককাহিনী কথকের মুখে মুখে সর্বদা প্রচারিত হচ্ছে—এবং যে-কোনও জীবন্ত বস্তুর মত তা সর্বদাই পরিবর্তনের অপেক্ষা রাখে। কাজেই উপরোক্ত নীতি-নিয়মের সাহায্যে মৌলিক কাহিনীর সঙ্গে

কাহিনীর পুঞ্জীভূত পাঠান্তরের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব। সেই সঙ্গে মৌলিক কাহিনী (Original Tale) থেকে কি করে অসংখ্য পাঠান্তর উদ্ভূত হয়, তাও এতে ধরা পড়বে।

আর্ণের নীতি-নিয়মের সঙ্গে যোগ করতে হয় ওয়াল্টার এণ্ডারসনের অভিজ্ঞতা। এণ্ডারসন The Emperor and the Abbot (রাজা ও যাজক) কাহিনীটির ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতিতে পঠন-পাঠন করতে গিয়ে লোককাহিনীর মৌখিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে কতকগুলো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন। এগুলো হলো :

(ক) লোককাহিনীর আত্ম-সংশোধন, (খ) কাহিনীর বিশেষ রূপ পরিগ্রহণ ও (গ) কাহিনীর বিস্তৃতির দিক্ নির্দেশ।

লোককাহিনীর আত্ম-সংশোধন: একটি কাহিনীর বিভিন্ন পাঠান্তরের আন্তরিক পঠন-পাঠন করলে দেখা যায় যে কাহিনীটির মূল অংশটি সর্বদা আশ্চর্য সংহতিসহ বিদ্যমান। পরিবর্তন যে-ভাবেই হোক না কেন, এই অংশটুকু (Essential Story) অক্ষত থেকে যায়। এর ব্যাখ্যা দিয়ে এণ্ডারসন বলেন যে এই অংশটুকু যে অপরিবর্তিত থেকে যায়, তার কারণ এই নয় যে কথক কাহিনীটি সর্বাংশে স্মৃতিতে অক্ষুণ্ণ রাখেন। বিশেষত যখন দেখা যায় যে একই কাহিনীর দুটি পাঠান্তরও একরকম নয়। এণ্ডারসনের মতে কাহিনীটির মৌলিক অংশটুকু নিম্নলিখিত কারণে অপরিবর্তিত থেকে যায় :

(ক) একই কাহিনীর (হাসি-ঠাট্টা বা স্থানিক কাহিনী ইত্যাদি) প্রতিজন কথক তাঁদের মূল বক্তার কাছে কাহিনীটি একবার নয়, বহুবার শুনে থাকেন।

(খ) দ্বিতীয়ত শুধু একজনের কাছে নয়, কাহিনীটি তিনি বহুজনের কাছে শুনে থাকেন। বলাবাহুল্য, একই কাহিনী বিভিন্ন লোকের কাছে শোনার সময় তাঁরা ঐ কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যও পেয়ে থাকেন। বুদ্ধিমান শ্রোতারা কাহিনীটি শ্রবণকালে অনেক সময় কথককে কাহিনীর ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনে সাহায্য করে। এভাবেই কাহিনীটি যাতে মূল পাঠের (Text) কাছাকাছি থাকে, সে জন্য শ্রোতারাও সাহায্য করে। যদি কোনো শ্রোতা একই কাহিনীর এমন দুটি ভাষ্য শোনেন

যা বিস্তৃতভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তবে তিনি তা আলাদা করেই স্মৃতিতে ধরে রাখবেন ও আলাদা করেই তা পরিবেশন করবেন।

কাহিনীর পাঠকে অপরিবর্তিত রেখে কাহিনীকে স্থায়িত্ব দান করার জন্য প্রতিভাবান কথকের প্রতিভাই মূলত দায়ী। যে-কাহিনী এভাবে অপরিবর্তিত থেকে সংহতি অর্জন করে—তার মধ্যে অবশ্যই শিল্পগত ঐক্য ও বৈশিষ্ট্যময় যৌক্তিকতা বর্তমান। এই যৌক্তিকতা ও শৈল্পিক ধর্ম কখনো কখনো অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কথকের হাতে বিনষ্ট হতে পারে, কিন্তু দক্ষ ও কুশলী কথক এ-সব পরিবর্তনের সার্থক ব্যবহারও করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে কুশলী কথকের ভাষ্যই সর্বদা জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং কাহিনীর প্রয়োজনীয় অংশ এঁদের পাঠান্তরেই অপরিবর্তিত থাকে।

কাহিনীর বিশেষ রূপ পরিগ্রহণ: একটি কাহিনীতে প্রথম যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তা নিঃসন্দেহে একটি ভুল—যে ভুল স্মৃতি থেকে উদ্ভূত। কিন্তু এ পরিবর্তন শ্রোতাদের কাছে মধুর বলে মনে হলে, তা বারবার আবৃত্ত হতে বাধ্য। যদি এই ভুলটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তবে তা কাহিনীর মূল বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করে নিজের আসনটি পাকা করে ফেলে। অর্থাৎ প্রথম পরিবর্তনটিই শেষ পর্যন্ত মৌলিক হয়ে ওঠে। আর এ-ভাবেই একটি নতুন কাহিনী রূপ পরিগ্রহণ করে। বলাবাহুল্য, কাহিনীটি উদ্ভবের কেন্দ্র থেকে (Centre of Origin) ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে থাকে, ঠিক যে-ভাবে কাহিনীটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহণের পূর্বে তার কেন্দ্র থেকে বিস্তৃত হয়েছিল। কখনো কখনো কাহিনীটির পুরণো পাঠ ও পরিবর্তিত পাঠ পাশাপাশি অবস্থান করে।

দেখা গেছে, নতুন (পরিবর্তিত) কাহিনীটি পুরনো ভাষ্যকে দেশ-ছাড়া করে নিজের আসনটি একেবারে স্থায়ী করে নেয়। এণ্ডারসন একে কাহিনীর জীবনে একটি বিপ্লব বলে মনে করেন। তবে স্থানীয়ভাবে কাহিনীর এই পরিবর্তন বা কাহিনীর জীবনে বিপ্লব ঘটলেও কাহিনীটির আদিরূপ অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। এই আদিরূপটি প্রাচীন সাহিত্যিকভাষ্যে, এমন কি নতুন পাঠান্তরের পাশাপাশি থেকেও আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে।

কাহিনী বিস্তারের দিক্ নির্দেশ: এণ্ডারসন এই মত পোষণ করেন যে কাহিনী সাধারণত উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী থেকে নিম্নস্তরের সংস্কৃতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীতে বিস্তৃত হয়। স্টিথ থম্পসনের মতে ইউরোপের মত বহু সংস্কৃতিবিশিষ্ট (এবং যার সবগুলোই উচ্চমানের) অঞ্চলে এ-নীতি প্রয়োগ করা খুব কষ্টকর, তবে বিশেষ বিশেষ কাহিনীর বেলায় এ-নীতি সেখানেও কার্যকরী। নিঃসন্দেহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ইউ-রোপীয়দের নিকট থেকে কাহিনী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে পঞ্চাশটি ইউরোপীয় কাহিনী পাওয়া গেছে, কিন্তু রেড ইণ্ডিয়ানদের একটি কাহিনীও ইউরোপীয়দের মধ্যে পাওয়া যায়নি। এণ্ডারসনের সূত্রটি ইউরোপের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব। ল্যাপ ও নরওয়েজিয়ানদের মতো সরল সংস্কৃতিবিশিষ্ট জনগোষ্ঠীতে জটিল সংস্কৃতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠির (যেমন, ফরাসী, রুশ, জর্মান ইত্যাদি) কাহিনী কি ভাবে বিস্তৃত হয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব। এণ্ডারসন নিজেও উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসীরা রুশ ও সুইডিশদের কাহিনী গ্রহণ করেছেন। এই পদ্ধতিটির সমালোচনা করে থম্পসন বলেন যে এণ্ডারসন সূত্রটির উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

কাহিনীর বাস্তব পরিভ্রমণ অবশ্য সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের একটি বিশিষ্ট রাস্তা ধরেই চলে। পাশাপাশি অবস্থিত ভূ-খণ্ডে স্থলপথে না গিয়ে, কাহিনী জলপথে হাজার হাজার মাইল দূরে অন্য একটি দেশে উপস্থিত হয়। এমনও হতে পারে যে পাশাপাশি দেশে কাহিনীটি একেবারে নাও পাওয়া যেতে পারে। এভাবেই অনেক কাহিনী জর্মানী থেকে সরাসরি সুইডেনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে—মাঝখানে ডেনমার্কে তার চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এণ্ডারসন কাহিনীর বিস্তৃতি প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন যে সব রকমের সীমান্ত (Border) ঐতিহ্যের বিস্তৃতিতে বাধার সৃষ্টি করে। আর যদি সীমান্তে যুদ্ধ বা বিরোধ বাধে, তাহলে অবস্থাটা আরও সঙ্গিন হয়ে ওঠে। এণ্ডারসন, উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালুন কাহিনী প্রসঙ্গে বলেন যে রাজনৈতিক দিক থেকে ওয়ালুন

কাহিনী ফ্লেমিশের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু ভাষাগত দিক থেকে তা ফরাসীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ লোক-ঐতিহ্যে প্রচলিত কাহিনীর বিস্তারে সাংস্কৃতিক সীমান্ত এক বিপুল বাধার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে বিভিন্ন ভাষাভাষী দেশের সীমান্তে সর্বদা দুটি ভাষাতেই কাজকর্ম চলে আর সেজন্যই কাহিনীর বিস্তারে ভাষাগত ব্যবধান অনেক পরিমাণে কমে আসে।

আর্ণের মতে, ইউরোপে এশীয় কাহিনীর বিস্তারে দুটি পথ ছিল খুবই কার্যকরী। এর একটি হল দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার মাধ্যমে বলকান হয়ে বা উত্তর আফ্রিকার মাধ্যমে তা দক্ষিণ ইউরোপে পেঁছাতো। অন্য পথটি হল, সাইবেরিয়া ও ককেশাস হয়ে রাশিয়ার মাধ্যমে প্রাচ্য কাহিনী ইউ-রোপে নীত হতো। রাশিয়া থেকে প্রাচ্য কাহিনী প্রথমে ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে ও পরে গোটা ইউরোপে বিস্তৃত হয়। পাশাপাশি দেশের কাহিনীর পঠন-পাঠন করলে কাহিনী কোন কোন পথে বিস্তৃত হচ্ছে, তা অনেকাংশে ধরা পড়ে। অবশ্য নিকট প্রাচ্যের কাহিনীর সংগ্রহ এত সামান্য যে তা নিয়ে এ-ধরনের পঠন-পাঠন খুব বেশি ফলপ্রসূ হয় না।

লোককাহিনীর ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতিতে যে পঠন-পাঠনের কথা আলোচিত হল, স্মরণ রাখতে হবে, তা শুধুমাত্র লোককাহিনীর বিস্তৃতির অধ্যয়নের ক্ষেত্রেই কার্যকরী। এ-পদ্ধতিটিকে কখনও সার্থক-ভাবে প্রয়োগ করা যায় না, যদি না কাহিনীর একাধিক পাঠান্তর সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয়ত একটি কাহিনী জটিল অবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তাকে বিভক্ত করে কাহিনীর বৈশিষ্ট্যসমূহের পর্যালোচনা সম্ভব নয়। কেননা ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতিতে এই সব বৈশিষ্ট্যেরও পর্যালোচনা হওয়া উচিত। আর্ণে এই ঘটনাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নি। আর্ণে একটি কাহিনীর বহু ভাষ্যের পঠন-পাঠন করে কাহিনীটির আদিরূপ (Archetype) নির্ণয়ের কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক-ভৌগো-লিক পদ্ধতিতে কাহিনীর মটিফের বিচারও যে হতে পারে, একথা তাঁর গবেষণায় ধরা পড়ে নি। কেননা তাঁর মতে কাহিনীর চেয়ে মটিফ সরল এবং সেজন্য তাকে বিভক্ত করে বিশ্লেষণী পঠন-পাঠন হতে পারে না।

থম্পসনের মতে আর্ণের বক্তব্য সাধারণভাবে সত্য হলেও, মটিফ সম্পর্কে তাঁর উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সন্তোষজনক নয়। আর্ণে বলেন যে প্রতিটি মটিফই কোন এক সময়ে কোন একটি কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং যদিও এ মটিফটি বিভিন্ন শ্রেণীর কাহিনীতে পাওয়া যায়, তবু তা মূল কাহিনীটির অঙ্গীভূত হয়েই ছিল। থম্পসন এ-মতের সমালোচনা করে বলেন যে, বহু কাহিনী-টাইপের (একটি মাত্র ঘটনার একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য) একটি স্বতন্ত্র কাহিনী হিসেবেই বর্তমান। আর্ণের তালিকায় (সূচী) গ্রথিত কাহিনী-টাইপের অর্ধেকেরও বেশি মূলত স্বাধীন মটিফ ছাড়া আর কিছু নয়। তদুপরি অনেক মটিফই কাহিনীর অভ্যন্তরে পটভূমি ও চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। বলাবাহুল্য, এসব পটভূমি ও চরিত্র মূলত বিশেষ অঞ্চলের লোকবিশ্বাস ও প্রথা থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ যে-অঞ্চলে (কেন্দ্রে) কাহিনীটি আবির্ভূত হয়, সে-অঞ্চলের লোকবিশ্বাস ও প্রথা মটিফ হিসেবে তার অভ্যন্তরে স্থান পায়। নিষ্ঠুর বিমাতা, বিধি-নিষেধ (Tabu), যাদু, কথোপকথনে সক্ষম জন্তু-জানোয়ার, রাক্ষস খোক্কস, ডাইনী, পরী, বামন (Dwarfs) এসবই হল কাহিনীর প্রথাসিদ্ধ চরিত্র। থম্পসনের মতে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা এসব প্রাচীন উপাদানকে অধিকতর গুরুত্ব দিলেও এগুলোর সঠিক বিচার লোকতত্ত্ববিদ্‌দের হাতেই হওয়া সম্ভব। সাধারণ মানুষের জীবন ও প্রাচীন বা আদিম মানবগোষ্ঠির চিন্তাধারা এসব মটিফের জন্ম দিয়েছে। এবং একথাও সত্য বলে মনে হয় যে এসব বিশ্বাস ও প্রথা স্বাধীনভাবেই বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। কথক কাহিনীতে এসব বিশিষ্ট বিশ্বাস ও প্রথাকে কাহিনীর প্রয়োজনীয় মটিফ হিসেবে গ্রহণ করেন।

এসব কারণেই, থম্পসনের মতে আর্ণের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতিতে মটিফের পঠন-পাঠন সম্ভব নয়—এই মতকে সীমাবদ্ধ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য কাহিনীর মটিফ কতটা সরল, তারই উপর এ-ধরনের পঠন-পাঠন নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, থম্পসন 'বাধাদান ও তৎপর পলায়ন' (Obstacle Flight) কাহিনীটির উল্লেখ করেছেন (কাহিনীটিতে একজন পলায়নকারী তার পেছনে মন্ত্রপূত দ্রব্য ছুঁড়ে মারে—ফলে বাধা বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। ফলে পশ্চাদ্ধাবন-

কারী তাকে ধরতে পারে না)। এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ঘটনাটি বহু কাহিনীতে মটিফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই মটিফটি কোথাও আলাদা কাহিনীর জন্ম দেয়নি, বরং সর্বদা একটি জটিল কাহিনীর বৈশিষ্ট্য হিসেবেই স্থান পেয়েছে। তবু আর্নে এই বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করে একটি গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। এতে নিম্নোক্ত স্থানে পরিবর্তন দেখা যায়: (১) পলায়নকারী, (২) নিক্ষিপ্ত বস্তুসমূহের সংখ্যা, (৩) নিক্ষিপ্ত বিভিন্ন বস্তুসমূহ, (৪) উদ্ভূত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, (৫) পশ্চাদ্ধাবন-কারী, (৬) যে-সমস্ত বিভিন্ন কাহিনী টাইপের সঙ্গে বৈশিষ্ট্যটি জড়িত ও (৭) এর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য মটিফ, যেমন রূপান্তরিত পলায়ন-কারী (Transformed Fugitive)। যেখানেই পরিবর্তন দেখা যাবে, সেখানেই এই নীতির সাহায্যে পঠন-পাঠন সম্ভব হবে। এই নীতিটি আঞ্চলিক কাহিনী (Sagen) ও অন্যান্য একক মটিফ সম্পন্ন কাহিনীর বেলাতেই প্রযোজ্য।

আর্নের বক্তব্য প্রসঙ্গে যে-দুটি আপত্তির কথা বলা হল, তাতে কাহিনী-টাইপের ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতিতে পঠন-পাঠনের কোনো হেরফের হয় না, বরং ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির প্রয়োগ যে আরও সম্প্রসারিত হতে পারে, শুধু তাই দেখানো হয়েছে। অবশ্য ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে মৌলিক আপত্তি উত্থাপন করেছেন লাণ্ডের সি, ডব্লু, ভন সিডো ও প্রাগের অলবার্ট ওয়েসেল্‌স্কি। একই কাহিনীর বহু-বিস্তৃত মৌখিক ও সাহিত্যিক পাঠান্তর সংগ্রহ করে তার পঠন-পাঠন করবার ব্যাপারে এঁরা কোনো আপত্তি তোলেননি। কিন্তু সংগৃহীত কাহিনীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, এঁরা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি আপত্তি তুলেছেন।

লোককাহিনীর মৌখিক ভাষ্যের পঠন-পাঠন করে আর্নে ও এণ্ডার-সন যে সিদ্ধান্তে পৌঁছন, তা মোটামুটি একই রকম: একটি কাহিনী তার উৎপত্তির কেন্দ্র থেকে ক্রমাগত ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে একটি কাহিনী যখন তার একটি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে এবং আর একটি নতুন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে রূপান্তরিত হয়, তখন এই রূপান্তরিত কাহিনীটি আরও কেন্দ্র স্থাপনে সাহায্য করে। পুনর্বার একাহিনীটিও ঢেউয়ের মত

ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তবে আর্নে বা এণ্ডারসন কেউই কাহিনীর ক্রমবিস্তার বা সমান তালে কাহিনীর বিস্তারের কথা বলেননি। কিন্তু ভন সিডো মনে করেন যে লোককাহিনীর ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির প্রবর্তকরা নাকি কাহিনীর ধীরে ধীরে বিস্তৃতির তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ কাহিনী ধীরে ধীরে এক সমাজ থেকে আর এক সমাজে, মাইলের পর মাইল ধরে, গোটা একটি প্রদেশে এবং মহাদেশে এবং শেষপর্যন্ত সমগ্র পথিবীতে বিস্তৃত হয়। থম্পসন বলেন যে এণ্ডারসনের বক্তব্য অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে এ-ধরনের কথা তিনি বলেননি। বরং কাহিনীর বিস্তৃতির ব্যাপারে সমস্ত রকমের সীমান্তই যে বাধার সৃষ্টি করে, একথা এণ্ডারসন উপলব্ধি করেছিলেন।

ভন সিডোর মতে কাহিনী ধীর লয়ে বিস্তৃত না হয়ে, অনেক সময় লম্ফ দিয়ে এগিয়ে যায়। কাহিনীর লিখিত পাঠান্তর যে ভ্রমণকারী ও সৈনিকদের মাধ্যমে দূরদেশে নীত হয়, একথা এণ্ডারসনও বলেছেন। নতুন দেশে, নতুন পরিবেশে কাহিনী পুনর্বার নতুন রূপ পরিগ্রহণ করে। কাহিনীর এসব আঞ্চলিক রূপ সম্পর্কেই সিডো আগ্রহ প্রদর্শন করেন। বিশেষ বিশেষ দেশে (অথবা জাতি, রাজনৈতিক দিক থেকে সংঘবদ্ধ দল বা গোষ্ঠী, যারা নিজেদেরকে বিশিষ্ট বলে মনে করেন) প্রতিটি কাহিনীর স্থিরীকৃত বৈশিষ্ট্যময় টাইপ বিদ্যমান। ভন সিডো এসব টাইপকে 'অইকোটাইপ' (Oikotype) বলে অভিহিত করেছেন। সিডোর মতে এগুলো এমন টাইপ যা একটি দেশকে আপন জন্মভূমি বলে গ্রহণ করে। কিন্তু অন্যদেশে নীত হলে এগুলো 'বিদেশি' বলে আখ্যায়িত হয়। এ টাইপগুলো দূর অতীত থেকে ঐতিহ্য হিসেবে ক্রমাগত হস্তান্তরিত হয়। সিডোর মতে এগুলো যদি অত্যদ্ভূত কাহিনী (Wonder Tales) হয়, তবে সেগুলো অবশ্যই ইন্দোয়ুরোপীয় প্রাচীন মানবগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত, অন্য কোন স্থান থেকে এগুলো ধার করা হয়নি। তিনি আরও বলেন যে একটি 'অইকোটাইপ' যখন অন্য আর একটি 'অইকোটাইপে'র বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে, তখন তা করে নেহাৎ অনিচ্ছায়।

'অইকোটাইপ' সমূহ তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্থায়িত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় কথকের অভাবে। কারণ অনেক কাহিনী আছে যা নতুন দেশে বা অঞ্চলে নীত হয় নি। কারণ কাহিনী যারা বলেন বা বহন করে নিয়ে যান, সেই কথকদের সংখ্যাল্পতাই এর জন্য দায়ী: যতদূর মনে হয়, ভন সিডো প্রতিভাবান কথককেই কাহিনীর বিস্তৃতির কারণ বলে মনে করেন। অর্থাৎ কাহিনী যে ক্রমাগত এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নীত হয়, এ-তত্ত্বে তাঁর আস্থা সামান্যই।

'অইকোটাইপে'র প্রমাণ পেতে হলে প্রথমে একই অঞ্চলের সব কাহিনী সংগৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর পরে প্রতিটি কাহিনীর পাঠান্তর নির্ণীত করে তার ভৌগোলিক এলাকা চিহ্নিত করতে হবে। যদি একটি ভৌগোলিক এলাকায় একই কাহিনীর পাঠান্তর পাওয়া যায়, তবে 'অইকোটাইপে'র সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনো বাস্তব ক্ষেত্রে এ-ধরনের গবেষণা পরিচালিত হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। কাজেই ভন সিডোর 'অইকোটাইপে'র তত্ত্ব এখনো কল্পনার ব্যাপার।

অন্যদিকে অলবার্ট ওয়েসেল্স্কি একেবারে ভিন্ন দিক থেকে একটি আপত্তি তোলেন। লোককাহিনীর সাহিত্যিক ভাষ্যকেই তিনি মৌখিক কাহিনীর ভাষ্যের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেন। তিনি বিশ্বাসই করতে চান না যে কাহিনীর মৌখিক ভাষ্যের কোন পঠন-পাঠন সম্ভব।

তিনি মনে করেন যে, লোককাহিনীর লিখিত বা মুদ্রিত ভাষ্যই লোকমুখে গিয়ে প্রচারিত হয়। কাজেই তাঁর মতে শুধুমাত্র লিখিত লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনাই সম্ভব। কেননা লোককাহিনী লোকমুখে গিয়ে ক্রমাগত সংহতি হারাতে থাকে, ফলে কাহিনী তার ঐক্য বজায় রাখতে পারে না।

থম্পসনের মতে ওয়েসেল্স্কি একজন পণ্ডিত ও কটতর্কে পারদর্শী ব্যক্তি। লিখিত লোককাহিনীর মৌখিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁর পরিচয় ছিল খুবই অন্তরঙ্গ, এমন কি অদ্বিতীয় বলা যায়। কিন্তু লোককাহিনীর মৌখিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁর কোন শ্রদ্ধা ছিল না বললেই চলে। তাঁর মতে গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের সংগৃহীত কাহিনীকে বারংবার সংশোধিত করে এবং তাঁদের সংগ্রহে সাহিত্যিক ঐতিহ্যের কাহিনীকে স্থান দিয়ে মূলত

লোকস্মৃতিতে কাহিনীর অবস্থান এবং মুখে মুখে কাহিনীর বিস্তৃত হওয়ার সমগ্র ধারণাটিকেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এণ্ডারসন ওয়েসেল্স্কির একচোখো আলোচনার উপযুক্ত জওয়াব দিয়েছেন। (ইতিপূর্বে আলোচিত) কাহিনীর আত্ম-সংশোধন প্রসঙ্গে এণ্ডারসন বলেন যে লোক-মুখে কাহিনী তার সংহতি বা ঐক্য তো হারায়ই না, বরং কাহিনীটি সর্বদাই তার মূল ভাষ্যের সকল উপাদানকে বজায় রাখার চেষ্টা করে।

স্টিথ থম্পসনের মতে ওয়েসেল্স্কি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোককাহিনীর লিখিত ও মৌখিক ভাষ্যের সম্পর্ক একটি জটিল বিষয় এবং সে-কারণেই প্রশ্নটি আরও গভীরতর বিচার বিবেচনার দাবী রাখে। প্রকৃত পক্ষে পেরল্টের সংগ্রহ, পঞ্চতন্ত্র, বোক্কাচিও-র 'ডেকামেরন' বা 'আলিফ্ লায়লা ওয়া লায়লা'র কাহিনী-সমূহের কত ভাষ্য লোক-ঐতিহ্যে পাওয়া যায়—তার একটি পঠন-পাঠন স্বতন্ত্রভাবে হতে পারে। ওয়েসেল্স্কি অবশ্য কাহিনীর মৌখিক ভাষ্য ও সাহিত্যিক পাঠান্তরের সম্পর্কের উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বিষয়টি সাবধানতার সঙ্গে পরীক্ষা করা দরকার।

যাই হোক, ভন সিডোর অইকোটাইপের তত্ত্ব ও ওয়েসেল্স্কি কর্তৃক লিখিত লোককাহিনীর উপর গুরুত্ব আরোপ 'ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতি'কে আরও সমৃদ্ধ করেছে। প্রকৃতপক্ষে 'অইকোটাইপ' বিশেষ বিশেষ স্থানে পাওয়া সম্ভব। অন্যদিকে লিখিত ও মৌখিক লোক-কাহিনীর পারস্পরিক সম্বন্ধ নিখুঁতভাবে নির্ণীত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। কাজেই ভন সিডো ও ওয়েসেল্স্কির আলোচনা 'ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতি'কে নতুন করে পরীক্ষা করবার সুযোগ করে দিয়েছে। অর্থাৎ এ-পদ্ধতির সমালোচনা পদ্ধতিটিকে ক্রমাগত নিখুঁত করতেই সাহায্য করেছে।

এ-পদ্ধতিটি আবিষ্কারের পূর্বেও লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতির আবিষ্কারের ফলেই লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা আজ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মিস্ কক্সের 'সিণ্ডেরেলা' কাহিনীটির পঠন-পাঠনের কথা

বলা যায়। সিণ্ডেরেলা কাহিনীটির বহুতর ভাষ্য সংগ্রহ ও তার পাঠান্তর-সমূহের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করলেও মিস্ কক্স সংগৃহীত তথ্যাদির ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন নি। একইভাবে একথা শুধু বেনফি ও কস্কোয়াঁর ক্ষেত্রেই সত্য নয়, হার্টল্যাণ্ডের বিপুল কলেবর গবেষণা-গ্রন্থ 'দি লিজেণ্ড অব্ পার্সিয়াস' (The Legend of Persius) প্রসঙ্গেও খাটে।

এ-পদ্ধতিটির প্রকাশের পরেও পদ্ধতিটিকে সবাই সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন, তা বলা যায় না। ভন সিডো ও তার অনুসারীরা মাত্র দুটি দিক থেকে কাহিনীর বিচার বিবেচনা করেছেন। প্রথমটি হল, সংগৃহীত কাহিনীর মধ্যে স্থায়িত্বসূচক আঙ্গিক বা বৈশিষ্ট্য আছে কিনা তা নির্ধারণ করা, আর দ্বিতীয়ত এরই মাধ্যমে 'অইকোটাইপে'র সন্ধান করা। কিন্তু কাহিনীর আদিরূপ বা 'আর্কিটাইপ' প্রসঙ্গে তাঁরা একেবারে নীরব থাকলেন। ষ্টিথ থম্পসনের মতে, কেউ কেউ আবার পদ্ধতিটিকে এত আসক্তির সঙ্গে প্রয়োগ করলেন যে তাতে এক নতুন বিপদের সৃষ্টি হল। টেগেথস্ 'কিউপিড ও সাইকি'র কাহিনীটি চমৎকার ব্যাখ্যা দান করলেও, কাহিনীটির সঙ্গে স্বপ্নের সাদৃশ্য প্রমাণ করবার দরুন তা একপেশে পর্যালোচনায় পরিণত হয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতির ব্যবহার সার্থকভাবে হোক আর না হোক, পদ্ধতিটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে তার গুরুত্ব সমগ্র বিশ্বেই বিপুলভাবে উপলব্ধ হয়েছে। বর্তমানে কাহিনীর পাঠান্তর সংগ্রহ ও তার যথাযথ লিপিবদ্ধকরণ ও কাহিনীর প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের নিখুঁত হিসেব করা হয়। কেননা এছাড়া লোককাহিনীর প্রামাণ্য জীবনী রচনা সম্ভব হতে পারে না। তথ্য সংগ্রহের দিকে এই যে সাম্প্রতিক ঝোঁক, তা মূলত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বেড়েছে। আজ যাঁরা লোককাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা করছেন, তাঁরা সবাই ক্রোন, আর্নে ও এণ্ডারসনের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই তা করছেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দেই কার্ল ক্রোন 'ভালুক ও খেঁকশিয়াল' (টাইপ, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১৫, ৩৬, ৩৭, ৪৭) এবং পরে 'মানুষ ও খেঁকশিয়াল' (টাইপ ১৫৪ ও ১৫৫) নামক কাহিনীর বিভিন্ন পাঠান্তর (মৌখিক ও সাহিত্যিক) নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা

করেন। আর্নে পনেরো বছর ব্যাপী গবেষণায় নিযুক্ত থেকে ১৬টি কাহিনী-টাইপের আলোচনা করেন ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির মাধ্যমে। এই টাইপগুলো হল, ১৩০, ৩১৫, ৩১৪, ৪৬০, ৪৬১, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৬৭০, ১৫৪০, ১৬৯৮। ওয়াল্টার এণ্ডারসন 'সম্রাট ও যাজকে'র (টাইপ ৯২২) কাহিনী ও পরে বুড়ো হিল্ডব্র্যাণ্ডের (Old Hildebrand—টাইপ ১৩৬০ সি) হাস্যরসাত্মক কাহিনীটির পর্যালোচনা করেন ঐ একই পদ্ধতিতে। বলাবাহুল্য, এঁদের তিনজনের গবেষণাকে অনুসরণ করেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা আজ অগ্রসর হচ্ছে।

ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা কার্ল ক্রোন ও তাঁর দুই প্রধান অনুসারী আর্নে ও এণ্ডারসন ছাড়াও অস্কার হাক্‌ম্যান, লেনিনগ্রাদের এন্. পি. আন্দ্রেজেভ্, লিডেনের জান দ্য ব্রিস্, লুৎস ম্যাকেনসেন, আর্ণষ্ট ফিলিপসন, ক্রিশ্চিয়ানসেন, আর্চার টেলর, কুর্ট র‍্যাঙ্ক, অ্যাক্সেল ওলরিক, ওয়াল্ডারমার লিয়াঙ্গম্যান, এ. এম. এস্‌পিনোসা, ভ্যালেরি হট্‌জেস্, এডওয়ার্ড ক্লড্, ভন সিডো ও ষ্টিথ থম্পসন প্রমুখ পণ্ডিত ও গবেষকরা বহু কাহিনী-টাইপের পর্যালোচনা করেছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও, ষ্টিথ থম্পসনের মতে,

> এটা খুবই পরিষ্কার যে লোককাহিনীর জীবনী সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানবার আছে। যে-সমস্ত প্রচেষ্টার কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি, তা বিশেষ বিশেষ লোককাহিনীর মূলানুসন্ধান ও বিস্তৃতির ব্যাখ্যাতেই সীমাবদ্ধ, অবশ্য ফলস্বরূপ শেষপর্যন্ত কিছু কিছু সাধারণ সূত্রের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে—যা পরবর্তীকালে লোককাহিনীর বহুতর বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোগ করা যাবে।[৫৫]

[৫৫] It is clear that much still remains to be learned about the life history of folktales. Most of the efforts we have been discussing has gone toward a clarification of the origin and dissimination of particular folktales and eventually toward the discovery of certain general facts that will apply to large groups of stories.

প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৭

অষ্টম অধ্যায়

লোককাহিনীর বিচার ও মূল্যায়ন

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে লোককাহিনীর সংজ্ঞা, তত্ত্ব, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে লোককাহিনীর একটি সাধারণ পরিচয় তুলে ধরবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু এসব আলোচনা সত্ত্বেও লোককাহিনীর পাঠকের মনে বহু প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এইসব প্রশ্নের কতকগুলো হল, লোককাহিনীর বিচার কি ভাবে সম্ভব? আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মত লোককাহিনীর মূল্যায়ন কি করা যায়? লোককাহিনীর পঠন-পাঠনের সার্থকতা কোথায়? লোককাহিনীর প্রকৃত ভূমিকা কি? অথবা আদৌ তার কোনো ভূমিকা আছে কিনা, থাকলে তা কি ভাবে নির্ণয় করা যায়? বর্তমান অধ্যায়ে এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

লোককাহিনী প্রকৃতই মৌখিক শিল্প

লোককাহিনী মূলতই মৌখিক শিল্প (Oral Art)। কেননা লোক-কাহিনী পড়া হয় না, তা বলা হয়ে থাকে। বর্তমান কালে লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী সংগ্রহ করা হচ্ছে, তা সংরক্ষিত করা বা প্রকাশিত করবার উদ্দেশ্যে। তারও প্রধান কারণ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লোক-সমাজের এই অমূল্য সম্পদ হারিয়ে যেতে বসেছে। তাছাড়া বিশ্ব-সংস্কৃতির মূল্যায়নেও এই লোক-সম্পদের সংগ্রহ অপরিহায হয়ে পড়েছে। তবে লোককাহিনীর পরিবেশন ও তার শ্রবণ একটি আনন্দ-জনক ঘটনা। লোককাহিনী লিখে যদি শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করা যায়, তবে সেই আনন্দ নষ্ট হতে বাধ্য। অর্থাৎ মুখে মুখে পরিবেশন করার মধ্যেই লোককাহিনীর প্রথম ও শেষ সার্থকতা। শ্রোতারাও ঠিক একইভাবে মুখে মুখে শুনতেই তা অভ্যস্ত। স্যার ওয়াল্টার

স্কট নাকি একবার জনৈকা স্কট মহিলার কাছে লোকগীতিকা সংগ্রহ করে তা প্রকাশ করেছিলেন। পরে মুদ্রিত গীতিকার সংকলনটি সেই মহিলাটিকে দেখালে তিনি অভিযোগ করে বলেন যে স্কট গীতিকাগুলোর মাধুর্যই নষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

"ওগুলো তো গাওয়ার জন্য, পড়ার জন্য নয়, তুমি তার মাধুর্য নষ্ট করেছো, ওগুলো আর কখনো শুধু গাওয়ার জন্য গাওয়া হবে না।"[৫৬]

একথা শুধু লোকগীতিকার পক্ষে নয়, লোককাহিনীর পক্ষেও সত্য। প্রকৃত পক্ষে,

"এমন লোক আছেন যাঁরা ফুলদানিতে বুনো ফুল এবং খাঁচার মধ্যে জন্তু-জানোয়ার দেখতে ভালোবাসেন না। এবং একইভাবে বইয়ের স্থির মুদ্রিত পৃষ্ঠায় লোকগীতিকাও অস্বাভাবিক মনে হয়।"[৫৭]

একথা লোককাহিনীর বেলাতেও সর্বাংশে খাটে। লোককাহিনী এ-সব কারণেই মৌখিক শিল্প বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য অর্থাৎ লোককাহিনীর মৌখিকতা (Oralness)-ই তার প্রাণ-ধর্মকে প্রকাশ করে। কিন্তু মৌখিক শিল্প হিসেবে লোককাহিনীর বিচার কিভাবে সম্ভব? লোককাহিনী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আর কোনো বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে না, কিন্তু অক্ষরহীন সমাজে লোককাহিনীর আবেদন সর্বজনীন। কাজেই লোককাহিনীর পরিবেশন ও শ্রবণ প্রধানত লোক-সমাজের ব্যাপার। সেখান থেকে বিচ্যুত করে লোককাহিনীর বিচার ও মূল্যায়ন অসম্ভব। লোককাহিনী ও লোকঐতিহ্যের অন্যান্য বিষয়ের এই মৌখিকতা (Oralness) দেখেই আর. পি. বেস্কম লোকঐতিহ্যকে

---

[৫৬] "They were made for singing and no for reading, but ye hae broken the charm now and they'll never be sung mair."

The Viking Book of Folk Ballads, অলবার্ট বি. ফ্রিডম্যান সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃঃ ।।/০

[৫৭] "There are people who hate to see wild flowers in a vase or animals in cages, and ballads in static print may well seem. equally unnatural."

প্রাগুক্ত, ভূমিকা; পৃঃ ।।/০

সামগ্রিকভাবে 'কথ্যশিল্প' (Verbal Art) হিসেবে অভিহিত করবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।[৫৮]

যাই হোক, মৌখিক শিল্প হিসেবে লোককাহিনীর দুটি বৈশিষ্ট্যময় দিক বর্তমান। এর প্রথমটি হল কথক কর্তৃক কাহিনীর পরিবেশন ও দ্বিতীয়টি হল শ্রোতা কর্তৃক কাহিনীর শ্রবণ ও আস্বাদন। লোককাহিনীর এ-দুটি দিক উপলব্ধি করতে হলে লোককাহিনীর আসরে উপস্থিত থেকে কাহিনী বলার বিশিষ্ট শৈল্পিক কৌশল পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অসুবিধেও অনেক। প্রথমত লোকসমাজে কাহিনী কে বা কারা পরিবেশন করেন, তা খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের দেশে পেশাদার কথকের চেয়ে অনিয়মিত কথকের সংখ্যাই বেশি। তবু পেশাদার কথকের বলার কৌশল ও ভঙ্গী সম্পর্কে পঠন-পাঠন সম্ভব। কিন্তু অনিয়মিত কথকের বেলায় কি করা যায়? আমাদের মা-বাবা, দাদা-দাদি, ভাই-বোন, ছোট ছেলেমেয়ে—এককথায় সকলে কাহিনী বলে থাকে। এসব কথকদের বলার কৌশল ও ভঙ্গী সম্পর্কে আজও কোনো তথ্য সংগৃহীত হয়নি। বিষয়টি একটি বিস্তৃত গবেষণার অপেক্ষা রাখে। লোককাহিনীর সংগ্রাহক কাহিনী শ্রবণ এবং লিপিবদ্ধ করবার কালে এ-সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করে থাকেন। তবে এ-বিষয়ে আজও কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা বা গবেষণা পরিচালিত হয় নি।

বিচ্ছিন্নভাবে যে-সমস্ত আলোচনা পাওয়া যায়, তা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

লোককাহিনীর লৈখিক রূপের বিচার

সুদূর কালে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত কাহিনী সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। অথবা কাহিনীই সাহিত্যে উন্নীত হয়েছে। ঋকবেদ থেকে

[৫৮]বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, শরৎ সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০, পৃঃ ৪৫

শুরু করে রামায়ণ-মহাভারত ও ইলিয়াড ওডিসি তারই প্রমাণ বহন করে। পুরাণেও এই লোককাহিনীই পবিত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এতে কাহিনীর স্বরূপ কোথাও গোপন থাকে নি। অন্যদিকে শাহনামা, আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা, মিশরের আনতারার কাহিনী, জেস্টা রোমানারাম (Gesta Romanarum), রোমান্স, লোকগীতিকা, আমাদের দেশের হাতেমতাই, চসারের ক্যান্টারবেরি টেল্‌স্, বোক্কাচিও-র ডেকামেরনের মধ্যে লোককাহিনীর একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রূপই দেখতে পাই। এবং পুরাণের কাহিনীকে একটি ধর্মীয় মর্যাদা দেওয়া হলেও তা যে মূলত লোককাহিনী তাতে সন্দেহ নেই।

সুতরাং লোকসমাজে প্রচলিত কাহিনীই প্রাচীনকালে সংগৃহীত হয়ে একটি লৈখিক রূপ পেয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশের 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ' ও 'কথাসরিৎসাগর' ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ লোককাহিনীরই সংগ্রহ। বর্তমান কালে সমগ্র বিশ্বেই লোককাহিনী সংগ্রহের সুপরিকল্পিত অভিযান শুরু হয়েছে। ফলে লোককাহিনী সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়ে একটি সর্বজনগ্রাহ্য লৈখিক রূপ পাচ্ছে। অবশ্য সাহিত্যে প্রাপ্ত লোককাহিনী ও মৌখিক ঐতিহ্য থেকে সংগৃহীত কাহিনীর মধ্যে পার্থক্য আছে। সাহিত্যে যে-সমস্ত কাহিনী দেখা যায় তাকে 'সাহিত্যিক লোককাহিনী' নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যদিকে লোকের মুখে প্রচলিত কাহিনীর সংগ্রহকে 'মৌখিক লোককাহিনী' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। যাই হোক, উভয় ধারার কাহিনীর লৈখিক রূপের বিচার ও মূল্যায়ন আজ সম্ভবপর। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার বিচার-বিবেচনা যে-ভাবে করা হয়, লোককাহিনীর লৈখিক রূপের বিচারও সেই পন্থাতে করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও 'সাহিত্যিক কাহিনী' ও 'মৌখিক কাহিনী'র পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখতে হবে।

এ-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিষয়ানুযায়ী কাহিনীকে দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এইসব প্রতিটি শ্রেণীর কাহিনীর প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট (১) ঘটনা-সংস্থান, (২) বিষয়বস্তু, (৩) চরিত্র, (৪) সংলাপ, (৫) স্টাইল বা মেজাজ, (৬) দেশ ও কালগত বৈশিষ্ট্য ও (৭) কাহিনী-বিধৃত জীবনাদর্শ আছে।

বলাবাহুল্য প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত দশটি শ্রেণীর কাহিনীর মধ্যে 'রূপকাহিনী'ই হল সর্বাপেক্ষা জটিল। 'রোমাঞ্চকর কাহিনী' ও 'পুরাণ-কাহিনী'ও জটিলতার দাবি করতে পারে। আমাদের দেশে 'বীর কাহিনী' নেই বললেই চলে। তবে সাহিত্যিক ঐতিহ্যের 'হাতেমতাই' বীর কাহিনী বলে আখ্যায়িত হতে পারে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। এছাড়া অন্যান্য কাহিনী যেমন, স্থানিক কাহিনী, ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী, জীব-জানোয়ারের কাহিনী, নীতি-কাহিনী, হাস্যরসাত্মক কাহিনী ইত্যাদি সরল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

সব শ্রেণীর কাহিনীরই ঘটনা-সংস্থান (Plot) থাকলেও 'রূপকাহিনী', 'পুরাণ-কাহিনী' ও 'বীর-কাহিনী' ইত্যাদির ঘটনা-সংস্থান জটিল, নাটকীয় ও চমৎকারিত্বে পরিপূর্ণ। এসব কাহিনীর বিষয়বস্তু যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি মানুষ, জীব-জানোয়ার, পরী, ভূত, রাক্ষস-খোক্কস, অদ্ভুত প্রাণী, দেব-দেবী, ফেরেস্তা ও দেবদূত এসব কাহিনীর নায়ক-নায়িকা বা চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। এসব কাহিনীর ঘটনা যেমন পৃথিবীতে ঘটে, তেমনি তা স্বর্গ, পাতাল, নরক, আকাশ, বন-বনানী, নদী-সমুদ্র, এবং নাম-না-জানা স্থানে বিস্তৃত হয়। আধুনিক গল্পের সঙ্গে লোককাহিনীর এখানেই পার্থক্য। সংলাপের বৈচিত্র্যও কম নয়। লোককাহিনীতে মানুষে-জানোয়ারে, জানোয়ারে-জানোয়ারে, মানুষে-রাক্ষসে, পাখিতে-মানুষে কথা বলে। দেশ বা কালগত বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে একথা স্পষ্ট করে বলা যায় যে লোককাহিনীর মধ্যে বিশেষ দেশ বা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক উপাদান বর্তমান থাকে—থাকে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ছাপ। কাহিনীর স্টাইল বা মেজাজ এসব বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে। কাহিনী বলার বিশেষ শিল্প-কৌশলই হল এই স্টাইলের মৌলিক উপাদান। এ-কারণেই কাহিনীর সঠিক লিপিবদ্ধকরণ সম্ভব না হলে লোককাহিনীর স্টাইলের বিচার ব্যর্থ হতে বাধ্য। পরিশেষে লোককাহিনীতে বিধৃত জীবনাদর্শের প্রশ্ন ওঠে। এই বিষয়টি খুবই জটিল ও বিতর্কমূলক। তবু স্যর ই. বি. টাইলর, এ্যান্ড্রু ল্যাঙ প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে লোককাহিনীতে বিধৃত জীবনাদর্শ মূলত প্রাচীন বিশ্বাসেরই পরিচায়ক। উদাহরণস্বরূপ, জন্তু-জানোয়ারকে স্ব-সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা বলে মনে করা, বিভিন্ন বস্তু,

যেমন চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, পাথর ইত্যাদির পূজো, যাদু-তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস, জন্তু-জানোয়ারের কথাবার্তা, রূপান্তরণ ইত্যাদি প্রাচীন কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে পৌঁছেচে। কাজেই লোককাহিনীর মধ্যে বিধৃত জীবনাদর্শ একালের বস্তু নয়। এ-বিষয়ে অন্যান্য পণ্ডিতেরা একমত নন। কারণ এ-সব বিশ্বাস যে প্রাচীন কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে পৌঁছেচে, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। মেলিনোওস্কির মতে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এ-গুলোকে বিশ্বাস করা যায় না। প্রমাণ বলতে অবশ্যই তিনি স্পষ্ট দলিলের কথাই বুঝিয়েছেন। ফ্রান্‌জ্ বোয়াস ও স্টিথ থম্পসন প্রমুখ পণ্ডিতরাও এ-বিষয়ে একমত। এঁরা একটি বিশিষ্ট জনসমাজ বা সম্প্রদায় বা উপজাতির লোকঐতিহ্যের সামগ্রিক বিচার করবার পক্ষপাতী। এই বিচার ও মূল্যায়নের ফলে ধরা পড়ে যে লোককাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাস ও প্রথাগুলো আসলে সেই বিশিষ্ট জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত কিনা অথবা সে-জনসমাজ সেগুলোকে জীবন্ত বিশ্বাস ও প্রথা বলে মানে কিনা। নিঃসন্দেহে এই মূল্যায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী টাইলর ও ল্যাঙের বক্তব্যের মধ্যেও যে সত্য আছে, একথাও মানতে হবে।

রুশ লোকতত্ত্ববিদ ভি. আই. প্রপ লোককাহিনীর বিচার করেছেন ভাষাবিজ্ঞানের পদ্ধতিকে অবলম্বন করে। তাঁকে অনুসরণ করে এলান ডাণ্ডিস মার্কিন রেড-ইণ্ডিয়ানদের কাহিনীর আলোচনা করেছেন। এঁরা ভাষাতত্ত্বের ধ্বনি (Phoneme) এবং অর্থবোধক শব্দের (Morpheme) অনুসরণে লোককাহিনীর মধ্যে বারংবার আবৃত্ত বিশিষ্টময় শব্দ ও শব্দ-সমষ্টির একটি বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করেছেন। সব দেশের লোককাহিনীতেই এসব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এ-প্রসঙ্গে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন:

"প্রতিটি কাহিনীতেই দেখা যাবে, 'এক দেশে ছিল এক রাজা', অথবা 'এক যে ছিল (আছিল) দেশ—সেখানে ছিল এক বাদশাহ'; প্রায় গল্পেই দেখা যাবে, 'বাদশার রাজ্যের সীমা নেই—সে দেশে সবই সোনা দিয়ে তৈরী'—বেঙমা-বেঙমীদের কাছে ভবিষ্যৎবাণী শোনা যাবে— রাজা-বাদশারা সব অপুত্রক—সন্ন্যাসী বা দরবেশগণ ফল বা ঔষধ না দিলে রাজমহিষীরা কিছুতেই সন্তানবতী হবেন না—সন্তান হলেও তাকে অন্ধ

কুঠুরীতে রেখে দিতে হবে বারো বৎসর ; বাদশাহ্জাদা বা বাদশাহ্জাদীর ক্রন্দনে প্রায়ই ভাটিয়াল নদী উজান বয়; কন্যারা পান খেয়ে কুমারের গায়ে পিক ফেলেন—রাজ্যে ধন-দৌলতের কমি নাই ; সন্তান না হলেই বাদশাহ্ মনের দুঃখে শয়ন মন্দিরে বা 'আন্দাইর কোঠা'য় কেওয়ার দেবেন; অমৃত ফল খেয়েই 'চান্দের মত ছেলে হবে—রাজকন্যা বা রাজপুত্রকে বধ করতে নিয়ে গিয়ে জল্লাদগণ তাদের ছেড়ে দেবে এবং জল্লাদগণ কুকুরের কলিজা নিয়ে ফিরবে—তারা এক জঙ্গল, দুই জঙ্গল, তিন জঙ্গল ছাড়িয়ে 'বেফুর' বা 'অরণ' জঙ্গলে পড়বে—এক রাজ্য—দুই রাজ্য ; এক দেশ—দুই দেশ—তিনদেশ ছাড়িয়ে আরেক দেশে যাবে—রাজপুত্রগণ 'কুজৎখানা' ঘরে বন্দী হবেন—তাদের চাঁদ বদন মলিন হবে—আঁটকুড়ের মুখ দেখলে মালীরও সিদ্ধি মেলে না.......... ইত্যাদি ইত্যাদি।"[৫৯]

এই উদ্ধৃতিতে যে-সমস্ত বারংবার আবৃত্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রধানত রূপকাহিনী বা ঐ জাতীয় কাহিনীতেই পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকতব বাস্তব গল্প, যেমন হাস্যরসাত্মক কাহিনীর বেলায় এ-ধরনের আবৃত্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে সব কাহিনীতেই এ-ধরনের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য থাকেই।

লোককাহিনীর এ-ধরনের আর একটি আলোচনা করেছেন এক্সেল ওলরিক। কাহিনীর স্টাইল বা মেজাজের মধ্যে কতকগুলো বিশেষ সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য তিনি খুঁজে পান। তাঁর মতে এ-সব বৈশিষ্ট্য কতক-গুলো অনন্য সূত্রের (Epic Laws) সন্ধান দেয়। তিনি বলেন,

"লোকঐতিহ্যের পঠন-পাঠনের জন্য একটি পদ্ধতি আমাদের দরকার, যাকে আমরা লোককাহিনীর (Sage) জীববিজ্ঞান বলে অভিহিত করতে পারি।"[৬০]

[৫৯] কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ ১৯৬৫, ভূমিকা, পৃঃ ৬০-৬১

[৬০] The Study of Folklore, এলান ডাণ্ডিস সম্পাদিত, প্রবন্ধের নাম, Epic Laws of Folk Narrative, পৃঃ ১৩১

তাঁর বক্তব্যের সার কথা হল এই যে যে কোন দেশের লোককাহিনীর পঠন-পাঠন কালে পাঠক মাত্রই বহুতর পরিচিত বিষয়ের সন্ধান পাবেন। এ সব পরিচিত বিষয়সমূহের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব হলে কাহিনীর জীব-বিজ্ঞানগত পঠন-পাঠন সম্ভব হবে। এ-ধরনের সাদৃশ্য সব লোককাহিনীতেই যে পাওয়া যায়, তার কারণ হল (ক) আদিম মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে একটি সাধারণ চরিত্র বর্তমান ছিল এবং (খ) প্রাচীন পুরাণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আদিম মানুষের সঙ্গে আদিম মানুষের চিন্তাধারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। ইউরোপীয় তো বটেই, ওলরিক বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর সব দেশের কাহিনীর মধ্যেই তা পাওয়া যাবে। লোককাহিনীর অবয়বে বা তার শারীরিক গড়নের মধ্যে এমন সব বৈশিষ্ট্য স্থান পায় যে শেষপর্যন্ত তা অনন্য সত্রে পরিণত হয়। এই সূত্রগুলো হল :

১। কাহিনীর আরম্ভ ও সমাপ্তির সূত্র (The Law of Opening and Closing)

২। পুনরাবৃত্তির সূত্র (The Law of Repetition)

৩। একই দৃশ্যে 'দুই'য়ের সূত্র (The Law of Two to a Scence)

৪। পরস্পরবিরোধী গুণ, বস্তু বা ব্যক্তির সূত্র (The Law of Contrast)

৫। তিনের সূত্র (The Law of Three)

৬। যমজের সূত্র (The Law of Twins)

৭। চূড়ান্ত অবস্থানের তাৎপর্য ও তার সূত্র। যখন একই সঙ্গে বহু ব্যক্তি বা ঘটনা দেখা যায়—তখন প্রধান ব্যক্তি বা তাৎপর্যময় ঘটনা প্রথম স্থান লাভ করে। (The Importance of Final Position)

৮। একক উপদানের সূত্র (The Law of Single Strand)

৯। আদর্শ গঠনের সূত্র (The Law of Patterning), দুজন লোক ও দুটি বস্তু কাহিনীতে ব্যবধানের সৃষ্টি না করে বরং ঐক্যেরই সৃষ্টি করে।

১০। ছন্দোবদ্ধ কাহিনীর দৃশ্য ও তার সূত্র (The Use of Fableaux Scenes) এ সব দৃশ্যে কাহিনীর নায়ক-নায়িকা পরস্পরের সমীপবর্তী হয়।

১১। লোককাহিনীর যুক্তিশাস্ত্র ও তার সূত্র (The Logic of the Sage)

১২। ঘটনাসংস্থানের ঐক্য ও তার সূত্র (The Unity of Plot)

১৩। প্রধান চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ ও তার সূত্র (Concentration On A Leading Character)[৬১]

স্টিথ থম্পসন ওলরিকের তেরটি সূত্রকে নয়টি ভাগে বিভক্ত একটি আলোচনা করেছেন :

১। লোককাহিনী ঘটনাপ্রবাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে আরম্ভ হয় না এবং তার সমাপ্তিও অকস্মাৎ ঘটে না। তার ভূমিকাটি ধীরেসুস্থে আরম্ভ হয়; এবং তা কাহিনীর চূড়ান্ত পর্যায়ের পরেও একটি স্থির বিন্দু পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

২। পুনরাবৃত্তি সর্বত্রই উপস্থিত থাকে; তা শুধু কাহিনীকে উৎকণ্ঠা-পূর্ণ মুহূর্তই দেয় না, তা কাহিনীর অবয়বকে দৈর্ঘ্যও দান করে। এই পুনরাবৃত্তি তিন রকম, কিন্তু কোন কোন দেশের কাহিনীতে তা চার রকমও হতে পারে।

৩। সাধারণত একই সময়ে একই দৃশ্যে দুজনের বেশি থাকে না। যদি দুজনের অধিক থাকে, তাহলেও তাদের মধ্যে মাত্র দুজন একইসঙ্গে সক্রিয় থাকে।

৪। পরস্পরবিরোধী চরিত্র পরস্পরের সম্মুখীন হয়; যেমন নায়ক ও নায়কের শত্রু, ভাল এবং মন্দ ব্যক্তি।

৫। যদি একই ভূমিকায় দুজনকে দেখা যায়, তবে তাদের দুজনকেই অকিঞ্চিৎকর বা দুর্বল বলে মনে হয়। অনেক সময়ই এরা হয় যমজ ভাই এবং যখন তারা শক্তিশালী হয়, তখন তারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়।

৬। দলের মধ্যে যে সবচেয়ে দুর্বল বা নিকৃষ্ট, সেই শেষপর্যন্ত শ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণভাবে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নীই বিজয়ী বলে প্রমাণিত হয়।

[৬১] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১

৭। চরিত্র-চিত্রণ খুবই সাধারণ পর্যায়ের। শুধু সেসব গুণাবলীর কথাই উল্লেখ করা হয়—যেগুলো সরাসরি কাহিনীকে প্রভাবিত করে: কাহিনীর কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক আত্মা আছে কিনা তার কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয় না।

৮। ঘটনা-সংস্থানও হয় সাধারণ, সেগুলো কখনো জটিল হয় না। একই সময়ে শুধু একটি কাহিনী পরিবেশিত হয়। এক বা একাধিক উপ-কাহিনী বা ঘটনা-সংস্থান থাকলে তা জটিল বা বাস্তবধর্মী সাহিত্যের প্রমাণ দেয়।

৯। কাহিনীতে যা কিছু পরিবেশিত হয়—তা পরিবেশিত হয় খুবই সাধারণভাবে। একই ধরনের বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব একইভাবে পরিবেশিত হয়। এককথায় কাহিনীকে বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করবার কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না।[৬২]

থম্পসনের মতে ওলরিকের সূত্রাবলীর সাহায্যে সর্বদেশের সর্বকালের লোককাহিনীর বিচার সম্ভব। তবে তিনি একথাও মনে করেন যে এ-সূত্রগুলো প্রাথমিকভাবে সাহিত্যিক কাহিনী ও মৌখিক কাহিনীর পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর ফলপ্রসূ।

লোককাহিনীর ভূমিকা প্রসঙ্গে

লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত লোককাহিনীও লোকজীবনে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। এ-প্রসঙ্গে নৃতত্ত্ববিদরাই প্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মেলিনোওস্কি ও র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউনই প্রথমে লোক ঐতিহ্যের কার্যকারিতা, উপযোগিতা ও ভূমিকা প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেন:

"উভয়েই ইতিহাসের অনুমানভিত্তিক পুনর্গঠনের মূল্যকে অস্বীকার করেন। উভয়েই চালু সামাজিক সংগঠনসমূহের পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উভয়েই সংস্কৃতিকে একটি সম্পূর্ণাঙ্গ বস্তু হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছেন; উভয়েই বিশেষ বিশেষ সংগঠন ও প্রথার

[৬২] Stith Thompson, The Folktale, পৃ: ৪৫৬

সামাজিক ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকারিতার (Function) একটি ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"[৬৩]

উভয়ের মতামতে পার্থক্য থাকলেও লোকসমাজে প্রচলিত লোক-ঐতিহ্যের বিভিন্ন অঙ্গের যে-বিশেষ উদ্দেশ্য বা ভূমিকা (Function) আছে, সে প্রসঙ্গে উভয়েই একমত। এঁরা টাইলর-মর্গান-ল্যাঙের বিবর্তনবাদী তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। ম্যালিনোওস্কি ব্যক্তিগতভাবে জেমস ফ্রেজারের কাছে নানাভাবে ঋণী হলেও তাঁর গবেষণা ফ্রেজারের বক্তব্যকে মূল্যহীন বলে প্রমাণিত করে। এঁদের মতে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে একটি তত্ত্ব দাঁড় করানোর যে প্রবণতা সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদীদের আছে—তা একেবারে অচল। কেননা এসব ঘটনাকে বা তথ্যকে ঐতিহাসিক দলিলের সাহায্যে প্রমাণ করবার দায়িত্ব বিবর্তনবাদীরা নিজেদের স্কন্ধেও নিতে অক্ষম। সুতরাং যা প্রমাণ করা সম্ভব নয়, তা বিশ্বাস করবারও ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। অতএব এঁদের সিদ্ধান্ত এই যে মাঠে নেমে, তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্যের বিশ্লেষণ করে—প্রমাণ করতে হবে লোক ঐতিহ্যের প্রকৃত জীবন্ত বর্তমান ভূমিকা (Function) আছে কিনা। মেলিনোওস্কি বলেন,

"যখন আমি ভোরবেলায় গাঁয়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতুম, তখন আমি পারিবারিক জীবনের সব ছোটখাটো অন্তরঙ্গ ঘটনা দেখতে পেতুম······ আমি তাদের সারাদিনের কাজকর্মের একটা প্রস্তুতি দেখতুম—দেখতুম লোকেরা ছোটখাটো কাজকারবারে ছুটোছুটি করছে, দেখতুম দলে দলে পুরুষ ও মেয়েরা এটা-ওটা তৈরির কাজে ব্যস্ত। ঝগড়া-ঝাঁটি, হাসি-ঠাট্টা, পারিবারিক দৃশ্য—হয়তো ঘটনা হিসেবে সেগুলো

---

[৬৩] "Both denied the value of speculative reconstruction of history ; both emphasized the need to study existing social institutions ; both concieved of cultures as wholes ; both developed a concept of function in terms of the social effects of any custom or institution."

Man and Culture, ed. Raymond Firth, পৃ: ৭৫

তুচ্ছ—কখনো বা নাটকীয়, কিন্তু সর্বদাই তাৎপর্যময় এই ঘটনাগুলোই আমার ও ওদের জীবনের একটা পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করতো।"৬৪

মেলিনোওস্কি পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নিউ গিনির আরগোনটদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। প্রকৃত-পক্ষে তিনি তাঁর প্রাণকে অজস্র ধারায় উৎসারিত করে দিয়ে, স্থানীয় জনগণের একজন হয়ে, বন্ধুত্বে, সারল্যে সবাইকে জয় করে—একটি তৃতীয় নয়নে সব কিছু প্রত্যক্ষ করতেন। ফলে স্থানীয় জনগণের মানসিকতা নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি লোককাহিনী ও তার ভাষা, অদ্ভুত ভঙ্গী ও কথা, পুরাণ কাহিনী, মন্ত্র, যাদু সম্পর্কিত বিশ্বাস ইত্যাদি সংগ্রহ করতেন। এছাড়াও স্থানীয় জনগণ তাদের কাহিনী, বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে-মতামত দিতো, তাও তিনি পুংখানুপুংখভাবে লিপিবদ্ধ করতেন। সংগ্রাহক হিসেবে তিনি তার নিজস্ব মতামতের আলোকে স্থানীয় জনগণের কোনো কিছুই বিচার করতেন না। জন-গণের সঙ্গে একাত্ম হয়েও তিনি এমন সুদূরে অবস্থান করতেন যে তাঁর পক্ষে একটা বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতা বা নিরাসক্তি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। সংগ্রাহক হিসেবে এখানেই নিহিত ছিল তাঁর সাফল্য। সংগৃহীত তথ্যকে শ্রেণীবদ্ধ করে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে তিনি জনসমাজে তার যথাযথ ভূমিকা, উপযোগিতা ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করতেন।

ডব্লু. আর. বেস্কম লোক ঐতিহ্যের এই কার্যকারিতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন:

৬৪As I went on my morning walk through the village, I could see intimate details of family life ;......I could see the arrangements for the day's work, people starting on their errands, or groups of men and women busy at some manu-facturing task. Quarrels, jokes, family scenes, events usually trivial, sometimes dramatic, but always significant, formed the atmosphere of my daily life, as well as of theirs.

B. K. Malinowski, Argonauts of the Western Pacific, London, 1922, পৃঃ ৭

"নৃতত্ত্ববিদরা জীবনের দৈনন্দিন কাজকর্মে, সামাজিক পরিবেশে লোক ঐতিহ্যের স্থান এবং নিজেদের লোক ঐতিহ্যের প্রতি স্থানীয় অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারেও উৎসাহী। কোনো একটি কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য কিনা অথবা তা স্রেফ বানানো ব্যাপার কিনা তা শুধুমাত্র লোককাহিনীর পাঠ (Text) থেকে নির্ণয় করা যায় না। আর এগুলো ছাড়া লোক ঐতিহ্যের চরিত্র ও সম্পূর্ণ অর্থ সম্পর্কে শুধু অনুমান করা চলে।"[৬৫]

বেস্‌কম এ-কারণেই ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন নি। তাঁর মতে:

"নৃতত্ত্ববিদরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদ বা বৈশিষ্ট্যের বহু-বিস্তৃতির তত্ত্ব দিয়ে কোন কিছুর চূড়ান্ত উৎপত্তির সন্ধান একটা নৈরাশ্যজনক ব্যাপার—কেননা এক্ষেত্রে কোনো ঐতিহাসিক দলিল এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।"[৬৬]

---

[৬৫] Anthropologists are also concerned with the place of folklore in the daily round of life, in its social settings, and in the attitude of native peoples, toward their own folklore. One cannot determine these facts from the texts of tales alone, nor whether a tale is regarded as historical fact or as fiction, yet without them one can only speculate as to the nature of folklore and its full meaning.

The Study of Folklore, ed. Alan Dundes, প্রবন্ধের নাম, Folklore and Anthropology, লেখক, উইলিয়াম, আর. বেস্‌কম, পৃ: ৩২

[৬৬] Anthropologists have come to the conclusion that the search for ultimate origins, whether by means of the cultural evolutionist approach or the age-area concept, is a hopeless one, where historical documents and archeological evidence are lacking.

প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১

এককথায় বেসকম মেলিনোওস্কির মতই লোক ঐতিহ্য প্রকৃতপক্ষে জনগণের জীবনে কি অর্থে অর্থান্বিত, কি ভাবে তা তাদের জীবনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে, অথবা জনগণের জীবনে লোক ঐতিহ্য কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে, তা লক্ষ্য করতে বলেন। তাঁরও বক্তব্য অনুমানের পথ ছেড়ে, আরাম কেদারায় বসে কড়ি-কাঠ গুণে সিদ্ধান্ত না করে, প্রকৃত কাজের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে—তবেই লোক-ঐতিহ্যের কার্যকরী ভূমিকা কি তা অনুসন্ধান করা সম্ভব।

লোককাহিনীর কার্যকরী ভূমিকা কি তা উপরিউক্ত আলোকেই নির্ণয় করতে হবে। লোককাহিনী প্রাচীন বা বর্তমান সমাজে একটি জীবন্ত শক্তিমান শিল্পমাধ্যম। মেলিনোওস্কি সঙ্গত কারণেই পুরাণ-কাহিনীকে লোকবিশ্বাসের সনদ (Charter For Belief) বলে অভিহিত করেছেন। সেই কারণে লোককাহিনীকে স্বপরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে লোক-কাহিনীর পঠন-পাঠন করাতে তাঁর সর্বদাই আপত্তি ছিল। লোককাহিনীর পাঠ (Text) নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা জরুরী ব্যাপার, কিন্তু বিশেষ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার না করলে, লোককাহিনীর পঠন-পাঠন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। একজন নৃতত্ত্ববিদ চমৎকার বলেছেন:

"জনসাধারণ কোন বিষয় সম্বন্ধে কি কথা বলছে আমাদের উপলব্ধির পক্ষে সেটিই সবচেয়ে জরুরী। এবং যে-সমস্ত কাহিনী তারা পুরুষানুক্রমে হস্তান্তর করেন এবং যা বারংবার তারা শোনেন—যদি তাঁদের সংস্কৃতির একটি সম্পূর্ণাঙ্গ পঠন-পাঠন সম্ভব হয়, তবে তাকে মোটেই তুচ্ছ বলে মনে হবে না।"[৬৭]

[৬৭]After all, what people choose to talk about is always important for our understanding of them, and the narratives they choose to transmit from generation to generation and to listen to over and over again can hardly be considered unimportant in a fully rounded study of their culture.

প্রাগুক্ত, বেসকম কর্তৃক হলওয়েলের Myth, Culture and Personality নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ৫৪৮

সংস্কৃতির সম্পূর্ণাঙ্গ পঠন-পাঠন বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন লোকঐতিহ্যের সকল বিষয় যেমন, গাঁথা, পুরাণ, গীতিকা, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, লোকবিশ্বাস, টোটেম, বাধানিষেধ (টাবু), মন্ত্রতন্ত্র, লোকচিকিৎসা ইত্যাদি সকল বিষয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ, ঐক্য-অনৈক্য ইত্যাদির সর্বাঙ্গীণ তুলনামূলক আলোচনা। প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক পঠন-পাঠন (Rounded Study) সাম্প্রতিক কালের ব্যাপার হলেও শুধু এরই মাধ্যমে লোক-ঐতিহ্যের পূর্ণাঙ্গ পঠন-পাঠন সম্ভব। লোককাহিনীর পক্ষেও একথা সত্য। লোককাহিনীর মটিফসমূহ এসেছে লোকসংস্কার, লোকাচার, কুসংস্কার, টোটেম, বিধিনিষেধ (টাবু), মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি থেকে। সেই-জন্য নৃতাত্ত্বিকরা বিচ্ছিন্নভাবে সংগৃহীত লোকঐতিহ্যের বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক বিচার করলে, তবেই লোকঐতিহ্যের যথার্থ ভূমিকা ধরা পড়ে।

মার্কসবাদী মূল্যায়ন

মার্কসবাদ লোককাহিনী সংগ্রহের ব্যাপারে যেমন একটি তত্ত্ব হিসেবে কাজ করে থাকে, তেমনি লোককাহিনীর পঠন-পাঠন ও মূল্যায়নের বেলাতেও মার্কসবাদ ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ তুলে ধরেছে। মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষা জীবন ও জগতকে ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে। এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে যুগে যুগে ইতিহাসের পথ ধরে মানব-সমাজ দ্বন্দ্বের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়েছে। আদিম গোষ্ঠী-ব্যবস্থার পর দাসব্যবস্থা, দাসব্যবস্থার পর সামন্তবাদ এবং সামন্তবাদ থেকে উদ্ভূত হয়েছে আজকের শক্তিশালী পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের গর্ভ থেকেই জন্ম নিয়েছে কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ। প্রতিটি ব্যবস্থার মধ্যেই একটা শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বজায় থাকে। এই দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত আকার ধারণ করলে বিপ্লব অনিবার্য হয়ে উঠে। সামন্তবাদকে পরাজিত করে পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে করে সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠা হয় বলে মার্কস-বাদীদের বিশ্বাস। যাই হোক, মার্কসবাদীরা, তাদের বিশ্বাসের ফলাফল-স্বরূপ, লোককাহিনীর মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের রূপায়ণ খোঁজেন। তাঁরা

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে লোককাহিনীর আলোচনা করতে চান না। তদুপরি বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জগৎ ও জীবনকে দেখার এই প্রবণতা না থাকলে, মার্কস-বাদীদের মতে, ভাববাদী স্খলন ঘটে। মার্কসবাদ বিবর্তনবাদেও বিশ্বাস করে। মানবসংস্কৃতি যে ক্রমাগত বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় এসে পোঁছেচে—এই তত্ত্বেও মার্কসবাদের অগাধ আস্থা।

মার্কসবাদের সম্বন্ধে পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে-বিরূপ মনোভাব বিদ্যমান, তা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লোককাহিনীর মার্কসবাদী মূল্যায়ন শ্রদ্ধেয় স্বীকৃতি পেয়েছে। এ-প্রসঙ্গে স্টিথ থম্পসন বলেন,

"রাশিয়ান লোকঐতিহ্যবিদরা কথকদের মধ্যে যে বিশেষ ব্যক্তিগত পার্থক্য বিদ্যমান, সেদিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের অনেক সংগ্রহে, বিভিন্ন কথক কর্তৃক কথিত কাহিনীকে একইসঙ্গে স্থান দেওয়া হয়েছে—আর সেই সঙ্গে প্রতিটি কথকের জীবনী-সংক্রান্ত তথ্য ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বর্ণিত হয়েছে। এ-সমস্ত রাশিয়ানরা অবশ্য, তাঁদের কাহিনীগুলোর তুলনামূলক লোকতাত্ত্বিক পঠন-পাঠন সম্পর্কে সচেতন, এবং সাধারণভাবে সেজন্য তাঁরা তাঁদের প্রদত্ত তথ্যপঞ্জীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—কিন্তু লোককাহিনীকে জনগণের সামাজিক জীবনের একটি দলিল হিসেবে দেখতেই তাঁরা অধিক উৎসাহী। সেজন্য এসব লেখকদের কাছে বিশেষ বিশেষ কথকের সঙ্গে তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর সম্পর্ক প্রধান তাৎপর্য লাভ করেছে" [৬৮]

---

[৬৮] Russian folklorists have given special attention to individual differences in taletellers. In many of thier collections the tales told by each informant are grouped together, along with an account of his life and social background. These Russians, of course, are aware of the value of their stories for comparative folklore, and usually call attention

উপরিউক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে যে-কথাটি স্পষ্ট তা হল এই যে মার্কসবাদী লোকঐতিহ্যবিদ মাত্রই লোককাহিনীকে জনগণের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত করে দেখতেই অভ্যস্ত। মার্ক আজাদভস্কির গবেষণায় এই দিকটিই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সাইবেরিয়ার লেনা নদীর উপকূলে কাহিনী সংগ্রহকালে আজাদভস্কি কথক, কথকের সমাজ-পরিবেশ ও কথকের বলার ভঙ্গি ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করেন। ফলে লোককাহিনীর সামাজিক ভূমিকা পরিচ্ছন্নভাবে ধরা পড়ে। আজাদভস্কি তাঁর কথকদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করেন। এ-প্রসঙ্গে ড: আশরাফ সিদ্দিকী বলেন,

"লোকবিজ্ঞানের ইতিহাসে রাশিয়ার অবদান হল কথকের আবিষ্কার; Vinkurova (ভিনকুরোভা) নাম্নী জনৈকা মহিলা কথক দিয়ে আজাদ-ভস্কির গবেষণা এই কথাই প্রমাণ করেছে যে, লোক-সাহিত্যে যাকে 'মটিফ' বলা হয়, তার পরিবর্তনের বা পরিবর্তন ঘটাবার মূল হল কথক (Teller); কথকদের ব্যক্তিগত রুচি বা মেজাজ-মর্জির জন্যও বহু কাহিনী পরিবর্তিত হয়ে যায়; ভিনকুরোভা সম্বন্ধে শেষ মন্তব্য করতে গিয়ে আজাদভস্কি বলেছিলেন, "Her definite personality makes the movable portion of the story."[৬৯]

মেলিনোওস্কির গবেষণার সঙ্গে মাকসবাদী গবেষণার একটি ঐক্য-সূত্র দেখা যায়। সমাজের মধ্যে লোককাহিনীর যথার্থ ভূমিকা নির্ণয়ে মেলিনোওস্কি যে-পন্থা অবলম্বন করেন, মার্কসবাদীরাও প্রায় সেই পন্থাই

to this in their notes, but their interest is in the folktale as an element in the social life of the people. The individual teller of tales and his relation to his friends and neighbours is therefore of prime importance to these writers.

Stith Thompson, The Folktale, পৃ: ৪৫১

[৬৯]কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, পৃ: ১২

অনুসরণ করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে উভয়ের দার্শনিক প্রত্যয় এক নয়। মোলিনোওস্কি বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করেন না। অথচ মার্কস-বাদীরা করেন।

আমাদের দেশের কাহিনীতে কোথাও শ্রেণীসংগ্রামের কথা আছে কিনা, তা নির্ণয় করতে হলে লোককাহিনীর ব্যাপক সংগ্রহ ও পর্যালোচনা অপরিহার্য। আমার সংগৃহীত একটি কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত হল :

এক পাতা ভাত

দুই ভাই। দুজনেই জন-মজুর। একদিন খাবার জোটে তো আর একদিন জোটে না। একদিন বড়ভাই ঘুরতে ঘুরতে হাজির হল এক জোতদারের বাড়িতে। অনুনয়-বিনয়ের ফলে জোতদার তাকে বললো, 'তোমাকে কাজ দিতে রাজি আছি, তবে সারাদিনের পর তুমি শুধু এক পাতা ভাত পাবে, মাইনে-কড়ি কিচ্ছু পাবে না। বেচারা আর করে কি! তাতেই রাজি হল। প্রথম দিন কাজ করবার পর লোকটি ভাত চাইলো। জোতদার তাকে কুলগাছের একটি পাতা ছিঁড়ে এনে এক পাতা ভাত দিলো। দেখে শুনে বেচারার চক্ষু তো চড়কগাছ। কিন্তু বলারও কিছু নেই। কারণ চাকরির শর্তই ছিল এক পাতা ভাত। এমনি করে দিন যায়—না খেয়ে বেচারা শুকিয়ে যেতে থাকে।

ছোট ভাইটিও অন্যত্র কাজ করে। সে কিন্তু বেশ চালাক-চতুর আর চটপটে ছিল। বড়ভাইয়ের দুর্দশা দেখে সে তাকে জিজ্ঞেস করে সব কথা জেনে নেয়। সব শোনার পর সে তার বড়ভাইকে বাড়িতেই থাকতে বলে এবং নিজেই সেই জোতদারের বাড়িতে কাজ করতে যায়। জোতদার তাকেও একই শর্তে অর্থাৎ এক পাতা ভাত দেবার শর্তে কাজ দেয়। সন্ধ্যা হতে না হতে সে একটা প্রকাণ্ড মানকচুর পাতা নিয়ে উপস্থিত হয় এবং ভাত চায়। জোতদারের চক্ষু তো চড়কগাছ! কিন্তু উপায় নেই—কারণ শর্ত ছিল এক পাতা ভাত। বাধ্য হয়েই সে তাকে

মানকচুর পাতায় যত ধরে তা দিতে বাধ্য হয়। এমনি করে দিন যায়। বড়ভাইটি ভাইয়ের ভাগের ভাত খেয়ে দিন কাটায় আর বসে থাকে। ছোটভাই এদিকে মহাখুশিতে কাজ করে আর তার বড়ভাইকে কষ্ট দেওয়ার জন্য প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খোঁজে। একদিন জোতদার আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার আগে তাকে পাট কাটার জন্য উপদেশ দিয়ে যায়। সে ক্ষেতের সব পাট কেটে একেবারে শেষ করে দেয় অর্থাৎ পাট একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলে। জোতদার ফিরে এসে এই সর্বনাশা কাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু কি আর করা যায়—জোতদার নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করে।

আর একদিন জোতদার হাটে যাবার আগে তার ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে ঠিক করে। জোতদার ছোটভাইকে ডেকে ছেলেটিকে সাফ করতে বলে। সে তাকে সাফ করতে নিয়ে যায় এবং কাপড় ধোয়ার পিঁড়িতে তাকে আছাড় দিয়ে সাফ করতে থাকে। ছেলের কান্না শুনে বাপ-মা গিয়ে দেখে যে ছেলে একেবারে আধমরা হয়ে গেছে। দেখে-শুনে জোতদারের আক্কেল তো গুড়ুম!

উপায়ান্তর না দেখে জোতদার ও তার বৌ ছোটভাইয়ের অগোচরে পালিয়ে যাবে বলে ঠিক করে। ছোটভাই উভয়ের শলা শুনতে পায়। জোতদার একটি বাক্সে রান্না-করা ভাত ও তরকারি এবং বাসন-কোসন রাখে। সুযোগ বুঝে ছোটভাই সেই বাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সন্ধ্যের পর জোতদার সেই বাক্সটি মাথায় নেয় এবং স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিছু দূর যাবার পর ছোটভাইয়ের প্রস্রাব করবার বেগ উপস্থিত হয়। বাধ্য হয়ে সে তখন বাক্সের মধ্যেই প্রস্রাব করে। এদিকে প্রস্রাব জোতদারের মাথা বেয়ে গালের দুদিক দিয়ে পড়তে থাকে। জোতদার ভাবে তরকারির হাঁড়ি থেকেই বুঝি ঝোল পড়ে যাচ্ছে। সে তখন জিহ্বা দিয়ে গালের দুপাশ চাটতে থাকে। কিছুদূর যাওয়ার পর জোতদারের খুব ক্ষিদে পায়। বাক্সটি নামিয়ে ডালা খুলতেই লাফ দিয়ে ছোটভাই বেরিয়ে পড়ে। জোতদারের আক্কেল আর একবার গুড়ুম হয়ে যায়। ছোটভাই তখন বলে, তুমি আমার বড়ভাইকে যে কষ্ট দিয়েছো—তার

ফলে তোমাকেও এই শাস্তি দিলাম। এরপর অবশ্য উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয় এবং সবাই জোতদারের বাড়িতে ফিরে আসে।[10]

কাহিনীটির শেষাংশ অশ্লীল হলেও এতে মজুরের সঙ্গে জোতদার শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে। মজুর বিশেষ করে ক্ষেতমজুরের হাতে জোতদার যে-ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে, তাতে মার্কসবাদী তত্ত্ব অনেকটা প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু রূপকাহিনী, পুরাণ কাহিনী, বীর কাহিনী কিংবা রোমাঞ্চকর কাহিনীর ব্যাখ্যা মার্কসবাদ কি ভাবে করে, তা চিত্তাকর্ষক হতে পারতো। দুঃখের বিষয়, এরকম কোনো গবেষণা এখন পর্যন্ত হয়েছে কি না তা জানা যায় না।

লোককাহিনীর মূল্যায়নে টাইপ ও মটিফ

লোককাহিনীর মূল্যায়নে ফিনল্যাণ্ডের লোকতাত্ত্বিকরা একটি বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন। ক্রনটা, কার্ল ক্রোন ও এন্টি আর্নের মত প্রখ্যাত পণ্ডিতেরা লোককাহিনীর টাইপ ও মটিফ নির্ণয় করে এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতিতে লোককাহিনীর বিচার করে, লোককাহিনীর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব সাধন করেছেন। লোককাহিনীর টাইপ ও মটিফ নির্ণয় মূলত লোককাহিনীকে শ্রেণীবদ্ধ করবার একটি পদ্ধতি মাত্র। অন্যদিকে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতি লোককাহিনী কি ভাবে বিস্তৃত হয়—শুধু সে-আলোচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু তবু লোক-কাহিনীর টাইপ ও মটিফের আলোচনা করলে যে অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়, তাহল এই যে লোককাহিনী মূলত একটি বিশ্বজনীন ঘটনা, এবং এ-কারণেই লোককাহিনীর কোনো বিচ্ছিন্ন বা সংকীর্ণ পঠন-পাঠন সম্ভব নয়, কারো কারো মতে উচিতও নয়। কেননা, মানব-সংস্কৃতির এমন মহান ঐতিহ্য আর নেই। এণ্ডারসন ও স্টিথ থম্পসনও লোককাহিনীকে এ-ভাবেই দেখেছেন।

---

[10]কথক: রুহুল আমিন প্রামাণিক। কাহিনীটি চলতি ভাষায় বলার সময় বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। ইনি একজন ছাত্র। এঁর বাসস্থান মাষ্টারপাড়া, রাজশাহী।

প্রকৃতপক্ষে, লোককাহিনী এমন একটি ঘটনা, যা সমস্ত দেশের সীমান্ত ও বন্ধনী অতিক্রম করে, প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও, বিশ্বমানবের সাধারণ কিন্তু তাৎপর্যময় সম্পদে পরিণত হয়। সাহিত্য বা শিল্পের কোন অংশ সম্পর্কে একথা খাটে না। গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের সংগৃহীত কাহিনীর সঙ্গে কেন বাংলাদেশের কাহিনীর, কেন বাংলাদেশের কাহিনীর সঙ্গে আফ্রিকার, এবং কেন আফ্রিকার কাহিনীর সঙ্গে সমগ্র ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাহিীর সাদৃশ্য ও ঐক্য দেখা যায়? কেন বাংলাদেশ ও ভারতীয় কাহিনীর সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের কাহিনীর সাযুজ্য অনুভব করি? কেন সামগ্রিকভাবে প্রাচ্য ভূখণ্ডের দেশসমূহের লোককাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান? এসব প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে আর্নে-থম্পসনের টাইপসূচীতে, আছে থম্পসনের মটিফ-সূচীতে। এই সূচী দুটির আন্তরিক পঠন-পাঠনে ধরা পড়ে যে মানুষের মন সর্বত্র, সব রকম বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও, একইভাবে কাজ করে গেছে। স্বীকার করি, বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও মানব-সম্প্রদায়, একইভাবে একই পরিবেশে লালিত হয়নি বটে, তবু মন বস্তুটার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটেছে প্রায় একইভাবে। স্বীকার করি, বাঙালীদের সঙ্গে সেই প্রাচীনকাল থেকে বসবাস করলেও, সাঁওতাল জনগোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। স্বীকার করি, মার্কিন জাতির সঙ্গে বসবাস করলেও রেড-ইণ্ডিয়ানদের স্বভাব তেমন বদলায় নি বটে, বা মেলিনোওস্কির ট্রোব্রিয়াণ্ড দ্বীপের অধিবাসীরা হয়তো বহির্বিশ্বের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ রাখেনি, কিন্তু তাতেও লোককাহিনীর আদান-প্রদান কোথাও বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত হয়নি। ফ্রানজ বোয়াস নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, সংস্কৃতির সংমিশ্রণ সর্বত্রই ঘটেছে। রুথ বেনেডিক্টও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সংস্কৃতির সংমিশ্রণ তত্ত্বকে একটি স্থায়ী ভিত্তি দান করেছেন।

অর্থাৎ মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে, লোককাহিনী একটি অনন্য ভূমিকা পালন করে এসেছে এবং আজও করছে। বিশ্ব যখন আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত, নানা শিবিরে বিভক্ত, দিবারাত্রি বিভিন্ন দুর্ভাবনায় উদ্বায়ুগ্রস্ত, তখন লোককাহিনীর পঠন-পাঠনই শুধু প্রমাণ করে, মানুষ এক ও অভিন্ন। লোককাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতি এই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়, আরও উজ্জ্বল করে।. একথা বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে,

বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী বা জাতিসমূহের লোককাহিনীর পারস্পরিক আদান-প্রদান কি ভাবে ঘটেছে, তার অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত পর্যালোচনা করলে মানুষ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হবে, বিভেদের পথ ত্যাগ করে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে, একে অন্যকে বলবে বন্ধু, সহকর্মী, আত্মার আত্মীয়। এই অনন্য অনুভূতি টাইপ ও মটিফ-সূচীর নিবিষ্ট অধ্যয়নে পরিচ্ছন্ন হয়, দানা বাঁধে, আত্মার মধ্যে একটি অশরীরী কিন্তু অবিনশ্বর মোহাবিষ্টতার সৃষ্টি করে। আর এখানেই শুধু অনুভব করা যায় কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ্গের সেই প্রসিদ্ধ 'বিশ্বজনীন মনে'র তত্ত্বকে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য আছে, ধর্মে ধর্মে আছে, বিভিন্ন উপজাতির মধ্যেও আছে, এমনকি জাতিতে জাতিতেও আছে, কিন্তু মানুষের 'ব্যক্তি-মনে'র চেয়ে 'বিশ্বজনীন মন' (Archetypal Mind)-ই সমস্ত মানুষকে একই মঞ্চে দাঁড় করিয়ে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

ফিনল্যাণ্ডের গবেষকমণ্ডলী ও স্টিথ থম্পসনের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে বেসকম যে অভিযোগ করেছিলেন, খুবই আশ্চর্য ব্যাপার তাঁরাও একইভাবে সাংস্কৃতিক বিবতনবাদীদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ এনেছিলেন। লোককাহিনী যে একস্থান থেকে অন্য স্থানে, এক দেশ থেকে আর এক দেশে যায়, একথা ফিনল্যাণ্ডের গবেষকবৃন্দ ও স্টিথ থম্পসনের হাতে প্রমাণিত হয়। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদরা বিশেষত মেলিনোওস্কি ও বেসকম তা স্বীকার করেন না। কেননা এক্ষেত্রেও লোককাহিনীর দেশান্তরে গমনের কোনো দলিল পাওয়া যায় না। অন্য দিকে উভয় দলই সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদীদের তত্ত্বকে নস্যাৎ করেন এই বলে যে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য প্রমাণ করতে পারেন না। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদীদের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগই উত্থাপিত হোক না কেন, বিজ্ঞান আজও অনুমানের ধার ধারে।

লোককাহিনীর মূল্যায়নে সংস্কৃতির সংমিশ্রণ তত্ত্ব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রান্‌জ্‌ বোয়াস ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে বসবাসকারী ৎসিমসিয়ান উপজাতির পুরাণ কাহিনীর আলোচন করেন :

"বোয়াসের পঠন-পাঠন, যেখানে ৎসিমসিয়ানরা বসবাস করে (উত্তর-পশ্চিম উপকূল), অংশত সেই অঞ্চলে লোককাহিনীর বিস্তৃতির পঠন-পাঠনেরই একটি প্রচেষ্টা মাত্র। এবং এভাবেই তিনি ৎসিমসিয়ানদের পুরাণ কাহিনীর ইতিহাস ও উৎপত্তির একটি পর্যালোচনা করেন। সেজন্যই তিনি ৎসিমসিয়ান কাহিনীর সঙ্গে প্রতিবেশী উপজাতিসমূহের কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং আবিষ্কার করেন যে, যদিও সেই অঞ্চলের ২টি উপজাতি একই কাহিনী পুরোপুরি একইভাবে বলে না, তবু বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে একই কাহিনীর যে পাঠান্তর পাওয়া যায়, তা মোটামুটি একই রকম।"[৭১]

৭৫টি স্বতন্ত্র টিৎসিমসিয়ান কাহিনীর আলোচনা করে বোয়াস নিম্ন-লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন:

১। টিৎসিমসিয়ান ও তার প্রতিবেশী উপজাতিরা যে-সমস্ত কাহিনী বলে থাকে, সেগুলো স্বাধীনভাবে কিংবা সমান্তরালভাবে উদ্ভূত হয়নি, বরং তা উদ্ভূত হয়েছে পারস্পরিক বিনিময় বা সংমিশ্রণের ফলে।

২। এসব কাহিনী সামগ্রিকভাবে (আলাদা আলাদা কাহিনী হিসেবে) সর্বদা সংমিশ্রিত হয়নি। বরং এক একটি কাহিনীর বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য (যেমন, যাদু, তন্ত্রমন্ত্র ও বিশেষ মটিফ) স্বতন্ত্রভাবে সংমিশ্রিত হয়। অর্থাৎ পুরো একটি কাহিনী নয়, তার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে (পুরো)

---

[৭১] Boas' study is in part an attempt to work on the distribution of folktales within the area (the Northwest coast) in which the Tsimshians live, and by this means to account for the origins and history of Tsimshian myths. He compares, therefore, Tsimshian tales with those of their neighbours and discovers that, though no two peoples, in the area tell a given tale in precisely the same way, the versions found in the several tribes are more or less similar to each other.

Ralph L. Beals and Harry Hoijer, An Introduction to Anthropology,

The Macmillan Company, New York. 1969. পৃ: ৬৬৯

কাহিনীটির পরোয়া না করে) সংমিশ্রিত হয়ে থাকে। ফলে সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে এ-রকম বৈশিষ্ট্যের একটি তাৎপর্যময় ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়।

৩। প্রত্যেকটি উপজাতি যখন একটি কাহিনী পরিবেশন করে, তখন তা করে এমনভাবে যেন সমগ্র কাহিনীটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযোগে একটি সংহত কাহিনী হিসেবেই বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ অন্যান্য উপজাতির কাহিনী থেকে সংগৃহীত আগন্তুক বৈশিষ্ট্যগুলোকে তখন আর স্বতন্ত্র বস্তু বলে মনেই হয় না। অন্যকথায় বহিরাগত বৈশিষ্ট্যসমূহ কাহিনীর অভ্যন্তরে এমনভাবে লীন হয় যে সে-বৈশিষ্ট্যগুলো কখনও যে বাইরে থেকে এসেছে একথা আর অনুভব করা যায় না।[১২]

লোকঐতিহ্যের বিভিন্ন উপাদান কিভাবে এক মানব-গোষ্ঠী থেকে অন্য আর একটি মানব-গোষ্ঠীতে বিস্তৃত হয়, রুথ বেনেডিক্ট তা জুনি, ডবু ও কোয়াতকিউৎল্ নামক তিনটি উপজাতির সংস্কৃতির পারস্পরিক (Cross-Cultural Study) পঠন-পাঠন করে সিদ্ধান্ত করেন:

"পোশাক-পরিচ্ছদ, কাজ করবার পদ্ধতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, পুরাণ ও বিবাহের ক্ষেত্রে বিনিময় ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য সমগ্র মহাদেশে বিস্তৃত হয়, এবং সেই মহাদেশের প্রতিটি উপজাতি কোন না কোন ভাবে এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়।"[১৩]

বলাবাহুল্য, বেনেডিক্ট বোয়াসের নির্দেশিত পথেই কাজ করেছিলেন। এবং বোয়াস ও তাঁর অনুসারীরা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে লোককাহিনীর পরীক্ষা করে, তবেই এসব সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রকৃতপক্ষে বোয়াস ও তাঁর অনুসারীদের গবেষণা ক্রোন-আর্নে-এণ্ডারসন-থম্পসন

[১২]প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬৯

[১৩]Traits of costume, of techniques, of a ceremonial, of mythology, of economic exchange at marriage, are spread over whole continents, and every tribe on one continent will often possess the trait in some form.

Ruth Benedict Patterns of Culture, Houghton Mifflin Company, New York. 1934. পৃঃ ২৪১

চক্রের লোককাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতিকে শুধু সমৃদ্ধই করে নি, তাকে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও দিয়েছে।

নৃতত্ত্বের সর্বাধুনিক শাখা হল সংস্কৃতির পরিবর্তনের শাস্ত্র বা Acculturation; প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হার্সকোভিৎস ইতিমধ্যেই কি কি ভাবে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে, সংস্কৃতির পরিবর্তন বলতে কি বুঝি, সংস্কৃতির পরিবর্তনের ইতিহাস ইত্যাদি নির্ণয়ের তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।[৭৪] তাঁর Dahomean Folktales বিশ্বের লোকতত্ত্ববিদদের কাছে একটি তাৎপর্যময় লোককাহিনীর সংগ্রহ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

লোককাহিনীর মূল্যায়নে সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদ

উনিশ শতকে সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা ও পঠন-পাঠনের দিকে সবলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দুটি দিক থেকে এই উৎসাহের সৃষ্টি হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে মানুষ তার অতীত সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়। অন্যদিকে অক্ষরবিহীন জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ভ্রমণকারী, সৈনিক ও মিশনারীদের মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়। এই উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি একটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। পূর্বে এ-রকম ধারণা ছিল যে মানুষ সভ্য বা অর্ধসভ্যই ছিল, কিন্তু কালক্রমে কোন কোন জাতি মহৎ ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করে অধঃপতিত হয় (Theory of Degradation)। এই ভ্রান্ত ধারণার পতন ঘটে সেদিনই যখন ইউরোপের বিভিন্ন সভ্য দেশে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রমাণ করলো যে মূলত ইউরোপীয় সভ্য জাতিসমূহের পূর্বপুরুষেরা অর্ধসভ্য বা বর্বরই ছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডারুইনের The Origin of Species গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর পরই সংস্কৃতির বিবর্তনবাদও প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যর ই. বি. টাইলরের Primitive Culture ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ও লুয়িস এইচ. মর্গানের The Ancient Society প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

[৭৪] Melville, G. Herskovits, Acculturation (The Studdy of Culture Contact), Peter Smith, New York. 1937

উভয় গ্রন্থেই সংস্কৃতির বিকাশকে এমনভাবে দেখা হয়েছে যে এক একটি সংস্কৃতি, তা সে যেখানে যে-সময়েই উদ্ভূত হোক না কেন, ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে তা অগ্রসর হয়েছে। বিকাশের সময় সমস্ত সংস্কৃতিকে একই ভাবে নানা স্তর অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় আসতে হয়েছে।

লোককাহিনীর অভ্যন্তরে যে-সমস্ত লোকবিশ্বাস, লোকাচার, কুসংস্কার, যাদু, তন্ত্রমন্ত্র দেখা যায়, তা এসব বিবর্তনবাদীদের মতে প্রাচীন মানুষের বিশ্বাসেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে সেগুলো সংস্কৃতির ভগ্নাংশরূপে টিকে থাকে এবং তার অস্তিত্ব রক্ষা করে লোককাহিনীতে। এন্ড্রু ল্যাঙ, ফ্রেজার, মিস ওয়েস্টনের গবেষণাতেও এই উদ্বর্তনের তত্ত্ব (Theory of Survival) স্থান পায়।

নৃতাত্ত্বিকরা যেমন মেলিনোওস্কি, বেনেডিক্ট, বোয়াস-রুথ বেনেডিক্ট, লোকতত্ত্ববিদ যেমন ক্রোন-আর্নে-এণ্ডারসন-থম্পসন এই বিবর্তনবাদী তত্ত্বকে চূড়ান্ত আঘাত হানলেও সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদ আজও লোক-কাহিনীর মূল্যায়নে শক্তিশালী মাধ্যম।

লোককাহিনীর মূল্যায়নে মনঃসমীক্ষণ

মনঃসমীক্ষণের (Psychoanalysis) প্রবর্তক ফ্রয়েড মানুষের মনের সমস্ত অতলান্ত দিকের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে এক অভূতপূর্ব গবেষণার নজির রেখে গিয়েছেন। মানবসমাজের ক্ষুদ্রতম ঘটনা থেকে বৃহত্তম কর্মকাণ্ড পর্যন্ত কোনকিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। তিনি মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণের মধ্যে গোপন মানসিকতার সন্ধান পান। মানুষের অবদমিত ইচ্ছেসমূহ স্বপ্নে মুক্তি লাভ করে বলে মনে করেন ফ্রয়েড। আর স্বপ্নের মধ্যে সাহিত্য, পুরাণ, লোককাহিনী, গাঁথা ও রোমান্স ইত্যাদির বহু উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। নির্জ্ঞান (Unconscious) থেকে উৎসারিত বহু বিশিষ্ট ঘটনাই লোককাহিনীর মটিফ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ফ্রয়েডের মতে রূপকাহিনী মাত্রই লোকস্বপ্ন যা পরে কাহিনীর আকারে বিবৃত হয়েছে। অন্য দিকে পুরাণ

কাহিনী হল জাতিগত স্বপ্নচিন্তা (Racial Dream-Thought)। প্রকৃতপক্ষে,

"আইন, শৃংখলা, সামাজিক শান্তির ভয়ে এবং ভদ্রতাবোধের দায়ে প্রতিদিন সে-সব ইচ্ছা অবদমিত হচ্ছে, তাই পুরাণ, প্রথা, কুসংস্কার, ধর্মাচরণ ও রূপকথা ইত্যাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করছে।······রূপকথা ও পুরাণের মধ্যে যেসব অত্যদ্ভুত তাজ্জব কাণ্ডকারখানার মিছিল দেখি, তার কারণ এই যে অবচেতন মন নিদ্রিতাবস্থায় মুক্তি পেলে নিজের 'মাতৃভাষা'য় কথা বলে। সে-ভাষা স্থূলতা, স্বার্থসেবা, নাটকীয়তা, নোংরামি, একগুঁয়েমি ও রোমাঞ্চকর ঘটনাবিন্যাস সবকিছুর জন্য বিশেষ ভাবে উপযোগী। সৃষ্টিধর্মী কল্পনা (Creative Imagination) স্বপ্নের ভিতরে আপন ঐক্যতান সৃষ্টি করে। উন্মাদ, প্রেমিক, কবি, শিশু ও আদিম মানুষ এই এক জায়গায় পরস্পরে হাত মেলায়।"[৭৫]

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ স্বপ্নের মধ্যে যেমন লোককাহিনীর উপাদান খুঁজেছে, তেমনি কিভাবে লোককাহিনী স্বপ্নকে প্রভাবিত করে তারও আলোচনা করেছে। ফ্রয়েড একাধিক উদাহরণ দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন।[৭৬] ফ্রয়েডের বন্ধু ও সহকর্মী কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙও তাঁর জীবনের প্রভূত সময় ব্যয় করেছিলেন পুরাণ কাহিনীর পঠন-পাঠনে।

"পুরাণে, ইয়ুঙের মতে, সর্বতোভাবে সমষ্টিগত নির্জ্ঞান প্রকাশ পায়—সেইহেতু তা সর্বদেশে সমস্ত মানবগোষ্ঠীর পরাণে একই আকারে পাওয়া যায়। তাঁর ধারণা Myth সৃষ্টির ক্ষমতা হারালে মানুষ তর

[৭৫]সাহিত্যিকী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা। শরৎ ও বসন্ত সংখ্যা, ১৩৭৩। প্রবন্ধের নাম: মনঃসমীক্ষণ ও সাহিত্য, লেখক: আবদুল হাফিজ। পৃঃ ১৫৩-১৫৪

[৭৬]প্রাগুক্ত, শরৎ সংখ্যা, ১৩৭৪ সাল। প্রবন্ধের নাম, মনঃসমীক্ষণ ও লোককাহিনী, লেখক: আবদুল হাফিজ।

আপন সৃষ্টিশীল সত্তাকেই হারায়। ধর্ম, কবিতা, জনসাহিত্য, রূপকাহিনী সবই নির্ভর করে পৌরাণিকতা সৃষ্টির ক্ষমতার উপর।”[৭৭]

ফ্রয়েড ও ইয়ুঙ্গের মতামতে পার্থক্য থাকলেও লোককাহিনীর উদ্ভব ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য নৃতত্ত্ব ও লোকঐতিহ্য উভয়ের গবেষণার গুরুত্বকে স্বীকার করে নি। কেননা এঁরাও তাঁদের বক্তব্যকে প্রমাণ করবার জন্য দলিল উপস্থিত করতে পারেন না। এছাড়া জগৎ ও জীবনের সব ঘটনার মধ্যে যৌন প্রভাব বিদ্যমান—ফ্রয়েডের এই মত অধিকাংশ পণ্ডিতই মেনে নেন নি। মার্কসবাদীরা ফ্রয়েডের এ সংক্রান্ত বক্তব্যকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা ও অভিমত

লোককাহিনী তো বটেই, লোক-ঐতিহ্যের অন্যান্য উপাদান সংগ্রহকালে আমি যে তাৎপর্যময় ঘটনা লক্ষ্য করি, তা লোককাহিনীর সামাজিক ও অন্যবিধ ভূমিকা প্রসঙ্গে আমাকে একটি অনন্য অভিজ্ঞতা দান করে। আমার সংগৃহীত তথ্যাদি প্রমাণ করে যে লোকসমাজে লোককাহিনী শুধু আনন্দের মাধ্যমই নয়, তা জনশিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লোককাহিনীর ভূমিকা এত বিস্তৃত যে, একটি বিশিষ্ট লোকসমাজে দীর্ঘদিন ধরে কাজ না করলে তা উপলব্ধি করা যায় না! বিশিষ্ট ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাকে ধর্মীয় জলসায় এবং জনসভায় যেমন লোককাহিনী পরিবেশন করতে দেখেছি, তেমনি ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে মা বোনদের কাহিনী বলতে শুনেছি। যখনই একটি সংকট বা বিপদাপদ আসে, কিংবা তত্ত্ব বর্ণনার প্রয়োজন হয়, তখনই লোককাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ

[৭৭] ‘উত্তর-অন্বেষা’, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৭৪ (মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা) প্রবন্ধের নাম, ইয়ুঙ প্রসঙ্গে, লেখক: আবদুল হাফিজ। পৃঃ ১০৬

করা হয়। বয়ে-যাওয়া ছেলেকে উপদেশ দেন পিতা কাহিনীর মাধ্যমে। পিতা-মাতা, ওস্তাদ বা গুরুজনের কথা না শুনলে কি হয়, এ-সম্বন্ধে একটি কাহিনী নিম্নে প্রদত্ত হল:

মানে না মানা

বাপ আর বেটা। বেটা কিছুতেই বাপের কথা শোনে না। বাপ যদি বলে, 'ভাত খাও', ছেলে সেদিন উপোস দেবে। বাপ যদি বলে, 'উত্তর দিকে যাও', ছেলে যাবে দক্ষিণ দিকে। বাপ যদি বলে, 'শুয়ে থাকো', ছেলে তখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। বাপ যদি বলে, 'বাইরে যাও', ছেলে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে শুয়ে পড়বে। এমনি করেই দিন যায়। একদিন বর্ষাকালে একটি খাড়ি (ছোট্ট নদী) পার হওয়ার সময় ছেলেটি বিপদে পড়ে। তখন সে একটি গরুর লেজ ধরে প্রাণপণে খাড়িটি পার হওয়ার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে পিতা খবর পেয়ে ছুটে আসে এবং ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'বাপ জীবনে তো আমার একটি কথাও মানো নাই, আজ অন্তত একটি কথা রেখো আমার। গরুর লেজটি শক্ত করে ধরে থাকো, ছেড়ে দিও না।" তার মুখ থেকে কথাটা বেরোতে না বেরোতেই ছেলে গরুর লেজটি ছেড়ে দিয়ে ভেসে গেল স্রোতের তোড়ে।[৭৮]

জনসভায় বক্তৃতাকালে বহু রাজনৈতিক নেতাকে লোককাহিনী পরিবেশন করতে দেখেছি। অর্থাৎ রাজনৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে লোক-কাহিনীর প্রয়োগ একটি অসামান্য ঘটনা। এমন কি খাঁটি রূপকাহিনীও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে দেখেছি। মসজিদের ইমাম, পীর, অলি-আউলিয়া, সাধু-সন্ত সবাই লোককাহিনীর মাধ্যমে ধর্মের বাণী

[৭৮]কথক: আবদুর রশিদ খান। কাজিরগঞ্জ, রাজশাহী। ইনি বলেন যে বয়ে-যাওয়া ছেলেকে উপদেশ দেবার সময় এক ব্যক্তি কাহিনীটি বলেন এবং তখন তিনি গল্পটি শোনেন।

ছড়িয়ে দেন।[৭৯] একজন মহিলা কথককে সংসারের যাবতীয় ঘটনার জন্য এক একটি কাহিনী বলতে শুনেছি।

অন্যদিকে লোক-ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে লোককাহিনীর সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে সবিস্ময়ে অনুভব করেছি যে আমাদের জন-সমাজে প্রচলিত লোকসংস্কার, যেমন যাদু ও তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস, জন্তু-জানোয়ার ও পাখির কথা-বলা, অত্যদ্ভুত ঘটনা, আত্মার বহির্গমন, স্বপ্নের বাস্তবতা, উড়ন্ত সর্প, অশ্লীলতা ইত্যাদির সঙ্গে লোককাহিনীর সম্পর্ক খুবই নিবিড়। এছাড়া ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, মেয়েলি গান, বারোমাসী, লোকগীতিকা, আচার, ব্রত, লোকসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত বক্তব্যের সঙ্গে লোককাহিনীর নিরন্তর আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ আমাদের জনসমাজের সঙ্গে আমাদের লোক-ঐতিহ্যের সম্পর্ক শরীরের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধের মত নিবিড় আর অন্তরঙ্গ।

মৌলিনোওস্কির পদ্ধতিতে লোকঐতিহ্যের সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেই তবে লোককাহিনীর জাতীয় চরিত্র নির্ণয় করা সম্ভব। একটি জনপদের মধ্যে সীমাবদ্ধরূপে লোককাহিনীসহ লোক-ঐতিহ্যের সমস্ত উপাদান সং-গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত লোককাহিনী বা লোক-ঐতিহ্যের অন্যান্য উপাদানের প্রকৃত ভূমিকাও উপলব্ধি করা যায় না। মেলিনোওস্কির পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজ শেষ হলে, তবেই ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পদ্ধতিতে লোককাহিনীর বিচার ও মূল্যায়ন সার্থকতা লাভ করতে পারে। এক কথায় লোককাহিনীর স্থানীয় ও জাতীয় চরিত্র নির্ণীত না হওয়া পর্যন্ত, লোককাহিনীর আন্তর্জাতিক পঠন-পাঠন বিফল হতে বাধ্য। স্থানীয়ভাবে এবং সীমাবদ্ধরূপে লোককাহিনীর সংগ্রহ সম্ভব হলে, তবেই ভন সিডোর 'অইকোটাইপ' নির্ণয় করা সম্ভব হবে। 'অইকোটাইপ'ই শেষ পর্যন্ত জাতীয় কাহিনী-টাইপের সূত্র দিতে সক্ষম। এই উপায়ে সমস্ত বাংলাদেশের লোককাহিনীর সংগ্রহ যেদিন সম্ভব হবে, সেদিনই শুধু লোককাহিনীর টাইপ ও মটিফ-সূচী প্রস্তুত করবার প্রশ্ন উঠবে। ক্রোন-আর্নে-এ্যাণ্ডারসন থম্পসন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এসব বিচার-বিবেচনা না করেই যে-ভাবে

[৭৯]এ-প্রসঙ্গে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল।

লোককাহিনীর আন্তর্জাতিক আলোচনা করতে চান, তাতে লোককাহিনীর জাতীয় চরিত্রকে সরাসরি অস্বীকার করা হয়। একথা সত্য যে লোক-কাহিনী মূলত বিশ্বজনীন ঘটনা, কিন্তু তাতে করে লোককাহিনীর জাতীয় মূল্য নস্যাৎ হয়ে যায় না। তাছাড়া স্ব-পরিবেশ থেকে বিচ্যুত করে লোককাহিনীর আলোচনা চোরাবালিতে পথ হারানোর মত একটি বিপজ্জনক দুর্ঘটনাও বটে।

সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদের মত একটি তত্ত্বই শুধু লোককাহিনীর অন্তর্নিহিত তাজ্জব বিশ্বাস, অতীন্দ্রিয় ঘটনা ইত্যাদির ব্যাখ্যা দান করতে সক্ষম। মানুষের ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা ঐতিহাসিকের কাজ বটে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা তথ্যের সংযোগ সাধন মানুষের সৃষ্টিধর্মী কল্পনারই কাজ। মেলিনোওস্কি চক্র একে শুধু ইতিহাসের পুনর্গঠন (Reconstruction of History) বলে হেসে উড়িয়ে দিতে চান। তাছাড়া অনুমানভিত্তিক গবেষণাকে বিজ্ঞানও অস্বীকার করে না—আর সামাজিক বিজ্ঞানের পক্ষে তো প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই লোককাহিনীর আলোচনায় সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। একইভাবে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের যৌনগত দিক সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তি থাকলেও টোটেম ও টাবু (Totem and Tabu) সম্পর্কে ফ্রয়েডের মতামতের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এর বাস্তব প্রমাণ আমাদের দেশের লোকসমাজেই বর্তমান। মার্কসবাদ কথক, কথকের সঙ্গে তার সমাজের সম্পর্ক ও লোককাহিনীর সমাজ-পরিবেশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যে মতামত দেয় তা এত বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক যে তার গুরুত্ব আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

এক কথায় উপরিউক্ত তত্ত্বসমূহকে যুগপৎ প্রয়োগ করে লোককাহিনীর বিচিত্র আলোচনা সম্ভবপর। আমাদের দেশে এ ধরনের গবেষণা এখনও শুরু হয়নি বটে, কিন্তু তার খুব বেশী দেরীও নেই।

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থপঞ্জী

ইজদানী, রওশন., মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য, ঢাকা, বাঙলা একাডেমী, ১৩৬৪

ভট্টাচার্য, আশুতোষ., বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ২য় সংস্করণ। ১৯৫৭

সিদ্দিকী, আশরাফ., লোকসাহিত্য, ঢাকা, স্টুডেণ্ট ওয়েজ, ১৯৬৩

কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী, আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, ঢাকা, বাঙলা একাডেমী, ১৩৭১

ঢাকার লোককাহিনী., মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, ঢাকা, বাঙলা একাডেমী, ১৩৭২

Aarne, Antti and Thompson, Stith. The Types of the Folktale, Helsinki, 1964

Beals, L. Ralph and Hoijer, Harry. An Introduction to Anthropology, New York, The Macmilan Company, 1959

Islam, Mazharul, Dr., A History of English Folktale Collections in India and Pakistan. (An Unpublished Thesis)

Krappe, Alexander Haggerty., The Science of Folklore, New York, W. W. Norton and Company, Inc. 1929

Man and Culture, ed. Raymond Firth, New York, Harper Torchbooks, 1957

Malinowski, B.K., Argonauts of the Westen Pacific, London. 1922

Thompson, Stith., The Folktale, New York, Holt, Rinehart, and Winston.

The Viking Book of Folk Ballads., ed. Albert B. Friedman, New York. The Viking Press, 1956

The Study of Folklore., ed. Alan Dundes, Prentice-Hall, Inc. New Jersey.

পত্র-পত্রিকা

উত্তর-অন্বেষা, (মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা), ১ম সংখ্যা, ১৩৭৪, রাজশাহী।

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, শরৎ সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৩

লোকসাহিত্য (বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত লোকসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা), ২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৩৭০, ১৩৭১, ১৩৭২, ১৩৭২, ১৩৭২ সাল) ঢাকা, বাঙলা একাডেমী।

সাহিত্যিকী, (মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণামূলক পত্রিকা), ২য় সংখ্যা (বসন্ত), ১৩৭১ সাল, শরৎ ও বসন্ত সংখ্যা, ১৩৭৩ সাল ও শরৎ সংখ্যা, ১৩৭৪ সাল।

———